আমার জীবনসঙ্গিনী ও সহধর্মিণী
কৃষ্ণাকে

নিবেদন

পাঁচ বছর আগেও ভাবিনি এমন একটি লেখা আমি লিখব। হঠাৎ বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একদিন বলে বসলেন যে সুভাষচন্দ্রকে আমরা ছেলেবেলায় যেমন দেখেছি, সে সম্বন্ধে একটা লেখা দিতে হবে 'আনন্দমেলা'র জন্য। 'আনন্দমেলা'য় আমার লেখা "রাঙাকাকাবাবু ও আমাদের ছেলেবেলা" বেরোবার পর কি যেন একটা ঘটে গেল। নানা দিক থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল, মনে হল যেন সুভাষচন্দ্রকে কাছে থেকে জানবার একটা নতুন আগ্রহ ছোটদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কেবল ছোটরাই বা কেন, আজকের বাবা-মায়েরা, যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে দেখেননি, তাঁরাও নতুন করে উৎসুক হয়ে উঠলেন। যাঁরা আরও বড় এবং সুভাষচন্দ্রকে এবং আমার বাবাকে দেখেছেন, তাঁরাও পুরানো দিনের কথাগুলি নতুন করে শুনতে চাইলেন।

তারপর একদিন নীরেনবাবু অতি সহজ কিন্তু দৃঢ়ভাবে আমার উপর 'বসুবাড়ি' চাপিয়ে দিলেন। বললেন, কেবল সুভাষচন্দ্রের কথা নয়, আমার ছেলেবেলা থেকে বসুবাড়ি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি যা কিছু মনে আছে, ছোট বড় সকলের সম্বন্ধে, ছোট বড় যে সব ঘটনা মনে ছাপ রেখে গেছে, ধারাবাহিকভাবে লিখে যেতে হবে। তিনি 'আনন্দমেলা'য় ছাপবেন। আমি অনেক অনুনয় করলাম, আমার অতিব্যস্ত জীবনযাত্রার কথা বললাম, লেখায় আমার অনভিজ্ঞতার কথা বললাম, কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। তিনি জিতলেনও, লেখা শুরু হল এবং তিন বছর ধরে প্রকাশিত হতে থাকল।

দেশের ইতিহাসের এক অতি সঙ্কটপূর্ণ সময়ে একটি পরিবারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়ের সহজ সরল একটি কাহিনী গল্পের ভঙ্গিতে বলার আমি চেষ্টা করলাম। পাঠকদের মধ্যে লেখাটির প্রতিক্রিয়া দেখে আমি অবাক ও অভিভূত হলাম। বাংলার অসংখ্য ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা-মায়েরা তাঁদের সহৃদয় ও অকুণ্ঠ উৎসাহের হাত বাড়িয়ে দিয়ে লেখাটি চালিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করলেন। তিন বছর ধরে রাতের পর রাত লণ্ঠন বা মোমবাতি জ্বালিয়ে যখন লিখছি, ছায়ার মত পাশে ছিলেন আমার জীবনসঙ্গিনী।

লেখাটি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল এবং শেষ হবার পরও বাংলার বহু জায়গায় আমি গিয়েছি। শুনেছি লেখাটি যখন খণ্ডে খণ্ডে বেরোচ্ছিল, সেটি পড়বার জন্য নাকি অনেক পরিবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। শুনেছি বাংলার এমন অনেক ছোট্ট ছেলেমেয়ে যারা পড়তেও শেখেনি, লেখাটি পড়ে শোনাতে তাদের মায়েদের বাধ্য করেছে। লেখাটির মাধ্যমে আজকের ছেলেমেয়েরা সুভাষচন্দ্রকে খুবই কাছের মানুষ হিসাবে দেখতে শিখেছে—'রাঙাকাকাবাবু' বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন। বসুবাড়ির যা কিছু তুচ্ছ তা পথের ধারে পড়ে থাক, বসুবাড়ির দেশসেবার গৌরব ও ত্যাগের ঐশ্বর্য দেশবাসী ভাগ করে নিন, লেখকের এই প্রার্থনা।

লেখাটির মধ্যে ইংরাজিতে কতকগুলি উদ্ধৃতি আছে। ছোটদের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে সেগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল।

যখন আনন্দ পাবলিশার্স আমাকে জানালেন যে 'বসু-বাড়ি' বই-এর আকারে প্রকাশ করবেন, আমি স্থির করলাম যে ছোটখাটো দু'চারটি ভুল শোধরানো ছাড়া মূল লেখায় কোন

সেখানেই যাওয়া হত বেশি।

আমার দাদাভাই জানকীনাথ বসু সত্যিই অসাধারণ লোক ছিলেন, যদিও তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট লেখা হয়নি। আমি যখন ফার্স্ট ক্লাস বা স্কুলের শেষ বছরে ঢুকব, সেই সময় তিনি মারা যান। শৈশবে বা কৈশোরে তাঁকে কেমন মনে হত, শুধু সেটুকুই আমি বলতে পারি।

তিনি বেশির ভাগ সময় কটকে থাকতেন এবং আমরা থাকতুম কলকাতায়। তিনি পুজোর সময় মাজননী প্রভাবতীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসতেন। অসুখ করলে চিকিৎসার জন্য আসতেন, কিংবা বাবা-মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন বলে আসতেন। দাদাভাই ও মাজননীর পুজোর সময় কলকাতা আসাটা আমাদের বাড়ির একটা বিশেষ ঘটনা ছিল। সেই সময় বাড়ির অন্য অনেকে—কাকা-জ্যাঠারা—যাঁরা কাজে কলকাতার বাইরে থাকতেন, তাঁদের অনেকেও কলকাতায় জড়ো হতেন। ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠত।

দাদাভাই ও মাজননী কলকাতা পৌঁছবার দিন এলগিন রোডের বাড়িতে সকলে মিলে সারি দিয়ে ঠাকুর-প্রণামের মতো একটা ব্যাপার করত। তাঁরা দু'জনে তাঁদের ঘরে পাশাপাশি বসতেন। আর আমরা একে একে প্রণাম করতুম। দাদাভাই প্রত্যেককে আলাদা করে আদর করতেন এবং কাছে টেনে নিয়ে প্রত্যেককে বিশেষ কিছু আলাদা করে বলতেন। আমরা যেন প্রত্যেকেই বিশেষ কোনো গুণের অধিকারী। আমরা সকলেই গভীরভাবে অনুভব করতুম তাঁর অফুরন্ত স্নেহের স্পর্শ। মাজননী প্রায় একইভাবে আমাদের কাছে টেনে নিতেন এবং নানা রকম প্রশ্ন বা মন্তব্য করতেন, যার ধরন ছিল একটু আলাদা। যেমন, কার রঙ আগের চেয়ে কালো হয়ে গেছে, কে যেন গায়ে মোটেই সারছে না, কিংবা আর কেউ বড়ই মোটা হয়ে পড়ছে, ইত্যাদি। তিনি তাঁর মন্তব্যগুলি সাধারণত আমাদের মায়েদের উদ্দেশে ছুঁড়তেন, যাঁরা কাছেই মাথায় কাপড় টেনে সলজ্জ ও সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দুজনেরই আমাদের উপর প্রভাব ছিল বিরাট, কিন্তু কোথায় যেন একটু তফাত ছিল। দাদাভাইয়ের প্রতি আমাদের ভালবাসা ছিল ভালবাসাই, মাজননীর ক্ষেত্রে ভালবাসার সঙ্গে মেশানো ছিল খানিকটা ভয়।

পুজো হত আমাদের গ্রাম কোদালিয়ায়, কলকাতা থেকে মাইল চোদ্দ হবে। দাদাভাই ও মাজননীর উপস্থিতিতে পুজো হলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত গ্রামের সব স্তরের মানুষের একটা বিরাট মিলন-যজ্ঞ। আমরা ছোটরা তার মধ্যে প্রায় হারিয়ে যেতাম বলা চলে। একদিকে দাদাভাই তাঁর চিরসঙ্গী ছাতাটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সকলকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করছেন, অন্যদিকে মাজননী বিরাট এক কর্মযজ্ঞের কর্ত্রী, বাড়ির আর সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে ব্যস্ত।

বিজয়ার দিন দেশের পুজো সেরে দাদাভাই ও মাজননী কলকাতার বাড়িতে ফেরার পরে যে ব্যাপারটা হত, সেটাকে বসুবাড়ির কংগ্রেস বলা চলে। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছেন সবাই ৩৮/২ এলগিন রোডে ভেঙে পড়তেন। মঞ্চে কিন্তু একজন সভাশ্রেষ্ঠর বদলে দুজন থাকতেন—দাদাভাই ও মাজননী।

অত বড় বাড়িতেও জায়গা কুলোয় না। তার উপর প্রণাম, আলিঙ্গন ও সম্ভাষণের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। শেষে জলযোগ ও উপাদেয় শরবতে অধিবেশন শেষ হত। আমরা ছোটরাও তার ভাগ পেতাম।

॥ ২ ॥

বাড়ির ছোটরা দাদাভাইকে একান্তভাবে পেতাম, যখন তিনি আমাদের সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তাঁর যখন বছর চল্লিশেক বয়স, তখন তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি শরীরের দিক থেকে ডাক্তারের পরামর্শমতো কড়া নিয়ম মেনে চলতেন।

নিয়মের মধ্যে প্রধান দুটি ছিল সকালে হেঁটে বেড়ানো এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সংযম। দাদাভাই জীবনের তিরিশ বছর নুন না খেয়ে চালিয়ে গেছেন। কী দিয়ে রান্না হবে, কী কী খাওয়া চলবে বা চলবে না, মাজননী পাশে বসে তদারক করতেন, এবং প্রায়ই "লোভ"-এর কুফলের কথা দাদাভাইকে মনে করিয়ে দিতেন। মাঝে-মাঝে বলতেন, "তোমার তো খালি লোভ!" কথাটা শুনে আমাদের কেমন-কেমন লাগত। কারণ দাদাভাইয়ের লোভ কিছু ছিল বলে তো কখনও মনে হয়নি।

আমার মা রান্নাবান্নায় বেশি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু দাদাভাইয়ের জন্য মাজননীর নির্দেশমতো ইক্‌মিক কুকারে রান্না চাপাতেন। উডবার্ন পার্কের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাদাভাই মাটিতে আসন পেতে খেতে বসেছেন, এই দৃশ্য বেশ মনে পড়ে। পাশেই টেবিল-চেয়ার, কিন্তু তিনি মাটিতে বসেই খেতেন। নিয়মমাফিক তাঁকে কইমাছ ঘিয়ে ভেজে খেতে হত।

ডাক্তারি দুরমকই চলত—অ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজি। আমাদের নতুনকাকাবাবু সুনীলচন্দ্র নিজেই বড় ডাক্তাব ছিলেন। বাড়ির কবিরাজ ছিলেন শ্যামাদাস বাচস্পতি। তাঁর স্নিগ্ধ সৌম্য চেহারা বেশ মনে পড়ে। আমাদের ডাক্তার-কাকা আর-একজনকে পরামর্শের জন্য প্রায়ই ডাকতেন, তিনি হলেন স্যার নীলরতন সরকার। যাঁরা একবার দুবার স্যার নীলরতনকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে ভুলবেন না। চেহারায় অপূর্ব দীপ্তি, আচরণে সে কী মাধুর্য। তাঁর স্মিত হাসিটি দেখলেই রোগীর অসুখ অনেকটা সেরে যেত।

দাদাভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি কলকাতার ইডেন গার্ডেনে, শিলংয়ের লেকে এবং পুরীর সমুদ্রের ধারে। আমার মা বিভাবতীকে দাদাভাই 'মাজননী' বলে ডাকতেন। দাদাভাইয়ের ইচ্ছামতো প্রত্যেকবার বেড়াতে বেরোবার আগে মা'র অনুমতি নিয়ে আসতে হত। অনেকবার এমন হয়েছে, দাদাভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, দাদাভাই জিজ্ঞেস করলেন, মাজননীকে বলে এসেছি কিনা। না হলে ফিরে গিয়ে মার অনুমতি নিয়ে আসতে হত। মা অপ্রস্তুত হতেন। বলতেন দাদাভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাবে, আমাকে জিজ্ঞেস করবার কী আছে! দাদাভাইয়ের বেড়ানোর ধরন ছিল ছাতা মাথায় সহজ, ধীর মাপা গতি। কতটা বেড়ানো হবে তাও ঠিক করা আছে। বাবা বা রাঙাকাকাবাবুর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে বেড়ানো একেবারে ভিন্ন ব্যাপার। বাবার গতি মাঝামাঝি হলেও ঢিলেমি চলবে না—সমান তালে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হাঁটা তো একটা লড়াই, সে কথা পরে বলব।

আগেই তো বলেছি, দাদাভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল পুরোপুরি স্নেহের, শাসনের কোনও লেশমাত্র নেই। সেকালে তো বাড়িতে অনেক চাকরবাকর থাকত, তারাও কিন্তু তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না।

একবার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দাদাভাই মাজননীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে রয়েছেন। খুব পুরনো দুই ভৃত্য শেখ কালু ও মাগুনি দাদাভাইয়ের খুব সেবা করত, তাছাড়া বামুন-ঠাকুর তো আছেই। বিদায়ের সময় এলে দেখেছি তাদের হাত ধরে দাদাভাইয়ের কৃতজ্ঞতার কান্না। শেখ আমেদ আমাদের পুরনো ড্রাইভার, সে খুবই অস্বস্তি বোধ করত, যখন দাদাভাই তার কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মতো সম্ভাষণ করতেন, "আচ্ছা, আমেদ ভাই, কেমন আছ বলো তো!"

তোমরা যদি সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী 'ভারতপথিক' পড়ো, তাহলে দেখবে যে, তাঁরাও যখন ছোট ছিলেন, বাড়ির চাকরবাকরদের তখন পরিবারভুক্ত মানুষ বলেই গণ্য করা হত।

১৯৩৩ সালে পুরীতে গিয়েছি মাকে সঙ্গে নিয়ে। সেকালে মেয়েরা একলা ঘোরাফেরা করতেন না, ট্রেনে যাত্রা তো নয়ই। আমি তখন নেহাতই বালক। আমাকে মা সঙ্গে নিলেন বোধহয় নিয়মরক্ষার জন্য। কারণ আমার চেয়ে বয়সে বড় কোনো পুরুষ বাড়িতে ছিলেন না। বাবা জেলে, দাদারা কেউ হাতের কাছে নেই। দাদাভাই তাঁর কথাবার্তায় আমাকে মা'র ছোট্ট অভিভাবকের মর্যাদা দিতে লাগলেন এবং এমন সব আলোচনা করতে লাগলেন যেন আমি বেশ বড় হয়ে গিয়েছি। তিনি জেনেছিলেন আমি সংস্কৃত পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়েছি। মুখস্থ বিদ্যা আর কী! তিনি ধরে নিলেন যে, আমি অনেক সংস্কৃত শিখে ফেলেছি। বললেন, আমি যেন গীতা পড়তে আরম্ভ করি।

মাজননী তো মোড়ায় বসে আমাকে খাওয়াতে বসতেন। নানারকম রান্না, বিশেষ করে মাছের ভিন্ন ভিন্ন পদ। আমি তখনও স্বল্পাহারী আর পেটরোগা। তাঁর নিজের ছেলেরা আমাদের বয়সে কত এবং কী কী খেত, মাজননী তার একটা ফর্দ আমাকে রোজই শোনাতেন। আমি লজ্জার খাতিরে যতটা পারতাম খেতাম এবং পরে ভুগতাম। খাওয়া ব্যাপারে, বিশেষ করে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে, আমাদের এক আত্মীয় সম্বন্ধে একটা মজার গল্প সেইসময় শুনেছিলাম। সম্পর্কে তিনি আমাদের জ্যাঠামশাই।

গল্প শুনেছি, প্রকাণ্ড একটা মাছ কিনে এনে তিনি নিজে তদারক করে কাটিয়ে কটা টুকরো হল গুনে আমার এক পিসিমাকে ভাজতে দিতেন। গুনে গুনে মাছ ভাজা খেয়ে এক কুঁজো জল খেয়ে, যাবার সময় বলতেন, "কই, মাছের তেলটা দে!"

আমি যখন খুবই ছোট, তখন দাদাভাই আমাকে একটা নাম দিয়েছিলেন জংবাহাদুর। আমার মতো এক লাজুক নির্বিরোধী ছেলেকে এরকম দুর্ধর্ষ নাম কেন দিয়ে ফেললেন, আমি জানি না। বোধহয় দার্জিলিং কার্শিয়াং আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নেপালি নামটি তাঁর মনে ধরেছিল। বহুদিন পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবে রাজবন্দী থাকার সময় এই নামটি আমি ব্যবহার করেছিলাম, পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। আমি লায়ালপুরের জেল থেকে ১৯৪৫-এ আমার মা'কে নানা খবর দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের চোখ এড়িয়ে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে নিজেকে আমি জংবাহাদুর বলে উল্লেখ করেছিলাম। পুলিস তো এ-নামটি জানে না।—সুতরাং চিঠিটা ধরা পড়লেও কোনো বিপদ নেই।

॥ ৩ ॥

বসুবাড়িতে মাজননীর কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী। মানুষটি ছিলেন ধবধবে ফর্সা, ছোটখাটো—কিন্তু মনের জোর ছিল অপরিসীম। যুদ্ধের সময় আমরা অনেক রকমের যুদ্ধ-জাহাজের নাম শুনতাম। আমি মনে মনে মাজননীকে তুলনা করতাম। একটি জার্মান পকেট ব্যাটলশিপের সঙ্গে।

সংসারটি ছিল বিরাট। নিজেরই আট ছেলে ছয় মেয়ে। তাছাড়া মাজননীর নিজের ভাইদের মধ্যে চার-পাঁচ জন ছিলেন কমবয়সী। তাঁরা দিদির কাছে কটকে থেকে ভাগ্নেদের সঙ্গে পড়াশুনো করতেন। তার উপর মেয়েদের মধ্যে জন দুয়েক কম বয়সে বিধবা হওয়ায় তাঁদের সংসারের ভারও দাদাভাই ও মাজননীর ওপর পড়েছিল। চাকর-বাকরও অনেক, জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যাও বাড়িতে কম নয়। সব মিলে এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন মাজননী। আজকাল তো দেখি, দু-চারজনের সংসার নিয়ে অনেক গৃহকর্ত্রীই হিমসিম খান। মাজননী সবদিক নজর রেখে অতি পরিপাটি করে সংসার চালাতেন।

কোনো ব্যাপারে ফাঁকি দিয়ে মাজননীর কাছে পার পাওয়ার উপায় ছিল না। কটকের বাড়িতে পড়ার ঘরে ছেলেরা ও নিজের ছোট ভাইয়েরা যখন পড়তে বসতেন, তখনও তিনি পাশের ঘর থেকে নজর রাখতেন। তিনি প্রথম প্রথম ইংরেজি বিশেষ কিছুই জানতেন না। ওঁর এক ভাই তার সুযোগ নিয়ে তিনি পাশের ঘরে এলেই একই পাঠ বারবার জোর গলায় পড়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, পড়াশুনা খুব চলছে। কিন্তু মাজননী ধরে ফেলতেন। পরে ডেকে তাঁকে বললেন যে, ইংরেজি না জানলেও মন দিয়ে শুনে তিনি বুঝেছেন যে, একই পাঠ বারবার পড়ে তিনি তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছেন। পরে অবশ্য এক মেমসাহেব রেখে মাজননী খানিকটা ইংরেজি শিখেছিলেন।

হাতের লেখা ছিল তাঁর মুক্তোর মতো। আমাদের মায়েরা আমাদের হাতের লেখা অভ্যাস করাবার সময় মাজননীর হাতের লেখা দেখে লিখতে বলতেন। সব ব্যাপারে নিখুঁত হবার চেষ্টায় কিন্তু একটা বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি করতেন তিনি। সব কাজেই তাঁর সময় একটু বেশি লাগত। স্নান, খাওয়া, নিজের হাতে খাবার তৈরি করা, ট্রেন ধরবার সময়, সব ব্যাপারে তিনি এতই দেরি করতেন যে, বাড়ির সকলেই ছটফট করতেন। কলকাতা যাওয়া হবে। শুনেছি কটক স্টেশনের দিকে পুলের উপর রেলগাড়ির শব্দ পেলে তবেই তিনি ধীরেসুস্থে বাড়ি থেকে যাত্রা করতেন।

একটা ব্যাপারে মাজননীর বিশেষ দুর্বলতার কথা আমাদের বাড়িতে এখনও অনেকেই বলেন। সেটা হল গায়ের রঙ। অনেকেরই ধারণা, ফর্সা রঙের প্রতি তাঁর একটা অস্বাভাবিক টান ছিল। ছেলেদের বৌ পছন্দ করার ব্যাপারে মাজননীর কথাই ছিল শেষ কথা এবং রঙ ময়লা হলে তাঁর হাতে পাস করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি ভাবী কুটুম্বদের বাড়ির সামনে জুড়িগাড়িতে বসে থাকতেন। যাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়নি, তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করতে তাঁর সংস্কারে বাধত!

মেয়েকে গাড়ির ভিতরে আনিয়ে তিনি পরীক্ষা নিতেন। তার মধ্যে একটা ছিল ক্রীম পাউডারের প্রলেপ অতি উত্তমরূপে মুছে নিয়ে ভাল করে দেখা যে, মেয়ের গায়ের রঙ আসলে কী রকম! নাতি-নাতনিদের বেলায়ও এই নীতি একটা চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি করত।

শ্রীশ্রীগুরুপদ-ভরসা

৺পুরী [illegible]

১১/৮/২৬

Bengal

কল্যানিয়া শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র
[illegible]

বাবা বহু দিবস পূর্ব্বে আমি তোমাকে এক খানি পত্র পাঠাইয়া ছিলাম আমি এখানে আসিয়া ছিলাম তাহার উত্তর তুমি দিয়াছ।

তোমার খবর আমি প্রায় ২ বৌমাদের নিকট হইতে পাইয়া থাকি।

মেজর শরীর এখন অনেকটা ভাল আছে, পুরীর রাজার মকদ্দমা লইয়া তিনি খাটিতে পারিবেন সেই জন্য আজ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

আমি এখন ৺পুরীতেই আছি

শ্রীমান ও তাহার ছেলেরা এবং সুরেশ ও মা মনি ও ছেলেরা সবে আছে।

রাঙাকাকাবাবুকে লেখা মাজননীর চিঠি

আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হত মাজননী হয়তো গায়ের রঙের জন্য পক্ষপাতিত্ব করেন। কেবল গায়ের রঙ কেন, রান্নার রঙ নিয়েও তিনি টিপ্পনী কাটতেন। ঝোলের রঙ যদি কালো হত, বামুন ঠাকুরকে তিনি বলতেন, "কী, নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রান্না করেছ নাকি ?"

মাজননী ছিলেন অনেক দিক দিয়ে খুবই উদার, আবার অন্য ব্যাপারে সেকালকার নানা সংস্কারের সাক্ষী। তোমরা হয়তো শুনে অবাক হবে যে, তাঁদের সময় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বেড়াতে বেরনো ছিল একটা অভিনব ব্যাপার। লোকে নানা কথা বলত, বলত এ আবার

কেমন সাহেবিয়ানা। মাজননী কিন্তু দাদাভাইয়ের সঙ্গে জুড়ি-গাড়ি চেপে খোলাখুলিভাবে কটকে সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। অন্য দিকে আবার মুরগি ও ম্লেচ্ছ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তিনি এমন সব মতামত দিতেন, যা আমাদের কানে বাজত। আমার বাবা ছিলেন বেশ ভোজনবিলাসী, আর মা ছিলেন চিররুগ্ণা। সেজন্য আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে দেশী-বিদেশী নানা রকমের রান্না হত। দাদাভাই ও মাজননী উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকলে আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতে হত। এলগিন রোডের বাড়িতে তো আমিষ ও নিরামিষ রান্নার আলাদা ব্যবস্থা সব সময়েই দেখেছি। ডাক্তারের পরামর্শে আমার মাকে নিয়মিত মুরগি খেতে দেওয়া হত। মাজননী বলতেন, স্বাস্থ্যের জন্য মুরগি খেতে তাঁর আপত্তি নেই, তিনিও নাকি কখনও কখনও ডাক্তারি মতে অসুখে-বিসুখে মুরগির সুপ খেয়েছেন। কিন্তু মুরগি খাওয়া শেষ হলেই তিনি নাকি কাপড়-চোপড় বদলে ফেলতেন! আমরা বিস্ময়ে ভাবতাম, পেটে তো মুরগি রইলই, কাপড়টা বদলে লাভ কী!

তাঁর হাতের সব কাজই ছিল নিখুঁত। হাতের লেখার কথা তো আগেই বলেছি। সেলাইয়ের কাজও তাই। যাকে ইংরেজিতে বলে পারফেকশনিস্ট। তাঁর হাতের তৈরি চন্দ্রপুলি খাবার জন্য আমরা লাইন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম বলা চলে। কেনাকাটার ব্যাপারে তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। এলগিন রোডের বাড়িতে মাজননীর আম কেনা ছিল দেখবার মতো ব্যাপার। সেকালে আমওয়ালারা কিলো হিসাবে নয়, শ'য়ে শ'য়ে বিক্রি করত বাড়িতে এসে। দরাদরিতে আমওয়ালারা মাজননীর কাছে তো হার মানতই, একশো আম বিক্রি করেও একটাও নিকৃষ্ট বা পচা বা কাঁচা ফল চালাতে পারত না।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে আজকের মতো শেষ করি। ছেলেবেলা থেকে রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র তো তাঁর মা-বাবার অনেক চিন্তার কারণ হয়েছেন, তাঁর অনেক পাগলামি তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। ১৯২১ সাল। ছেলে তো ঠিক করে বসে আছেন যে, আই সি এস ছেড়ে দেবেন। দেশের কাজে ঝাঁপ দেবেন। বাবা জানকীনাথ বোঝাবার চেষ্টা করছেন, দেশে ফিরে ভেবেচিন্তে ঠিক করলেই তো হয়। মা প্রভাবতী মন্তব্য করলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের মন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তোমরা বোধ করি জানো, মহাত্মা গান্ধী তখন সবেমাত্র দেশকে অসহযোগের পথে ডাক দিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

আমার অন্নপ্রাশন হয়নি, শরীর খারাপ ছিল বলে। মা পরে আমাকে একথা জানিয়ে বলেছিলেন, পুরুত মশাই বিধান দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, অন্নপ্রাশন বিয়ের সময় হবে। পদে-পদে পুরুতমশাইদের বিধান মেনে আমাদের চলতে হত। আর এক সমস্যা হল ইস্কুলে যাবার সময়, তখনও পর্যন্ত একটা ভাল নাম রাখা হয়নি। যেদিন ইস্কুলে ভর্তি হতে যাব, ভোরে বাবা-মা তাঁদের ঘরে ডাকলেন। শীতের সকালে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভিজে মাঠের দিকে চেয়ে নাম দিয়ে ফেললেন—শিশিরকুমার। নিজের নাম বোধ করি অনেকেরই পছন্দ হয় না। পরে আমারও মনে হয়েছে নামটা অন্যরকম হলেও তো হত। তবে একটা কথা ভেবে আমার খুব ভাল লাগে। সেটা এই যে, আমার নাম রেখেছিলেন আমার বাবা-মা। অন্য কেউ নয়।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের নাম রাখা নিয়ে প্রায়ই সমস্যা দেখা দিত। বাড়িতে লোক তো অনেক, নানা মত। আমার মা এ-বিষয়ে রাঙাকাকাবাবুর পরামর্শ নিতেন। রাঙাকাকাবাবু যে-সব নাম দিতেন, অনেকেরই সেগুলো পছন্দ হত না। তাছাড়া তিনি প্রায়ই একসঙ্গে অনেকগুলি নাম তুলতেন। সমস্যা সমাধানের জন্য ঠাট্টা করে বলতেন, "যতগুলি নাম এসেছে সবগুলোই রেখে দেওয়া যাক ; যার নাম সে বড় হয়ে একটা বেছে নেবে।"

সেকালে, বিশেষ করে আমাদের আগের জেনারেশনে, ছেলেমেয়েদের নাম মিলিয়ে রাখার একটা রেওয়াজ ছিল। দাদাভাই মাজননী সেই ধারা অনুসরণ করে তাঁদের আট ছেলের নাম 'শ' বা 'স' দিয়ে রেখেছিলেন এবং সকলেরই নামের শেষ 'চন্দ্র'। নামগুলো বলি—সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, শৈলেশচন্দ্র ও সন্তোষচন্দ্র। ফলে সকলেই ইংরেজিতে এস্ সি বোস। বুঝতেই পারছ, এত বড় পরিবার, সব ছেলের নাম যদি এক ধরনের হয় গোলমালের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ধরো, এস্ সি বোসের নামে চিঠি এল। পাবে কে ? একান্নবর্তী পরিবার, শ'য়ে শ'য়ে কাপড়জামা, চাদর, ওয়াড় ইত্যাদি ধোপার বাড়ি যায়, কী করে সামলানো যায় ! প্রত্যেকটি কাপড়-জামায় সুন্দর করে সেলাই করে নম্বর দেওয়া থাকত। যেমন, আমরা মেজ ছেলের পরিবার। আমাদের ছিল দু'নম্বর। দু'নম্বর মার্কা কাপড় মেজ ছেলের ঘরে যেত।

কত নম্বরের বৌ, এ-সমস্যাও কখনও-কখনও দেখা দিত। মাজননীর ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ বসু-বাড়িতেই থাকতেন, অন্যরাও প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন। সেকালে বাড়ির বৌয়েরা শ্বশুরকুলের বড়দের সামনে (শ্বশুর, ভাশুর ইত্যাদি) বেরোতেন না, কথাও বলতেন না। সামনে পড়ে গেলে লম্বা ঘোমটা টেনে ঘুরে দাঁড়াতেন। ধরো, এক মামাশ্বশুর কিছু বলবেন। তিনি জানবেন কী করে কত নম্বরের বৌ ? বৌকে ইশারায় আঙুল গুনে দেখিয়ে দিতে হত কত নম্বর !

আমার তখন বছর চারেক বয়স, রাঙাকাকাবাবু, বাবা, মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন (বসুবাড়ির দু'নম্বর ও ছ'নম্বর) সাবেক বাড়ি ৩৮/২ এলগিন রোড থেকে পাশের বাড়ি ৩৮/১ এলগিন রোডে উঠে গেলাম। এর দুটো ফল হল। এক, বাবা-মা সাংসারিক দিক থেকে খানিকটা স্বাধীন হলেন ; দুই, রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা বিশেষ সম্পর্কের শুরু হল।

শুনেছি বাবা মেজ ছেলে হলেও ব্যক্তিত্বের জোরে ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে তাঁর বেশ প্রাধান্য ছিল। ছেলেবেলায় বাবা ও তাঁর বড় ভাই আমাদের জ্যাঠাবাবু সতীশচন্দ্র খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দুজনেরই সাহিত্যে খুব অনুরাগ ছিল—ইংরেজি সাহিত্যে। অনেক নাম-করা লেখা, নাটক, কবিতা, বক্তৃতা ইত্যাদি তাঁদের কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যায় কটকে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে তাঁরা আবৃত্তি করতেন, জোর গলায় বক্তৃতা অভ্যাস করতেন। দেখতেন কার গলা কতদূর যায়। দুজনেই পরে ব্যারিস্টার হন। ব্যারিস্টার হিসাবে বাবার নামডাক বেশি হলেও বাবা প্রায়ই আইন বিষয়ে তাঁর দাদার গভীর জ্ঞানের কথা বলতেন। রাঙাকাকাবাবু যে এক অতি অসাধারণ মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই বাবা তা কী করে বুঝলেন বলা শক্ত। বিশেষ করে যখন অন্য অনেকেই ভাবতেন যে, সুভাষ ছেলেটি বদ্ধ পাগল। জীবনে ওর কিছুই হবে না। ছেলেবেলায় রাঙাকাকাবাবু যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলি বাবা খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। আই সি এস থেকে পদত্যাগ করার সময়ও রাঙাকাকাবাবু যে

লম্বা-লম্বা চিঠি বাবাকে লিখেছিলেন, সেগুলিও রয়েছে।

বসু-বাড়িতে বাবাই প্রথম বিলেত যান। এ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগের কথা। বিলেতের জীবনযাত্রা তো অন্যরকম—পোশাক-আশাক; খাওয়া-দাওয়া, সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি। বাবা খুব খোলা মনে বিলেতের যা-কিছু ভাল এবং গ্রহণযোগ্য তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। ভাল সাহেবি পোশাক ও ভাল বিলিতি খাবার তিনি ভালবাসতেন। আসল কথা হল সব কিছু উঁচু মানের হওয়া চাই—সেটা দেশী হোক বা বিদেশীই হোক। শরৎ বোস সাহেবের উৎকৃষ্ট চুরুট খাওয়ার কথা তো অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি জীবনে কোনদিন কোনো মাদক পানীয় বা নিষিদ্ধ মাংস স্পর্শ করেননি।

এ-ব্যাপারে এক মজার গল্প প্রায়ই বাবা বলতেন। ব্যারিস্টারি পড়বার সময় নিয়মমাফিক বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ডিনার খেতে হত। বাবা যে টেবিলে বসবেন, সেই টেবিলে জায়গা পাবার জন্য যাঁরা মাদক পানীয়তে আসক্ত তাঁদের মধ্যে এক ভাগ বেশি পাবার আশায় কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

এদিকে বিলেত যাবার অনেক আগে থেকেই বাবা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রাস্তায় রাস্তায় দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। বিলেতে থাকার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে বাবা প্যারিসে বেড়াতে যান। প্যারিসে তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মহীয়সী বিপ্লবী নেত্রী মাদাম্ গন্ ম্যাক্‌ব্রাইড নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মাদাম্ গন্ তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন, দেখে নিও, এই যুবকটি একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে একজন হবে।

আমাদের বংশে বাবাই প্রথম বিলেত যান। বিলেত যাওয়া মানে তো কালাপানি পার হওয়া। সুতরাং শাস্ত্রে অশুদ্ধ! দেশে ফেরার পর সামাজিক সংস্কার রক্ষা করতে বাবাকে বেশ ঘটা করে আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

আমি জন্মাবার আগেই বাবা পেশাগত ভাবে অনেক উপরে উঠে গেছেন। আইন-ব্যবসায় কৃতী হতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, বাবাকেও সারাদিন কোর্ট করার পরও রোজ অনেক রাত পর্যন্ত খাটতে হত। ভোর থেকেই আবার কাজ শুরু। সুতরাং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হত কম। মা'র কাছে শুনেছি বহুদিন ধরে বাবা ছেলেমেয়েদের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে আসতেন। বাবার সঙ্গ আমরা ভাল করে পেতাম কোর্টের ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে। সেখানে কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো সবই সকলকে নিয়ে। গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা পুরোদমে চলত। বেশ কিছুদিন আমি বাড়ির ছোট ছেলে ছিলাম। সেজন্য আমার প্রতি বাবার খানিকটা পক্ষপাতিত্ব জন্মে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। আমার পরের বোন গীতার ক্ষেত্রেও বোধহয় একই কথা বলা যায়।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবু গ্রেফতার হন। আমরা তখন বাবা-মা'র সঙ্গে কাশ্মীর থেকে ফিরছি। কিছুদিন পরেই ইংরেজ সরকার রাঙাকাকাবাবুকে বর্মায় পাঠিয়ে দেয়। বর্মায় নির্বাসিত হবার আগে রাঙাকাকাবাবুর কথা আমার বিশেষ মনে নেই; কারণ তখন আমি নেহাতই ছোট। কিন্তু ১৯২৪ সালে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বাড়ি-বদলের সময় থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত বাবা-মা ও আমাদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কে

কোনোদিন কোনো ছেদ পড়েনি। তিনি জেলেই থাকুন বা দূর বিদেশেই থাকুন, রাঙাকাকাবাবু কোনো-না-কোনোভাবে যেন সব সময়েই আমাদের মধ্যে উপস্থিত। অবশ্য এর মূলে ছিল আমার বাবা-মা'র সঙ্গে তাঁর এক আশ্চর্য ও বিশেষ সম্পর্ক।

॥ ৫ ॥

মেয়ে পছন্দ করে সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার পরেও বেশ কিছুদিন আমার মা'র বিয়ে আটকে ছিল। কারণ বাড়ির বড় ছেলে আমার জ্যাঠাবাবুর শাস্ত্রীয় মতে সম্বন্ধ পেতে দেরি হচ্ছিল। তোমরা জানো কি না জানি না, বহুদিন কায়স্থ-সমাজে কুলীন ও মৌলিক এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে চলত না। প্রায় বারো পুরুষ আগে আমাদের এক নামকরা পূর্বসূরী গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ ঠিক করেন যে, নিয়মটা কেবল বড় ছেলের বেলায় মানলেই চলবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জ্যাঠাবাবুর ভাল কুলীনের ঘরে সম্বন্ধ পাওয়া গেল এবং বড় ও মেজ ভাইয়ের একই সঙ্গে বিয়ে হল। মা'র বয়স তখন চোদ্দ, আর জ্যাঠাইমার বয়স আরও কম। দুজনেই পরস্পরকে দিদি বলে ডাকতেন, কারণ একজন বয়সে বড়, অন্যজন সম্পর্কে বড়।

বিয়ে আটকে যাওয়ায় আমার দাদামণি ও দিদিমণি (আমরা দাদামশাই ও দিদিমাকে ঐভাবে ডাকতাম) অস্থির হয়ে পড়লেন। লোকে বলতে লাগল, মফস্বলের কোন্ এক উকিলের ছেলের জন্য অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকবে? দাদামণি অক্ষয়কুমার দে দাদাভাই জানকীনাথকে ধরলেন, অন্তত পাকা দেখাটা করে রাখা যাক। দাদাভাই বললেন, আমার মুখের কথাই পাকা, অনুষ্ঠান করে পাকা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই থেকে বাড়ির ছেলেদের বিয়েতে পাকা দেখা উঠে গেল। সকলে একটা শিক্ষাও পেলেন—মুখের কথার দাম যে দেয়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান তার কাছে বড় নয়।

মা বিভাবতী ছিলেন উত্তর কলকাতার এক বনেদি পরিবার পটলডাঙার দে-বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে। এক বোন, এক ভাই। শুনেছি ছেলেবেলায় বোনের দাপটই ছিল বেশি, আর ভালমানুষ দাঁদা (আমাদের মামাবাবু) বোনের সব আবদার ও হুকুম মেনে চলতেন। পরিবারটি ছিল বসু-বাড়ির মতো আর একটি বিরাট একান্নবর্তী সংস্থা। কলেজ স্কোয়ারে সংস্কৃত কলেজের উল্টো দিকে প্রকাণ্ড চকমেলানো বাড়িতে অসংখ্য লোক বাস করতেন। বইয়ের দোকানের দৌলতে তোমরা নিশ্চয়ই শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের নাম শুনেছ। শ্যামাচরণ ছিলেন আমার দাদামণি অক্ষয়কুমারের জ্যাঠামশাই। কলেজ স্কোয়ারে আমাদের মামার বাড়ির বাইরের ঘরটিতে এক বিরাট ফরাস পাতা থাকত ও বড়-বড় তাকিয়া সেখানে গড়াগড়ি দিত। শ্যামাচরণের সময় ঐ বাইরের ঘরে সেইসময়কার অনেক জ্ঞানীগুণী লোক নিয়মিত জমায়েত হতেন এবং আড্ডা দিতেন। তার মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরের জেনারেশনে পটলডাঙ্গার দে-বিশ্বাসরা বেশ কয়টি নামকরা জামাই পেয়েছেন, যেমন শরৎচন্দ্র বসু, রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ও নরেন্দ্রকুমার বসু।

দাদামণি ওকালতি করতেন। ফিটফাট একটি ঘোড়ার গাড়ি চেপে কোর্টে বেরোতেন। তাঁর জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত এবং সত্যিকারের রসিক লোক ছিলেন তিনি। জীবনের সব

ভাল দিকগুলি উপভোগ করতে চাইতেন—সংস্কার-মুক্ত মন ছিল তাঁর। বাড়ির গোঁড়ামি অগ্রাহ্য করে সে সময়কার সেরা সাহেবি রেস্টোরান্ট ফিরপো-পেলিটিতে গিয়ে ভাল মাংস ইত্যাদি খেয়ে আসতেন। বেশ মনে আছে, জীবনে প্রথম সিনেমা দেখেছি দাদামণির সঙ্গে। ভাল চা ও উৎকৃষ্ট লস্যি মানুষকে কী আনন্দ দিতে পারে সেটা দাদামণির মধ্যে দেখেছি। বুড়ো বয়সেও, যখন একটি দাঁতও অবশিষ্ট নেই, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাংসের হাড় চিবিয়ে খেতেন। অন্যদিকে আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও ঝোঁক ছিল খুব। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর হীরো। কলকাতার টাউন হলে "সুরেন বাঁড়ুজ্যে"র ভাল-ভাল বক্তৃতা অনর্গল আমাদের শুনিয়ে যেতেন।

একমাত্র মেয়ে বিভা ছিল দাদামণির চোখের মণি। শ্বশুরবাড়িতে মেয়েকে দেখতে প্রায়ই কোর্ট-ফেরত উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আসতেন। তবে বেশি সময় এক জায়গায় তিনি বসতে পারতেন না। "বিভা, বিভা" বলে হাঁকতে-হাঁকতে ঝড়ের মতো আসতেন, চায়ের কাপ শেষ হতে না হতেই আবার হাঁকতেন, "চললুম" আর সবেগে প্রস্থান করতেন। শুনেছি বিয়ের দিন জামাইকে দেখে প্রথমত দিদিমণি খুব উৎসাহিত হননি। কিন্তু দাদামণি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, জামাই অনেক বড় হবে এবং তাঁর মেয়ে "রাজরানি" হবে। পরে বাবার দুটি লম্বা জেল-বাসের সময় দাদামণি দুঃখ করে মা'কে বলতেন—তাকে তো আমি সত্যিই রাজরানি করে দিয়েছিলুম, তবে এ কী হল! রাজরানি রাজরোষে পড়েছিলেন।

ছেলেবেলায় দাদামণি ছিলেন আমাদের খেলার সাথী। পরে কলেজের ছাত্র হবার পর মামার বাড়িতে অন্য কারণে দাদামণিই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রধান আকর্ষণ। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতাম। সুরেন বাঁড়ুজ্যের পুরনো রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি খোলা মনে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি ও দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ ও ধারা বোঝবার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে নেতাজির রেডিও-বক্তৃতা তিনি নিয়মিত মন দিয়ে শুনতেন। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামের আহ্বানে সত্তর বছরের বৃদ্ধও উত্তেজিত হয়ে হাতের মুঠো শক্ত করে পায়চারি করতে আরম্ভ করতেন।

দিদিমণি সুবালা নাতি-নাতনিদের নিয়ে খানিকটা বাড়াবাড়ি করতেন বলা চলে। তবে আবার বেশ রাশভারী ও অভিমানী মহিলা ছিলেন। আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গোঁড়ামি ছিল যথেষ্ট। সেকালে তাঁর মতো এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে ছোট পরিবার বড় একটা দেখা যেত না। জামাই তো বড়ই ব্যস্ত, দেখা পাওয়াই ভার। সেজন্য আদর-আপ্যায়নের সিংহভাগ নাতি-নাতনিরাই পেত। শেষ জীবনটা ছিল গভীর শোকের। জামাই ও একমাত্র মেয়ের মৃত্যু তাঁকে দেখে যেতে হয়েছিল।

মামাবাবু অজিতকুমার দে-কে বাদ দিয়ে আমাদের ছেলেবেলা বা ছাত্রজীবনের কথা ভাবতেই পারি না। বাবা সেই সময় দু'বারে আট বছর জেলে ছিলেন। প্রথমবার আমি স্কুলে পড়ি। দ্বিতীয়বার আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমার সামান্য জীবনের একটা বড় ঘটনা এই যে, দ্বিতীয়বার আমিও বাবার বন্দী-জীবনের ভাগ পেয়েছিলাম এবং বেশ কিছুদিন জেলবাস করেছিলাম। যাই হোক, আমার মা দু'বারই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েছিলেন। মামাবাবু—আমরা তাঁকে ডাকতুম মাম বলে—অতি সহজভাবেই আমাদের দেখাশুনোর ভার তুলে নিলেন। তাঁর

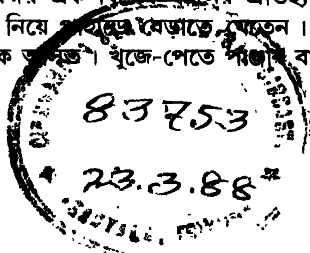
মনটা ছিল খুব নরম, উগ্রপন্থী রাজনীতি তাঁর জন্য ছিল না। কিন্তু আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের সময় তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তিনি আমাদের আগলে রেখেছিলেন।

আমার মনে হয় মামার বাড়ির পারিবারিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে ছিলেন বাড়ির বৌমা ও আমাদের মামিমা রেণু বা সুরমা। বাঙালির ঘরে বৌমার প্রকৃত কল্যাণময় রূপ আমি মামিমার মধ্যে দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর ছোট মেয়ে। সম্ভ্রান্ত পরিবার। সকলের সেবাযত্ন করাই যেন মামিমার জীবনের ব্রত ছিল। নিজের পরিবারের ও বাইরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও রুচির লোকেদের তিনি ঠিক সামলে রাখতে পারতেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনের পুরোটাই আমি মামিমার সহৃদয় আতিথ্য পেয়েছি। মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের প্রোগ্রাম সকাল থেকে সন্ধ্যা। মামারবাড়ি কলেজের কাছেই, সুতরাং মামিমার কাছে দুপুরের মাছ-ভাত খাওয়াটা পাকাপাকিভাবে বরাদ্দ। যুদ্ধের সময় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজবন্দী হয়ে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে কিছুদিন ছিলাম। মামিমার রান্না-করা পথ্য পুলিস-পাহারা পেরিয়ে আমার কাছে পৌঁছে যেত।

॥ ৬ ॥

আমি যে যুগে জন্মেছি সেটা ছিল অসহযোগের যুগ। গান্ধীজী তাঁর অহিংসা অসহযোগের মন্ত্র দিয়ে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন। বিদেশী সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হবে। তাঁর প্রভাব থেকে ছেলে-বুড়ো কেউ বাদ পড়েনি। প্রাথমিক স্কুল থেকে আরম্ভ করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমি ও আমার সমবয়সীরা সেই খাঁটি স্বদেশিয়ানার মধ্যে বড় হয়েছি। আমার মনে হয় বসুবাড়ির যাঁরা কলকাতায় থাকতেন, তাঁদের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বেশি। এর কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র তো দেশের ডাকে আই সি এস ত্যাগ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দলে যোগ দিয়েছেন। বাবার সঙ্গে ছিল রাঙাকাকাবাবুর বিশেষ সম্পর্ক। বাবাও অল্পদিনের মধ্যে দেশবন্ধুর এক প্রধান সহযোগী হয়ে উঠলেন। আর বাবা ও রাঙাকাকাবাবু যাই করুন না কেন, তাতেই আমার মায়ের সায় ছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমাদের শিশুজীবন ও কৈশোর সব দিক দিয়ে স্বদেশী-প্রভাবিত ছিল। অবশ্য আমি এটা বলছি না যে বসু-বাড়িতে এর ব্যতিক্রম ছিল না।

গান্ধীজী দেশকে জাগিয়েছিলেন প্রধানত চরকা ও খদ্দরের মাধ্যমে। আমাদের বাড়িতে কোন ব্যাপারেই, ছোটদের বেলাতেও, খদ্দর ছাড়া কিছু চলবে না। সব জামাকাপড়, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ধুতি, শাড়ি, গায়ের চাদর, জানালা-দরজার পরদা, সবই খদ্দরের। সেকালে কিন্তু আজকালকার মতো মোলায়েম খদ্দর পাওয়া যেত না। মোটা খদ্দরের কাপড়জামা পরতে হত। বাবা কোর্টের পোশাকও খদ্দরের পরতেন। কোন বিশেষ কারণে সিল্ক পরতে হলে, সেটাও পুরোপুরি দেশী সিল্ক হওয়া চাই। আজও সেজন্য আমাদের কাছে খদ্দর এক বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পরিধান। আগেই তো বলেছি, বাবা-মা আমাদের নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন। সেকালে ভাল গরম কাপড় বেশির ভাগই বিলেত থেকে আসত। খুঁজে-পেতে পাঞ্জাব বা কাশ্মীরে তৈরি গরম কাপড়



যোগাড় করে মা আমাদের গরম কাপড়-জামা বানিয়ে দিতেন।

খদ্দর পরা ছাড়া বাড়ির যাঁরাই পারতেন চরকাতে বা তকলিতে সুতো কাটতেন। সেই সুতো দিয়ে আবার কাপড় তৈরি করতে দেওয়া হত। যাঁরা এটা পারতেন, তাঁরা বিশেষ গৌরবের অধিকারী হতেন। আমারও মনে আছে খানিকটা বড় হবার পর আমিও তকলিতে অনেক সুতো কেটেছি। তোমরা হয়তো ভাবছ আমি খদ্দর নিয়ে এত কথা বলছি কেন। বড় কথা হল যে, খাদি ও চরকার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেশের নবজাগরণের শরিক হয়েছিলাম। বিলেতি কাপড় পরা বা বিলেতি জিনিস ব্যবহার করা ছোট বয়স থেকেই আমাদের কাছে লজ্জার কথা বলে মনে হত। যাঁরা তা করতেন, তাঁদের আমরা কৃপার চোখে দেখতাম এবং আমাদের হিসাবে তাঁরা ছিলেন বিজাতীয়।

রাঙাকাকাবাবু ১৯২৪ সালের শেষ থেকে ১৯২৭-এর প্রথম পর্যন্ত বর্মায় বন্দী ছিলেন। ঐ সময় তিনি বাবা-মাকে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে খদ্দর, সুতো-কাটা, কাপড়-বোনা সম্বন্ধেও তিনি খোঁজ-খবর নিতেন। এই সূত্রে বহু দিন পরের, ১৯৩৭ সালের একটা কথা মনে পড়ল। ততদিনে খদ্দরের ঝোঁকটা দেশে অনেকটা কমে এসেছে। তাছাড়া অনেক দেশী মিলের কাপড় চালু হয়েছে। রাঙাকাকাবাবু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, এলগিন রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছি, গায়ে একটি মিলের কাপড়ের শার্ট। সম্ভাষণের পর বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এবং শেষে গম্ভীরভাবে বললেন, "কী, খদ্দর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাকি?" আমি আমতা-আমতা করলাম। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, পুরোপুরি খদ্দরেই ফিরে যাওয়া যাক।

আমাকে যখন কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করা হবে স্থির হল, তখনও পুরোপুরি দেশী কোনো স্কুলে ঐ বিভাগ চালু ছিল না। ভবানীপুরের মেয়েদের স্কুল ডায়োসেশনে আমাকে ভর্তি করা হল। ঐ মিশনারি স্কুলের নীচের কয়েকটি ক্লাসে অল্প সংখ্যায় ছেলেদের নেওয়া হত, এখনও হয় শুনেছি। স্কুলের কর্ত্রী তখন ছিলেন একজন জাঁদরেল মিশনারি মহিলা—ডরোথি ফ্রান্সেস। দেখলেই ভয় করত, ফলে স্কুলের ডিসিপ্লিন ভাল ছিল। শিক্ষয়িত্রীরা কিন্তু বেশির ভাগই বাঙালি ছিলেন এবং আমাদের খুব আদরযত্ন করতেন। কলকাতার বহু অভিজাত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঐ স্কুলে পড়ত। সাহেবঘেঁষা ও কর্তা-ভজা পরিবারের অবশ্য অভাব ছিল না। তাঁদের জন্য কয়েকটি সাহেবি স্কুল ছিল।

রাঙাকাকাবাবুকে আমার মা ডাকতেন 'ছোটদা'। ছোটদা তাঁর মেজবৌদিদিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে নিজের মতামত জানাতেন ও পরামর্শ দিতেন—সে তিনি জেলেই থাকুন বা বিদেশেই থাকুন। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবুর মতামত খুব ব্যাপক, প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক ছিল। শিশুমনের যাতে সার্বিক বিকাশ হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য রাঙাকাকাবাবু মাকে নানারকম পরামর্শ দিতেন। ডায়োসেশন স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য হাতের কাজ, গান-বাজনা, খেলাধুলা ইত্যাদির মোটামুটি ভাল ব্যবস্থাই ছিল। আমার মনে আছে আমি নিজে লেখাপড়ার চেয়ে হাতের কাজে বেশি আগ্রহী ছিলাম এবং ডায়োসেশনে প্রাইজ্ যা-কিছু পেতাম তা হাতের কাজের জন্য, লেখাপড়ায় নয়। কিন্তু স্কুলের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে এই ভেবে রাঙাকাকাবাবুর পরামর্শে বাবা-মা ছবি আঁকা শেখাবার জন্য আমার খুব কম বয়সেই একজন মাস্টারমশাই রেখে দিলেন। আমার দিদি মীরাকেও কিছুদিন পরে ঐ শিক্ষায় আমার সঙ্গী করে দেওয়া হল। আমি কোনদিনও

ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শী হতে পারলাম না, কিন্তু মাস্টারমশাই শ্রীহরেন সেনগুপ্ত আমার মধ্যে শিল্প ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে এমন একটা রুচি ও ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যেটা পরবর্তী জীবনে আমার খুব কাজে লেগেছে। আমাদের মাস্টারমশাইরা যে বাবা-মা'র কল্যাণে সহজেই আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে যেতেন তাই নয়, বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর দেশের কাজেও তাঁরা অংশীদার হতেন। যে হরেন সেনগুপ্তমশাই আমার শিশু বয়সের আর্টের শিক্ষক, তিনি বৃদ্ধবয়সে আজও নেতাজীর কাজ করে চলেছেন। আজকের নেতাজী মিউজিয়মের সব তৈলচিত্রই তাঁর আঁকা।

ছেলেবেলায় অসুখ-বিসুখ তো আমার লেগেই থাকত। মাকে সেজন্য অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। মা হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসার বই হাতের কাছে রাখতেন, আর থাকত একটা কাঠের বাক্সে সুন্দরভাবে সাজানো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোটছোট শিশি। হোমিওপ্যাথিক গুলি তো খেতে ভাল, খেয়েছিও অনেক। কবিরাজী চিকিৎসারও বাড়িতে বেশ চলন ছিল। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও দাদাভাইয়ের বিশেষ সুহৃদ শ্যামাদাস বাচস্পতির কথা তো আগেই বলেছি। কবিরাজী ওষুধ তৈরি করতে হাঙ্গামা অনেক এবং সবক্ষেত্রে তা সুস্বাদুও নয়। কিন্তু মা ওষুধ ও রুগির পথ্য হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালে না বলবার উপায় ছিল না। অ্যালোপ্যাথিও চলত পাশাপাশি, কারণ আমাদের নতুনকাকাবাবু সুনীলচন্দ্র ছিলেন বিলেত-ফেরত ডাক্তার। তিনি নিজে তো আছেনই, অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞ বন্ধুদেরও প্রয়োজনমতো হাজির করতেন।

বাড়ির অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে, রাঙাকাকাবাবুর মতামত ছিল বিজ্ঞানধর্মী। যেমন ধরো, আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে এবং ক্রমাগত তেতো কুইনিন মিকসচার গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু মাকে লিখলেন, কেবল ওষুধ খাওয়ালেই তো চলবে না, রোগের মূল কারণ বের করে তার প্রতিবিধান করতে হবে। বললেন, বাড়িতে মশার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করুন। দিদির হল টাইফয়েড, রাঙাকাকাবাবু বলে পাঠালেন, বাড়িতে এত সংক্রামক রোগ কেন হয়, এ-বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। রাঙাকাকাবাবুর নিজেরও অসুখ-বিসুখ কম করেনি। পরে ১৯৩৬ সালে আমাদের কার্শিয়ঙের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকবার সময় দেখেছি, আধাডাক্তারি ও গৃহচিকিৎসার বই পড়ছেন। কিছুদিন আগেই ইউরোপে তাঁর পেটে অপারেশন হয়েছিল। দেখলাম গল ব্লাডার বা পিত্তকোষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। তাঁর প্রায়ই সায়াটিকার ব্যথা হত, শরীরের এই বিশেষ নার্ভ সম্বন্ধে দেখলাম তিনি বেশ ওয়াকিবহাল। নানা রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর বেশ জ্ঞান থাকায় তাঁর আর একটি সুবিধা হয়েছিল। প্রয়োজন হলে জেলের কর্তৃপক্ষ বা পুলিসকে বেশ ধোঁকা দিতে পারতেন।

॥ ৭ ॥

১৯৩৪ সাল। বাবা তখন কার্শিয়ঙে গিধাপাহাড়ে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে আছেন। হঠাৎ এক সকালে কার্শিয়ঙের বাড়ির চৌকিদার আমাদের কলকাতার ১ নং উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে উপস্থিত। এসেই মা'র সঙ্গে কিছু গোপন কথাবার্তা। লুকিয়ে এসেছে। বাবা কিছু জরুরি গোপনীয় কাগজপত্র কালু সিংয়ের মারফত পাঠিয়েছেন। মা'র

হাতে সেগুলি নিরাপদে সমর্পণ করে কালু সিং হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।.

কালু সিং নেপালি ব্রাহ্মণ। কার্শিয়ঙে যে বিদেশী সাহেবের কাছ থেকে বাবা বাড়িটি কিনেছিলেন, তারও সে চৌকিদার ছিল। বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে সে বাবার চৌকিদার হয়ে গেল। সপরিবারে সে আমাদের বাড়ির এলাকার মধ্যেই থাকত। বাবার প্রতি তার আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণ, এবং বাবাও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। পরে ১৯৩৬ সালে রাঙাকাকাবাবু যখন বাবার মতো কার্শিয়ঙের বাড়িতে অন্তরীণ হন, তখন তাঁর সঙ্গেও কালু সিংয়ের একই রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রথমেই কালু সিংয়ের যে গোপনযাত্রার কথা বললাম, তার বিবরণ পরে শুনেছিলাম। বাবা ঠিক করলেন যে, একটা জরুরি বার্তা পুলিসের চোখ এড়িয়ে মা'র হাতে পৌঁছে দেওয়া দরকার। কালু সিং কাগজপত্র তার জুতার মধ্যে রাখল। তারপর যেন একটু বেড়াতে যাবার ভান করে রাস্তায় নেমে এল। আমাদের বাড়িটা ছিল কার্শিয়ঙ শহর থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। বাড়ির কাছ দিয়েই গয়াবাড়ি ও তিনধরিয়া পর্যন্ত একটা পাহাড়ি রাস্তা বা. পাকদণ্ডি নেমে গেছে। পাহারাওয়ালারা দেখল কালু সিং নিয়মমাফিক পাকদণ্ডির দিকে একটু ঘোরাফেরা করছে। তাদের অগোচরে সে পাকদণ্ডি ধরে গয়াবাড়ি পৌঁছে গেল। গয়াবাড়ি থেকে পাহাড়ি ছোট ট্রেন ধরে শিলিগুড়ি। তারপর শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেলে চেপে সোজা কলকাতা। বাবা ছাড়া আর কেউ জানলেন না যে, কালু সিং কোথায় গেছে।

আগেই তো বলেছি, বাবা কালু সিংকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। অন্য পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার সময়ও কালু সিংকে আনিয়ে নিতেন। সে হত আমাদের যাত্রার ম্যানেজার আর ছোট ছেলেমেয়েদের ভারও তারই। সে যেমন খুব ডিসিপ্লিনের ভক্ত ছিল এবং আমদের খুব কড়া শাসনে রাখত, তেমনই আমাদের খেলার সাথীও ছিল। বাড়িতে কোনো বিয়ে বা অন্য কোনো বড় অনুষ্ঠান উপলক্ষেও কালু সিং কলকাতায় চলে আসত এবং বাবাও তাকে বিশেষ কোনো দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

বাবার কাছে শুনেছি, এবং দেখেছিও কার্শিয়ঙে একলা অন্তরীণ থাকার সময় কালু সিং রোজ সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প ও নানা বিষয়ে আলোচনা করত। কেবল সাংসারিক কথাবার্তাই নয়। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে বাড়ির কর্তা ও চৌকিদারের মধ্যে আলোচনা হত। বাবা নিজেই বলেছেন, অনেক ব্যাপারে কালু সিংয়ের মতামত তিনি মেনে নিতেন।

রাঙাকাকাবাবুরও ঠিক একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে কী কী ভাবে বেকায়দায় ফেলা যায়, এরকম বিষয় নিয়েও কালু সিং লামা সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলোচনা করত। সে তো ইংরেজি লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু তার বুদ্ধি ও কমনসেন্স ছিল প্রখর, বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে সে রাজনীতির অনেকটাই বুঝে ফেলেছিল। ক্রমে-ক্রমে আমাদের প্রকাণ্ড পরিবারের প্রায় সকলকেই সে চিনে ফেলেছিল। আমাকে সে পরে বলত যে, ঐ দুই ভাইকে দেখবার বা জানবার পর, আর কাউকে তার তেমন পছন্দ হত না।

আগেই তো বলেছি শিশুবয়সে কাশ্মীরে কালু সিং আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। হয়তো বা সেজন্যই তার সঙ্গে আমার এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছাত্রাবস্থায় আমি বাবা-মা'র

মত নিয়ে একলাই কার্শিয়ঙে কালু সিংয়ের হেফাজতে থেকেছি। যে পাহাড়ের গায়ে আমাদের বাড়ি, তার নাম গিধাপাহাড় । কালু সিংয়ের মতে নামটা এসেছিল 'গৃধ' বা শকুন থেকে, কারণ পাহাড়ের চূড়োটা ছিল শকুনের মাথার মতো। গিধাপাহাড় ছিল আমাদের, বিশেষ করে আমার, ছেলেবেলার অতি প্রিয় ও আনন্দের জায়গা। সেখানেই আমরা বাবা-মা'কে একসঙ্গে খুব কাছে পেতাম। আর কালু সিংয়ের তদারকিতে সবকিছুই ছোটদের মনের মতো চলত। সেই তো আমাকে প্রথম পাহাড়ে চড়তে শেখায়। বাড়ি থেকে গিধাপাহাড়ের চূড়োটা পর্যন্ত ওঠা ছিল এই শিক্ষার প্রথম ধাপ। তারপর সে আমাকে গিধাপাহাড়ের চেয়ে আরও খানিকটা উঁচু আর একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল, যেখান থেকে আমাদের জল আসত। শেষ পর্যন্ত কালু সিং আমাকে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অজানা এক পথে কার্শিয়ঙ স্টেশনে পৌঁছে দিল। মনে আছে যাত্রাটা আমার চিত্তে বেশ শিহরণ জাগিয়েছিল।

কালু সিংয়ের পারিবারিক জীবন ছিল বড়ই শোকের। তার চার ছেলে একের পর এক মারা যায়। বাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, বুড়ো বয়সে সে যাতে একটু আরামে থাকতে পারে, সেজন্য আলাদা একটু জমিতে তার জন্য ছোট একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন। বাবার অকালমৃত্যুর জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। বাবার মৃত্যুর বছর তিনেক পরেই সে মারা যায়। শেষ বিদায়ের দিন-কতক আগে মা'কে ছোট সুন্দর এক চিঠিতে সে তার 'শেষ সেলাম' জানিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের কলকাতা ফ্রণ্টে কালু সিংয়ের শাকরেদ ছিল বাবার ড্রাইভার আমেদ। সে কেবল গাড়িই চালাত না, বাড়ির অনেক ম্যানেজারিও তাকে করতে হত। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে শুরু করে উডবার্ন পার্কের নতুন বাড়ির অনেক কাজকর্ম আমেদের তদারকিতেই হত। সে ছিল বেনারসের লোক। কিন্তু ছুটিছাটা কমই নিত। গাড়ি সে এত ভাল চালাত যে, অন্য কারুর গাড়িতে উঠলে বাবা অস্বস্তি বোধ করতেন। সেকালে বাড়ির কর্মরত লোকজনেরা কেমন সত্যিই পরিবারের লোক হয়ে যেত এবং তাদের সঙ্গে সকলেরই কেমন আন্তরিক ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত, তার একটা উদাহরণ দিই। বাবা ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী ছিলেন। সে-সময় মা খুবই অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। সংসারের সব খরচ কমাতে হয়েছিল। বড় গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হল। মা আমেদকে ডেকে বললেন, সে বাবার কাছে যে মাইনে পেত, এখন আর অত দেওয়া সম্ভব নয়। ড্রাইভার হিসাবে আমেদের বেশ সুনাম ছিল এবং ভাল মাইনেতে আর-একটা চাকরি সে সহজেই পেতে পারত। মা আমেদকে বললেন, "তোমারও তো সংসার আছে, চলবে কী করে ? তুমি ভাল মাইনেতে একটা চাকরি নাও।" আমেদ প্রথমটায় কিছু বলল না, পরে ফিরে এসে বলল, "আপনি যা পারেন দেবেন ; যখন পারবেন না দেবেন না। আপনার সংসার যদি চলে তো আমারও চলবে।"

যদিও তখনও গাড়ি চালাবার বয়স আমার হয়নি, বাবার প্রথম জেলবাসের সময় আমেদ আমাকে লুকিয়ে গাড়ি চালাতে শিখিয়েছিল। অনেক পরে ১৯৪১ সালে রাঙাকাকাবাবুকে কলকাতা থেকে গোপনে গোমো পৌঁছে দেবার সময় আমি আমেদের শিক্ষার সুফল পেয়েছিলাম। বাবাও আমার গাড়ি চালানো পছন্দ করতেন, কারণ আমি আমেদের কায়দায় গাড়ি চালাতাম।

সেকালে বাড়ির লোকজনেরা নানাভাবে বড় পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যেত এবং পরিবারের সুখদুঃখের সাথী হত। তাদের বাদ দিয়ে আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবতেই পারি না।

দাদাভাই ও মাজননীর আমলের দুজনের কথা খুব শুনেছি এবং পরবর্তীকালে তাদের দেখেছিও। একজন ছিল দাদাভাইয়ের ব্যক্তিগত পরিচারক সুদাম, অন্যটি বসু-বাড়ির পরিচারিকা সারদা। রাঙাকাকাবাবুর প্রতি সারদার মমতার কথা তো বোধ করি তোমরা জানো।

একটা মজার গল্প বলে আজকের প্রসঙ্গটা শেষ করি। রাঙাকাকাবাবু যখন কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তাঁর ব্যক্তিগত এক বেয়ারা ছিল। তার বাড়ি উড়িষ্যায়। সে ছিল যাকে বলে 'ওয়ান মাস্টার ম্যান'। পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবু একবার একই ট্রেনে, একই কামরায় যাচ্ছেন। কোনো একটি জায়গায় ট্রেনটি দাঁড়িয়েছে। সিগন্যাল হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রেন আর ছাড়ে না। রাষ্ট্রপতির (তখন কংগ্রেস-সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হত) বেয়ারা মহাশয় নেমে এনজিন-ড্রাইভারের কাছে গিয়ে গরম জল দাবি করছে, তার সাহেব দাড়ি কামাবেন বলে। আগে জল দাও, তবে গাড়ি ছাড়ো। তারপরে কামরায় ফিরে জওহরলালকে সেই ভোরবেলায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বলেছে, "আপনি তাড়াতাড়ি সেরে নিন, আমার সাহেব উঠে বাথরুমে যাবেন তো।" জওহরলাল তো কৌতুক বোধ করলেন, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ব্যাপারটা শুনে সুভাষচন্দ্র খুবই অপ্রস্তুত।

॥ ৮ ॥

ঠিক মনে আছে তো, না অনুমান করছি! সেই ১৯২৫ সালের শিশুবয়সের ঘটনা। আমার মনের কোণে একটা ছবি আছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় এক মানুষ আমাদের কার্শিয়ঙের বাড়ির সামনে ধীরে-ধীরে পায়চারি করছেন। পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছি আমার স্মৃতিভ্রম হয়নি। মান্দালয়ে বন্দী রাঙাকাকাবাবুকে বাবা লিখছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে, দার্জিলিঙে তাঁর মৃত্যুর দিন পনরো আগে, আমাদের কার্শিয়ঙের বাড়িতে একটা দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা আরও লিখেছেন বড়ই দুঃখের কথা যে, কার্শিয়ঙে আমাদের বাড়িতে দেশবন্ধুর একটা ছবি তুলে রাখা হয়নি। যাই হোক, দেশবন্ধুর শেষ বাইরে যাওয়া ও থাকা হল আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে। শরৎচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে।

আরও কিছু মনে আছে ভাসা-ভাসা। আমরা বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছি দার্জিলিঙে দেশবন্ধুকে দেখতে। আমরাও একটা দিন কাটিয়ে এসেছিলাম 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ। ঐ বাড়িতে দেশবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন ছিলেন। তোমরা যারা দার্জিলিঙ গেছ, নিশ্চয়ই বাড়িটা দেখেছ। আমাদের বাড়ির একটা প্রথা ছিল, মা যখনই ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো অসুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠকে দেখতে যেতেন, আমাদের বলতেন তাঁর পা টিপে দিতে। এখন মনে হয়, এটা ছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও শুভ কামনার একটা নিদর্শন। আমার স্মৃতিতে আছে রোগশয্যায়-শোয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমি পা টিপে দিয়েছিলাম। এই স্মৃতির মধ্যে গভীর এক অনুভূতি আছে, সেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

বড় হয়ে আমরা আর দেশবন্ধুকে দেখিনি। আমরা তাঁকে শেষ দেখে আসার দিনকতক পরেই তিনি দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেন। কলকাতায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা হয়েছিল, তার তুলনা নেই। সারা বঙ্গভূমি যেন পিতৃহারা হয়েছিল। যখনই কলকাতায় কোনো বড় শোভাযাত্রা বা শোকযাত্রা হত, মা আমাদের দেখতে নিয়ে যেতেন। একটা সুবিধামতো জায়গাও ছিল। মাজননীর এক ভাই ও আমাদের লালদাদাবাবু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ের এক বাড়িতে থাকতেন। তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে আমরা দেখতাম। যদিও আমি তখন খুবই ছোট, সেই বিরাট জনসমুদ্রের একটা ছবি আমার মনে গেঁথে আছে। কয়েক বছর পরে যতীন দাসের শবদেহ নিয়ে ও হিজলি জেল-পুলিসের গুলিতে নিহত দুই রাজবন্দীর শেষযাত্রাও ঐ ছাদ থেকেই দেখেছি। এই দুটিই রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে হয়েছিল। এই ধরনের জনসমাবেশ আমাদের বেশ প্রভাবিত করত। আমি নিজে মুখচোরা ছিলাম বলে ভিতরের তোলপাড়টা যেন একটু বেশিই হত।

দেশবন্ধুকে আমরা আর না দেখলেও বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর মধ্যে তাঁকে আমরা চিরকালই দেখে এসেছি। তাঁদের উপর দেশবন্ধুর বিরাট প্রভাবের কারণ সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করেছি এবং এখনও করি। দেশবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে দুজনেই অভিভূত হয়ে পড়তেন। আসল কথা হল দেশবন্ধু তাঁর অনুগামীদের নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন, যে-ধরনের ভালবাসা জগতে বিরল। তাছাড়া তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের দৃষ্টান্ত তো আছেই। আর আছে তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও মেধা। এই সূত্রে একটা কথা বলি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়—যখন তোমরা জন্মাওনি—অনেক বড়-বড় নেতা ও দেশসেবক পেয়েছি ও দেখেছি। তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা কেবল দিতেই এসেছিলেন, কিছু নিতে আসেননি। এই ধরনের ত্যাগধর্মী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। তাই বলছি, নেতৃত্ব খুঁজতে আমাদের বিদেশে-বিভুঁয়ে হাতড়ে বেড়াবার দরকার নেই।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাবা একদিকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার কাজে, অন্যদিকে বাসন্তী দেবী ও তাঁর পরিবারের দেখাশুনোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাবা দেশবন্ধুকে সি আর বলে উল্লেখ করতেন। পরে দক্ষিণ ভারতের এক নেতাকে অনেকে সি আর বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করেন। বাবা এতে বিরক্ত হয়ে বলতেন, সি আর বলতে একজনকে বোঝায়—চিত্তরঞ্জন দাশ, আর-কাউকে ঐ নামে ডাকা ঠিক নয়। দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' কাগজ চালাবার ভারটা বিশেষ করে বাবার উপর পড়ে। রাঙাকাকাবাবু তো তখন বর্মায় বন্দী। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। বর্মার বন্দীশালা থেকে লেখা তাঁর অনেক চিঠি আছে, বেশির ভাগই বাবাকে লেখা। তোমরা সেগুলি পড়ে দেখো। অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে।

দেশবন্ধু হঠাৎ চলে গেলেন। কিন্তু যাঁকে রেখে গেলেন, তিনি সারাজীবনের জন্য বসু-বাড়ির পরমাত্মীয় হয়ে রইলেন। আগে থেকেই বাবা ও রাঙাকাকাবাবু বাসন্তী দেবীকে 'মা' বলে ডাকতেন। কখন কোন মার কথা বলছেন, এই নিয়ে আমাদের মাঝেমাঝে গোলমাল হয়ে যেত। আমরা ওঁকে ডাকতুম 'ঠাকুমা' বলে, এতে কোনো অসুবিধা ছিল না। ১৯২৫ সালে আমাদের শিশুবয়স থেকে শুরু করে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাসন্তী দেবী বা ঠাকুমা আমাদের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। বসু-বাড়ির

সকলকে তিনি চিনতেন ও ভালবাসতেন, তাদের খুঁটিনাটি সব খবর রাখতেন। দেশবন্ধু তো সব কিছুই দেশকে দান করে গেলেন। বাবা ও তাঁর অন্য অনুগামীরা বাসন্তী দেবী ও পরিবারের জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। রাঙাকাকাবাবু ক্রমাগতই জেল থেকে বলে পাঠাতেন, বাবা ও মা যেন নিয়মিত ঠাকুমার দেখাশুনা করেন। বাবা কাজের চাপে যতটা পারতেন না, মা সেটা পূরণ করে দিতেন। মার সঙ্গে সারা জীবন কতবার যে আমরা ছোটরা ঠাকুমার বাড়ি গিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। ঠাকুমার হাতের রান্না অসম্ভব ভাল ছিল। অনেক খেয়েছি। রাঙাকাকাবাবু যখন জেলের বাইরে ও দেশে থাকতেন, কাজের শেষে অনেক রাতে ঠাকুমার বাড়িতে হাজির হতেন, তাঁর হাতের 'ভাতে-ভাত' খেতে চাইতেন ও গল্প জুড়ে দিতেন। এতই রাত করতেন যে, রাস্তায় পাহারারত পুলিসের চরেদের বড়ই অসুবিধা হত—বিশেষ করে বর্ষার রাতে। ঠাকুমা রাঙাকাকাবাবুকে বলতেন, অন্তত, ঐ বেচারিদের রেহাই দেবার জন্য বাড়ি ফিরতে।

রাঙাকাকাবাবু বলতেন, কেন, দেশদ্রোহীরা খানিকটা কষ্ট পাক না! ঠাকুমা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বেশির ভাগই সঙ্গে থাকতেন বিধবা পুত্রবধূ সুজাতা দেবী, যাঁকে আমরা কাকিমা বলে ডাকতাম। আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমার টনসিল অপারেশন হল। জ্ঞান হলে চোখ মেলেই দেখলাম, দুজন আমার মাথার কাছে বসে আছেন। একদিকে আমার মা ও অন্যদিকে ঠাকুমা বাসন্তী দেবী।

১৯৩২ সালে বাবা যখন প্রথমবার জেলে যান, তখন ঠাকুমা আমাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যখনই পারতেন আসতেন। ঐ সময়কার একটা ঘটনার কথা বললে তোমরা বুঝবে। রাঙাকাকাবাবু বর্মা থেকে যখন ফেরেন, তখন একটা সুন্দর বুদ্ধমূর্তি এনেছিলেন। উডবার্ন পার্কের দোতলার দালানে সেটা রাখা হয়েছিল। ঠাকুমা বললেন ঐ বুদ্ধমূর্তি বাড়িতে রাখা চলবে না, এর প্রভাব ভাল নয়, সুভাষ তো সর্বত্যাগী হয়ে গেছেই, সংসারী হয়েও এখন শরৎও সেই পথে গেল, কী জানি এ-পরিবারে আরও কী হয়! তিনি জোর করেই একদিন মূর্তিটি নিয়ে চলে গেলেন ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের মধ্যে এক মন্দিরে রাখলেন। নেতাজী-ভবনে নেতাজী মিউজিয়ম হবার পর আমি ঠাকুমাকে অনুরোধ করি মূর্তিটি ফিরিয়ে দিতে। এখন সেটি নেতাজী ভবনেই আছে।

মাজননী সম্বন্ধে ঠাকুমার খুব উঁচু ধারণা ছিল। আমাদের বহুবার গর্বের সঙ্গে বলতেন, "জানিস, তোদের মাজননী কী বলেন! বলেন, আমিই নাকি সুভাষের আসল মা, তিনি নাকি কেবল ধাত্রী! বল তো, কটা মা একথা বলতে পারে, বিশেষ করে সুভাষের মতো ছেলে যার আছে।"

১৯৩৩-এর গোড়ায় ঠাকুমা আমাদের সঙ্গে জব্বলপুর গিয়েছিলেন, জেলে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে চলে যাবেন চিকিৎসার জন্য। বিদায়ের সময় রাঙাকাকাবাবু বেশ খানিকটা কান্নাকাটি করলেন। দেশবন্ধু কেন তাঁকে 'ক্রাইং ক্যাপ্টেন' বলতেন বুঝলাম। বাসন্তী দেবী কিন্তু এ-রকম অবস্থায় নিজের আবেগ খুবই সংযত রাখতেন এবং মোটেই কাঁদতেন না।

অনেকদিন পরের কথা। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঠাকুমার কাছে গেলাম, যদি তাঁর কাছে রাঙাকাকাবাবুর চিঠিপত্র কিছু থাকে, দেশবাসীর জন্য আমরা সেগুলি প্রকাশ করতে পারি। খুঁজেপেতে কিছু চিঠি পেলেন। আমাকে বললেন, তিনি

চিঠিগুলি আমাকে দিতে পারেন যদি আমি কথা দিই যে, কপি করে আমি সেগুলি তাঁকে ফেরত দেব। আমি কথা দিলাম। কথামতো আমি পরে একদিন তাঁর কাছে চিঠিগুলি ফেরত নিয়ে গেলাম। আমাকে বসালেন, খাওয়ালেন, অনেক গল্পও করলেন। আমি যখন বাড়ি ফিরব বলে উঠে চলে আসছি, আমাকে ফিরে ডাকলেন। চিঠিগুলির বাক্সটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "তুই আচ্ছা বোকা তো, আমি কি সত্যিই চিঠিগুলি ফেরত নেব নাকি ?"

কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

॥ ৯ ॥

জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলের সেগ্রিগেশন ব্লকে আমরা দল বেঁধে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ১৯৩৩ সালের গোড়ার কথা। রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ চলে যাবেন চিকিৎসার জন্য। আমরা সকলে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুকে ঘিরে বসে আছি, হঠাৎ বাবা হাঁক দিলেন, "গিন্নি ! গিন্নি !" সকলে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। মা তো পাশেই বসে আছেন। আসলে বাবা ডাকছেন ধবধবে সাদা খুব সপ্রতিভ একটি পোষা পায়রাকে।

ঠাকুমা বাসন্তী দেবী রাগের ভান করে বললেন, "শরৎ, এতে আমার ঘোর আপত্তি আছে। আসল গিন্নি পাশে বসে আর তুমি কি না আর কাকে 'গিন্নি, গিন্নি' বলে ডাকছ !" খুব একটা হাসির রোল উঠল। বাবা ও রাঙাকাকাবাবু যখন কাজে ডুবে থাকতেন তখন তো কোনোদিকে তাকাবারই সময় থাকত না, পাখি জন্তু-জানোয়ার তো দূরের কথা। জেলে গিয়ে দুজনেরই একটা প্রধান অবলম্বন হত তারা। পশুপাখি ও অন্য কয়েদি সাথীদের নিয়েই যেন তাঁরা সংসার করতেন।

মান্দালয় জেলে রাঙাকাকাবাবুর সংসারে মুরগি, পায়রা, টিয়াপাখি ইত্যাদির একটা বড় দল ছিল। চৌবাচ্চার ধারে সারি দিয়ে ময়ূরপঙ্খী পায়রার দল জল খেতে বসার দৃশ্যও তাঁকে মুগ্ধ করত। বেড়াল তিনি পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে যদি বদ রঙের হয়। তবে শুনেছি পূর্ব এশিয়ায় তাঁর একটা পোষা বাঁদরও ছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের কাঁধে বসে সে নানা রকম খেলা দেখাত। হয়তো বা মন হাল্কা রাখবার ছিল সেটা একটা উপায়।

জব্বলপুর জেলে আমরা দেখলাম দুই ভাই তো বেশ বড় চিড়িয়াখানা নিয়ে বসে আছেন। পায়রা ও অন্যান্য পাখি ছাড়াও এক পাল খরগোশ রয়েছে। বিচিত্র রঙের। পাখি, খরগোশ ইত্যাদির নাম ধরে রাজবন্দীরা মাঝে-মাঝে ডাকেন আর তারা আমাদের মতো অতিথিদের সম্ভাষণ জানিয়ে যায়।

রাঙাকাকাবাবু তো ইউরোপ চলে গেলেন। মাস কয়েক পরে বাবাকে কার্শিয়াঙে আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে সরকার অন্তরীণ করল। একদল পায়রা ও খরগোশ কলকাতায় আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে স্থানান্তরিত হল। আমিই তাদের ভার নিলাম বলা যায়। তবে কার্শিয়াঙে গিয়ে বাবার অন্য রকমের শখ হল। নানা জাতের পাহাড়ি কুকুর সংগ্রহ করলেন তিনি। দার্জিলিঙের পুলিসের কর্তা মাঝে-মাঝে বাবার তদারকি করতে

আসতেন। সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে বাবা "কোল্‌সন্ ! কোল্‌সন্ !" বলে হাঁকতে লাগলেন, আর সাহেবের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটা ছোটখাট সুন্দর পাহাড়ি কুকুর লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল। কোল্‌সন্ সাহেব তখন কলকাতার পুলিস কমিশনার ! পরে আবার "কাউন্টেস ! কাউন্টেস !" বলে বাবা ডাক দিলেন। খুব লোমশ আহ্লাদী চেহারার একটি কুকুর সানন্দভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। তখন ভারতের বড়লাট-পত্নী ছিলেন কাউন্টেস অব উইলিংডন।

কুকুরেই গল্পটি শেষ নয়। এক পাহাড়ি কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে ভাল্লুকের ছানা কুড়িয়ে পেল। আমাদের বাড়িতে এসে সেটি সে বাবার হাতে সঁপে দিয়ে গেল। আমরা যখন তাকে প্রথম দেখলুম সে তখন খুবই ছোট, বোতলে দুধ খায়। আমার কিন্তু বেশ মনে আছে, সেই ছোট অবস্থাতেও ভাল্লুকটি এমন চেপে পা জড়িয়ে ধরত যে ছাড়ানোই দায়। বড় হলে তার জন্য খাঁচা তৈরি হল। বাবার মুক্তির পর খাঁচা-বন্দী অবস্থায় তাকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আনা হল। কিন্তু তখন সে বেশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। পশু-বিশেষজ্ঞরা তাকে বাড়িতে রাখা ভাল মনে করলেন না। সুতরাং বাবা তাকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় উপহার দিলেন।

এতক্ষণ তো বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর জেল-জীবনের হাল্কা দিকটাই বলছিলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে আরও অনেক কিছুই বলার আছে। তোমরা তো জানো রাঙাকাকাবাবু বর্মার জেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুক্তির জন্য যেমন দেশে আন্দোলন চলছিল, তেমনি বাবা ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে নানা রকম প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে লেখালেখি চলছিল।

রাঙাকাকাবাবুর কারা-জীবন বৈচিত্র্যময়। প্রথমবার ১৯২১-২২ সালে তিনি জেলে যান দেশবন্ধুর সঙ্গে, ছিলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সবসুদ্ধু এগারো-বারোবার তিনি জেলে গিয়েছেন। শেষবার ১৯৪০ সালে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। রাজবন্দী হিসাবে তিনি ও বাবা নীতিগত ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি। যেমন রাজনৈতিক জীবনেও তাঁরা যেটা ঠিক পথ বলে মনে করতেন সেটা থেকে কখনও সরে আসতেন না। অবশ্য এই কারণে সরকারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের সঙ্গে কতবার তাঁদের প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে, কতবার তাঁরা কোণঠাসাও হয়েছেন। সাধারণভাবে রাঙাকাকাবাবু বলতেন যে, জেলে ইংরেজ অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখালেই কাজ দেয় বেশি। তাছাড়া, আমার মনে হয় যে, জাতির দাসত্ব যেমন তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত বন্দিদশাও তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। ফলে, জেলে গেলেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ত। রাজবন্দীদের দাবিদাওয়া নিয়ে তিনি জেলের ভেতরে যে লড়াই চালাতেন তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জয়ী হতেন তিনি। জেলে থাকার সময় তিনি দু'বার অনশন করেছিলেন। একবার মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করার অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে, আর-একবার ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে মুক্তির দাবিতে। দু'বারই শেষ পর্যন্ত সরকারকে তাঁর দাবি মেনে নিতে হয়েছিল।

তিনি যখন বর্মায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সরকারি ও বেসরকারি ডাক্তাররা যখন একমত হলেন যে, তাঁর জীবন বিপন্ন তখন ইংরেজ সরকার তাঁর মুক্তি ও চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে নানারকম শর্তের কথা তুলতে লাগলেন। যেমন ভারতের মাটি না ছুঁয়ে তিনি যদি

Censored and ...
27/3/20
Spl. I. G.
I. B., C. I. D.
Bengal.

Mandalay Jail
1.3.26.

My dear brother,

I do not know whether you have received my last few letters. I purposely refrained from mentioning anything about the strike because I was afraid that the letters would be withheld and you would be put to anxiety. From what has happened I was not wrong in anticipating that my letters would be withheld if they contained any news about the strike.



I received your long telegram ~~yesterday~~ on 27.2.26 at

about 5 P.M. and sent the reply by express at once.
I do not know when it reached you.

I am weak — but am otherwise well and there is no cause for anxiety as far as I am concerned. I had headache and slight brain-trouble for the first few days but I seem to be gradually becoming accustomed to the fast. I am keeping to my bed as much as I can, in order to conserve my energy. The strike still continues and will do so for some time to come. Until you hear from me that I have broken my fast you can take it for granted that the strike is continuing.

Hot water with a pinch of salt is a great sustainer. I do get headache and dizziness

বাবাকে লেখা, মান্দালয় থেকে রাঙাকাকাবাবুর চিঠি—১৯২৬

সুইজারল্যাণ্ড চলে যান তাহলে তাঁরা রাজি। অথবা তিনি যদি কারও সঙ্গে দেখা বা যোগাযোগ না করে আলমোড়ায় অন্তরীণ থাকতে রাজি হন তাহলেও তাঁরা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেন। এ ধরনের সব শর্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালের গোড়ায় যখন সরকার ঠিক করলেন যে রাঙাকাকাবাবুকে দেশে ফিরিয়ে আনবেন তখনও তাঁরা ঠিক করে বসু-পরিবারকে জানালেন না যে তাঁকে নিয়ে তাঁরা ঠিক কী করতে চান। কলকাতায় তাঁকে ফিরিয়ে এনে গভর্নরের লঞ্চে গঙ্গার বুকে তাঁকে বন্দী করে রাখলেন, যেন তাঁরা তাঁকে নদীর নির্মল বাতাস খাওয়াচ্ছেন। হঠাৎ দার্জিলিঙ থেকে গভর্নরের আদেশ এল তাঁকে তাঁরা মুক্তি দিচ্ছেন। তার আগেই আমরা গঙ্গার ঘাট থেকে নৌকো করে লঞ্চে গিয়ে দল বেঁধে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

মুক্তির পর তাঁকে ৩৮/১ এলগিন রোডের বাড়িতে তোলা হল। সেখানেই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমরা থাকতাম। সেই প্রথম ডাক্তার বিধান রায়কে দেখলাম। বাড়ির দোরগোড়ায় পা দিলেই জানা যেত ডাক্তার রায় এসেছেন। ভারী গলায় খুব হাঁকডাক করতেন। ডাক্তার রায় ও আমাদের নতুন কাকাবাবু সুনীলচন্দ্র একসঙ্গে রাঙাকাকাবাবুকে দেখতেন। প্রয়োজন-মতো স্যার নীলরতন সরকার ও কবিরাজমশাই শ্যামাদাস বাচস্পতির পরামর্শ নিতেন।

ওই সময় থেকেই বাড়ির ও রাঙাকাকাবাবুর সব কথা আমার মোটামুটি ভাল মনে আছে। ডাক্তারদের পরামর্শে কিছুদিন পরেই তাঁকে শিলং নিয়ে যাওয়া হল। শিলঙে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে খেলাধূলা ও গান গাওয়ার গল্প তোমাদের আগেই বলেছি। দাদাভাই, মাজননী এবং বাড়ির অনেকেই সেই সময় শিলঙে গিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে শিলঙে বসু-বাড়ির জমায়েত বেশ একটা বড় ঘটনা। রাঙাকাকাবাবুই ছিলেন জমায়েতের মধ্যমণি। ছেলেমেয়েদের পুরো দলটিই ছিল তাঁর হেফাজতে। কার স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য কী-কী করা দরকার তিনি বলে দিতেন। কাকে মোটা করতে হবে, কে বড়ই মোটা সুতরাং খাওয়া কমিয়ে এবং দৌড় করিয়ে রোগা করতে হবে ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় আমিই শিলঙে বেশ লম্বা জ্বরে পড়লাম এবং অনেকদিন শয্যাগত ছিলাম। সেই সময় ডাক্তার বিধান রায়ের শিলঙে বাড়ি ছিল এবং তিনিই আমার চিকিৎসা করেন। আমার মনে আছে, যখন পথ্য দেবার সময় হল, ডাক্তার রায় তাঁর ভারী গলায় বললেন, "এখন তোকে আমি সব খেতে দিতে পারি। কী খাবি বল ? খাট খাবি ? আলমারি খাবি ? টেবিল খাবি ? চেয়ার খাবি ?" কথাগুলি শুনেই আমি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম।

সে সময় জানতাম না জেলে যাওয়া-আসা আমাদের পারিবারিক জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। বাবাকে যে শেষ পর্যন্ত ওই পথেরই যাত্রী হতে হবে, রাঙাকাকাবাবু বোধ করি আগেই বুঝেছিলেন। তিরিশের দশকে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেবার কিছুদিন আগে থেকেই রাঙাকাকাবাবু মাকে মাঝে মাঝে বলতেন বাবাকে যদি দেশের কাজে জেলে যেতে হয়, মা সবকিছু সামলে নিতে পারবেন তো ?

আরও বলতেন, মা যেন নিজেকে মনে-মনে দুঃসময়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখেন। আমার মা শেষ পর্যন্ত বাংলার শত শত মায়েদের দুঃখ-দারিদ্র্যের ভাগী হয়েছিলেন।

বর্মায় রাজবন্দী থাকতেই রাঙাকাকাবাবু বাংলার লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে। নির্বাচনের সময় খুব উত্তেজনা, সেই উত্তেজনার কিছু আঁচ আমাদের মতো শিশুদের গায়েও লেগেছিল। একটা পোস্টার এখনও মনে আছে—রাঙাকাকাবাবুর ছবির সামনে জেলের গরাদ আঁকা। মা ছোটদেরও দু-একটা নির্বাচনকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের 'উইলিস নাইট' গাড়ি সামনে ও পেছনে রাঙাকাকাবাবুর জেলবন্দী মার্কা ছবি নিয়ে ঘুরছে, এখনও বেশ মনে পড়ে। রাঙাকাকাবাবুর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একজন নরমপন্থী কিন্তু বেশ প্রভাবশালী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ যতীন্দ্রনাথ বসু। রাঙাকাকাবাবুর বেশ বড় রকমেরই জিত হল। ফল ঘোষণার রাত্রে কলকাতায় আতশবাজি পুড়িয়ে বিজয়োৎসব হল, আকাশে বিশেষভাবে তৈরি হাউই উঠল—আলোর অক্ষরে লেখা "সুভাষচন্দ্রের জয়"।

আগেই তো বলেছি মুক্তিলাভের কিছুদিন পরে রাঙাকাকাবাবুকে শিলং নিয়ে যাওয়া হল স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য। কিন্তু দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, এবং স্বাস্থ্য যত খারাপই হোক না কেন, রাঙাকাকাবাবু কখনই মানসিক বিশ্রাম নিতেন বলে মনে হয় না। শিলঙের 'কেলসাল লজ'-এ তাঁর শোবার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে, এটা অনেকের নজরে পড়ল, বিশেষ করে মাজননীর। বই পড়া, চিঠি লেখা ছাড়াও বিধানসভার জন্য নানা রকম প্রশ্ন তৈরি করা ইত্যাদি অনেক কাজ। তাঁকে বলা হল, স্বাস্থ্য ভাল করতে এসে এত রাত জাগা চলবে না। সুতরাং রাঙাকাকাবাবুকে একটা উপায় বের করতে হল। রাত্রে অন্য ঘরগুলির লাগোয়া সব দরজার ফাঁকগুলি কাপড় গুঁজে বন্ধ করে রাখতেন, যাতে তাঁর ঘরের আলো কেউ দেখতে না পায়।

রাঙাকাকাবাবু যে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন সেটা সকলেই জানত। পুলিসও জানত। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর গোপন গৃহত্যাগের রাত্রে আমরা ব্যাপারটিকে কাজে লাগিয়েছিলাম পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্য। রাঙাকাকাবাবু আমাদের বোন ইলাকে বলে গিয়েছিলেন যে, আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত যেন তাঁর ঘরের আলো জ্বলে। তাহলে যদি পুলিসের চরেরা তাঁর ঘর নজর করে, তারা মনে করবে যে, সুভাষবাবু তাঁর নিয়মমতো বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করছেন।

আলো অন্ধকার নিয়ে আর একটা গল্প এখানে বলতে পারি। রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের পর প্রায়ই কাজের শেষে এবং বেশ রাতে বাবা আমাকে তাঁর দোতলার শোবার ঘরে ডাকতেন। আমি শুতাম তিনতলায় রাস্তার দিকের ঘরে। শীতের রাতে মশারির ভিতরে বসে বাবা আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলতেন। বিশেষ গোপনীয় কোনো কথা যখন দু-চারজন লোককে মনের মধ্যে আগলে রাখতে হয়, তখন নিজেদের মধ্যে খবর আদান-প্রদান ও আলোচনা করলে মনটা খানিকটা হাল্কা হয়। কথাবার্তা শেষ হলে বাবা আমাকে বলতেন আমি যেন তিনতলার কোনো আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। তিনি চাইতেন না যে, রাস্তায় যে পুলিসের চরেরা টহল দেয়, তাদের সন্দেহ হয় যে, আমি বেশি রাত পর্যন্ত কোনো কাজে লিপ্ত আছি।

বড় কাজ হাতে নিয়ে আমরা কেমন আলো-আঁধারের নানারকম খেলা খেলতাম!

রাঙাকাকাবাবু কলকাতা ফেরার কিছু আগেই মা আমাদের নিয়ে শিলঙ থেকে চলে এলেন। ১৯২৭-এর শেষের দিকে। জেলে থাকতে তো রাঙাকাকাবাবু অন্য রকমের সংসার পেতে বসতেন—একদিকে থাকত কয়েদীরা তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে, অন্যদিকে থাকত পশুপাখির দল। যখন জেলের বাইরে থাকতেন, তখন তিনি সব সময়েই চাইতেন যে, বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে থাকে। শুনেছি আমি জন্মাবার আগে এলগিন রোডের বাড়িতে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে লুকোচুরি খেলতেন। এও শুনেছি, তিনি প্রায়ই চিলের ছাদে উঠে লুকিয়ে বসে থাকতেন। শিলঙে রুগ্ন শরীর নিয়েও আমাদের সঙ্গে খেলতে খেলতে তিনি যেভাবে পাকদণ্ডি দিয়ে ওঠানামা করতেন, তাতে আমাদেরও ভয় করত।

মা আমাদের নিয়ে আগে কলকাতায় ফিরে আসায় রাঙাকাকাবাবুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল। মাকে শিলঙ থেকে লিখলেন, "আপনারা সকলে হঠাৎ চলে যাওয়াতে—একটু মুশকিলে পড়েছিলুম। খালি বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন করে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল—একটু কষ্ট হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।" যাই হোক, মা'র তখন অনেক কাজ। উডবার্ন পার্কে বাবার নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সময়মতো পুরো সংসারটা গোছগাছ করে তুলতে হবে। আর নতুন জায়গায় সাজিয়ে বসাতে হবে। ধাপে-ধাপে নতুন কোনো জিনিস তৈরি হওয়া, যেমন বাড়ি তৈরি, দেখতে বেশ একটা মজা আছে। আমরা তো অবাক হয়ে দেখতাম। ১৯২৮ সালে বাবার বাড়ি সম্পূর্ণ হল। সেকালের অনেক বড়-বড় বাড়ির তুলনায় সব দিক দিয়ে ১ নং উডবার্ন পার্কের একটা নতুনত্ব ছিল। বাবা বাড়ির পরিকল্পনা আধুনিক ঢঙে করেছিলেন, উঁচু দরের মালমশলাও ব্যবহার করা হয়েছিল। তুলনায় এলগিন রোডের পুরনো বাড়িটা ছিল নেহাতই সেকেলে। ঘটা করে গৃহপ্রবেশ হল। রাঙাকাকাবাবু আমাদের সঙ্গে ৩৮/১ এলগিন রোড থেকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে উঠে এলেন। তিনতলার পূবদিকের ঘরটা তাঁকে দেওয়া হল শোবার জন্য, একতলার পশ্চিমের ঘর তাঁর অফিস। খাওয়া-দাওয়া হত দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। একতলার বেশির ভাগটাই বাবার কাজের জন্য লাগত। ১ নং উডবার্ন পার্কের মতো বাড়িতে বাস করার ফলে আমাদের চাল বিগড়ে যেতে পারে বলে অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল! ১৯৪৪ সালে আমি যখন লাহোর দুর্গের নির্জন সেলে বন্দী, ফোর্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঠাট্টার সুরে একদিন বললেন, "তুমি তো উডবার্ন পার্কের সেই 'প্যালেসে' থাকো, না? তোমার তো দেখছি তাহলে এখানে পোষাবে না! পালাবার জন্য সুড়ঙ্গ কাটতে আরম্ভ করো না কেন? তবে বলে রাখি, পালাতে পারলে বেঁচে গেলে, ধরা পড়ে গেলে কিন্তু গুলি করে দেবার হুকুম আছে।"

বসু-বাড়ির অনেক কথা বেশ কয়েকটি বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর কর্মজীবন ৩৮/২ এলগিন রোড (আজকের নেতাজী-ভবন) ও ১ নং উডবার্ন পার্ক জুড়ে রয়েছে। শরৎ-সুভাষের জীবন যেমন একে অন্যটির পরিপূরক, এই দুটি বাড়িও ঠিক তাই। তাছাড়া রয়েছে কার্শিয়ঙে গিধাপাহাড়ে বাবার ছোট্ট বাড়িটি। যার ইতিহাসও খুবই সমৃদ্ধ। অনেক পরে বাবা রিষড়ায় একটা সুন্দর বাগানবাড়ি করেছিলেন। তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। যদি আরও পুরনো দিনে চলে যাই, তাহলে কটকের জানকীনাথ-ভবন ও

1, Woodburn Park.

OFFICE OF THE GENERAL SECRETARY
RECEPTION COMMITTEE
36, WELLINGTON STREET.

REF. NO. 501 Calcutta, the 3rd December, 1928

S n · 13307 368

My dear Mahatmaji,

I am forwarding to you a letter from a young friend who is anxious to attend on you during your stay in Calcutta. I do not know if you still remember him but he attended on you on several occasions. I desire to have your instructions as to what I should tell him in reply.

I shall be greatly obliged if you will kindly let me know how many Volunteers you would require for your camp together with their qualifications. It would also help us if you could inform us as to how many members there will be in your party. with profound regards

I am,

Yours respectfully,

Subhas Chandra Bose

মহাত্মা গান্ধীকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠি

দাদাভাইয়ের পুরীর বাড়ি জগন্নাথ-ধামের কথা ভুললে চলবে না।

১ নং উডবার্ন পার্কের প্রতিষ্ঠা একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যেন যুক্ত হয়ে আছে। ঐ বাড়িতে প্রবেশ করার পর থেকেই বাবা ও রাঙাকাকাবাবু ১৯২৮ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের অধিবেশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাঙাকাকাবাবু ঐ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং রূপে আমাদের জাতীয় জীবনে ও মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। বাবা ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ। মা তো সব সময়েই বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সব কাজের সাথী। বাড়ির যে-সব ছেলেমেয়ে গান গাইতে পারত, তারা গানের দলে যোগ দিয়েছিল। গানের দলের ভার নিয়েছিলেন সরলা

দেবী চৌধুরানী। মনে আছে, সেই উপলক্ষেই তিনি নিয়মিত উডবার্ন পার্কে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেন। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের অধিনায়িকা লতিকা ঘোষও প্রায়ই আসতেন। সব কিছু মিলে আমাদের উডবার্ন পার্কের নতুন বাড়ির প্রথম বছরটা যেন ছিল—'দি ইয়ার অব দি ক্যালকাটা কংগ্রেস'।

রাঙাকাকাবাবু স্বেচ্ছাসেবকদের কী কঠোর ও কঠিন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন তা বুঝতে না পারলেও পরে জেনেছি। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা আজও বলেন যে, কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের শৃঙ্খলা ও কর্মকুশলতা আজও তুলনাহীন। পুরোপুরি সামরিক কায়দায় শিক্ষিত ঐ দল ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে সংগঠিত হয়েছিল, যেমন অশ্বারোহী, সাইকেল-আরোহী, পদাতিক ইত্যাদি। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা হয়, সেটা আমরা ছোটরা ওয়েলিংটন স্ট্রীটে আমাদের লালদাদাবাবুর বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছিলাম। স্বাধীনতার আগে এ-ধরনের সামরিক বা আধা-সামরিক শোভাযাত্রা আর হয়নি। রাঙাকাকাবাবু সামরিক পোশাকে একটি মোটরগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বেটন হাতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পাশেই একটা বড় ধরনের একজিবিশন ছিল। এখনও মনে আছে, প্রদর্শনীতে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ঘটনার চলমান মডেল দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রায়ই আমাদের কংগ্রেস-প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হত। সভা-মণ্ডপে বা প্রদর্শনীতে। ফলে ভবিষ্যতের ও স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের কিছু স্বাদ ও স্পর্শ যেন তখন থেকেই আমরা পেতে আরম্ভ করেছিলাম। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, রাঙাকাকাবাবুই ঐ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন, গান্ধীজির ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। ভারতের নবজাগ্রত যুবশক্তির বত্রিশ বছরের নেতার প্রস্তাব অল্প ভোটেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

॥ ১১ ॥

আমি জীবনে কখনও বাবার কাছে বকুনি খাইনি। ছেলেমেয়েদের শাসনের ভারটা ছিল মা'র উপর এবং শাসনও ছিল বেশ কড়া। এর মানে এই নয় যে, বাবা আমাদের উপর নজর রাখতেন না। তাঁর কর্তৃত্বের ধরনটা ছিল আলাদা। কিছুই তাঁর চোখ এড়াত না। কোর্ট থেকে ফিরে স্নান সেরে দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বাবা খানিকটা বিশ্রাম নিতেন। কাজে নীচে নেমে যাবার আগে প্রায়ই আমাদের পড়ার ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে মুচকি হেসে ছেলেমেয়েদের উপর চোখ বুলিয়ে নিতেন। এটাই ছিল যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিন্তু মা'র হুকুমই ছিল শেষ কথা। দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত মাকে বেশ ভয় করতাম, তার পর সম্পর্কটা বদলে গেল। তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাবা জেলে যাওয়াতে আমরা যেন একটু তাড়াতাড়িই সাবালক হয়ে উঠলাম, কম বয়সেই বাড়ির নানা রকম দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়ল। মাও সেটা স্বচ্ছন্দে মেনে নিলেন।

উডবার্ন পার্কের বাড়ির সব কিছুই খুব নিয়ম ও শৃঙ্খলায় চলত। বাবা খাপছাড়া ও অগোছালো অভ্যাস পছন্দ করতেন না। মাও দেখতেন যাতে কোনো দিক দিয়েই কোনো ঢিলেমি না হয়। সবকিছুই যন্ত্রের মতো চলত, কোনো কিছু বিগড়োলে তৎক্ষণাৎ সেটা

শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এলগিন রোডের সাবেক বাড়ির তুলনায় উডবার্ন পার্কের বাড়ি, কেবল চেহারায় নয়, জীবনযাত্রার সব দিক থেকে অনেক আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল। ঐতিহ্য ও প্রগতি মিশিয়ে মা ও বাবা সংসারে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিলেন। রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত এলগিন রোডের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময়েও তাঁর যখন কোনো বিশেষ অতিথি বা বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হত, তখন তিনি উডবার্ন পার্কে ব্যবস্থা করতে বলতেন। অতিথিসৎকারের ব্যাপারে তিনি খুঁটিনাটি নিজেই দেখতেন ও জানতে চাইতেন। মনে আছে একবার কোনো বিশেষ বিদেশী অতিথিকে তিনি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাকে বললেন মাকে জানিয়ে আমি যেন ব্যবস্থার ভার নিই। সব ঠিক আছে—রিপোর্ট দিতে আমি যখন তাঁর কাছে হাজির হলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কটা ও কী কী পদ রান্না হচ্ছে। আমি উত্তর দিতে না পারায় তিনি দমে গেলেন।

উডবার্ন পার্কের বাড়িতে উঠে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিণ্ডারগার্টেন ছেড়ে আমার বড় স্কুলে যাওয়ার সময় হল। তখন সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা বেশির ভাগই বিদেশী মিশনারি স্কুলে পড়ত। বিশেষ করে বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার-ডাক্তারদের ছেলেরা তো বটেই। আমরা ছিলাম ব্যতিক্রম। আমি আমার দাদাদের মতো সাউথ সুবার্বান স্কুলে ভর্তি হলাম। ডায়োসিশান স্কুলের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে সাউথ সুবার্বান স্কুলের সমুদ্রে পড়ে আমি তো বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। স্কুলে যেতে বেশ ভয়-ভয় করত। আজ বলতে বাধা নেই যে, সাউথ সুবার্বানে প্রথম কয়েক বছর মনে মনে আমি বেশ অসুখী ছিলাম। আসল কথা, নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারিনি। যাই হোক, সমাজের সব স্তরের ছেলেদের সঙ্গে মেশবার ও একসঙ্গে লেখাপড়া করবার এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য বসুবাড়ির ছেলে বলে মাস্টার মশাইরা ও সতীর্থরা আমাদের একটু বিশেষ চোখে দেখতেন। উপরের ক্লাসে ওঠার পর ধীরে-ধীরে আমার মনের জড়তা অনেকটা কেটে গেল। তাছাড়া উপরের ক্লাসের মাস্টার মশাইরা বেশ দক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন এবং লেখাপড়ায় বেশ একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির মাস্টার মশাই ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমার সব ভাইবোনেদের একে একে পড়িয়েছিলেন। শক্ত শক্ত অঙ্ক ফণীবাবু এত সহজে কষে ফেলতেন যে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমি স্কুলে ফল মোটামুটি ভালই করতাম। কিন্তু ফণীবাবুর আশা ঠিক পূর্ণ করতে পারতাম বলে মনে হয় না। পরীক্ষার ফল বেরোলে মা সেই রিপোর্ট সই করাতে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বাবা রিপোর্ট ভাল করেই দেখতেন। তবে বিশেষ কোনো মন্তব্য না করে সই করে দিতেন।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা বোধহয় শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমরা বাবা ও মা দুজনকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। জ্যাঠা, কাকা, জ্যাঠাইমা, কাকিমাদের বেলায়ও তাই। বয়সের ফারাকটা বেশি হলে বাবাদের জেনারেশনে ছোটরা বড় ভাইবোনেদেরও 'আপনি' বলত, আমরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলতাম। রাঙাকাকাবাবু বাবার সঙ্গে 'তুমি' বলেই কথা বলতেন। মাকে 'আপনি'। সম্বোধনের ধরনটা আজকালকার মতো না হলেও অন্তরঙ্গতা কমত না। বরং আমার বিশ্বাস পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব বেশি বই কম ছিল না।

খেলাধুলোর ব্যাপারে আমরা উৎসাহ পেতাম কম। বিশেষ করে ময়দানের

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো নিয়ে হুজুগ বাবা বেশ অপছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, কোর্ট থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখি বাইশ জন লোক একটা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, আর কয়েক হাজার লোক তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করছে, এর আবার মানে কী! তবে রাঙাকাকাবাবুর উদ্যোগে আমাদের শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলোর অন্য রকম ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে বাড়ির ছাদে হয়েছিল। সাধারণ ব্যায়াম, লাঠি ও ছোরা খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাম দিগেন্দ্রচন্দ্র দেব। পূর্ববঙ্গের মানুষ, শরীরে অসম্ভব শক্তি। তাঁর ওয়েট লিফটিং দেখে আমরা তাজ্জব বনে যেতাম। রাঙাকাকাবাবু এই ধরনের শিক্ষা দেশের কাজে প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের নিতে বলতেন। দিগেনবাবুর সাহায্যে রাঙাকাকাবাবু আরও কয়েকটি জায়গায় ছেলেমেয়েদের সংঘ বা ক্লাব গড়ে তোলেন এবং আত্মরক্ষার নানা রকম শিক্ষার প্রসারের সাহায্য করেন। আমরাও মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানে যেতাম এবং লাঠি ও ছোরাখেলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতাম। আমাদের বাড়ির ছাদেও বার্ষিক অনুষ্ঠান হত। মনে পড়ে লাঠির দুধারে আগুন লাগিয়ে আমাকে লাঠি ঘোরাতে হত। অনুষ্ঠানের শেষে দিগেনবাবু ফ্রী ফাইটে চ্যালেঞ্জ করে আমাকে বেশ নাস্তানাবুদ করতেন।

দিগেনবাবু ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী। মনে আছে, দেশ ভাগ হওয়ার আগে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বলেছিলেন তিনি পৈতৃক ভিটে ছাড়বেন না। আরও বলেছিলেন, দেশ ভাগ করছ করো, আমাদের জলে ফেলে দিচ্ছ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালাপাহাড় হয়ে ফিরে এসে তোমাদের শায়েস্তা করব!

বাড়ির কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র সম্বন্ধে না বললে গল্পটা জমে না। একজনের কথা প্রথমে বলি, যিনি আমাদের সঙ্গেই উডবার্ন পার্কে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। তিনি হলেন বাবার এক মামা, আমাদের রাঙাদাদাবাবু বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাঙাকাকাবাবু থাকতেন তিনতলায় পুবের ঘরে, আর রাঙাদাদাবাবু থাকতেন তিনতলার পশ্চিমের ঘরে। খুব মজাদার লোক, পুরোপুরি সাহেব ও খুব শৌখিন। তাঁর কর্মকুশলতার জন্য তাঁকে দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার ম্যানেজার করা হয়েছিল। কাজকর্ম তিনি ভালই করতেন এবং বাড়ির যে-কোনো বড় কাজকর্মে তিনি ম্যানেজারি করতে ভালবাসতেন। সাহেবি পোশাক তাঁর যে কেবল প্রিয় ছিল তাই নয়, ছিল পুরোপুরি কেতাদুরস্ত। বাবা যে কোর্টেও খদ্দরের স্যুট পরতেন, সেটা ছিল রাঙাদাদাবাবুর মতে সম্পূর্ণ অচল। আমাদের বাড়িতে একটা কথা খুব চলত, এবং অনেকের নামের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হত—বি এন জি এস। মানে 'বিলেত না গিয়ে সাহেব'। রাঙাদাদাবাবু একজন প্রকৃত বি এন জি এস ছিলেন। স্বদেশিয়ানার তিনি ধার ধারতেন না। 'দত্ত-সাহেব' খেতে বসতেন একটা বড় গোছের 'বিব' পরে, যাতে দেশী ঢঙে খেতে গিয়ে তাঁর সাহেবি পোশাক নষ্ট না হয়। তিনি অফিস থেকে ফিরে ভাল সিল্কের জামাকাপড় পরে যখন নীচে নামতেন, তখন উৎকৃষ্ট বিলিতি সেন্টের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। ছোটদের সঙ্গে তাঁর বনত ভাল, কারণ ভাল চকোলেট, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি তিনি আমাদের মাঝেমাঝেই সরবরাহ করতেন। সার্কাস দেখতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানাভাবে তিনি আমাদের মন ভিজিয়ে রাখতেন। রাঙাদাদাবাবু অসুখ করলে কিন্তু ধৈর্য হারাতেন। একবার তো মাঝরাতে পেটে ব্যথা হওয়াতে মহা শোরগোল আরম্ভ করলেন। ডাক্তারকাকা সুনীলচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়িতে থাকেন। রাঙাকাকাবাবু তো বাধ্য হয়ে মাঝরাতে

বেরোলেন। কিন্তু এলগিন রোডের বাড়ির গেট বন্ধ, অনেক হাঁকডাক করেও কিছু হল না। তখন সুভাষচন্দ্র বসু পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকলেন, পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডাক্তারভাইকে তুললেন। বললেন,"শিগগির চলো, সতী (তাঁদের অসুস্থ ছোট ভাই সন্তোষচন্দ্র) তো বাড়ি কাঁপায়, রাঙামামাবাবু পাড়া কাঁপাচ্ছেন।"

স্বরাজ সম্বন্ধে রাঙাদাদাবাবুর নিজস্ব একটা ধারণা ছিল এবং আমাদের জন্য একটা বাণী ছিল। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন, "দেখ, তোদের ঐ স্বরাজ হবার দু-একদিন আগে আমাকে খবর দিস যাতে আমি ঠিক সময়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশত্যাগ করতে পারি।"

॥ ১২ ॥

উডবার্ন পার্কে উঠে আসার পর থেকেই বোঝা গেল রাঙাকাকাবাবু মাকে দেশের কাজে ধীরে-ধীরে টেনে আনছেন। বাড়ির সামনেই বড় মাঠ ছিল। মা'কে দিয়ে মাঠে রাঙাকাকাবাবু মহিলা-সভার আয়োজন করাতে লাগলেন। সভায় নানারকম দেশাত্মবোধক বক্তৃতা হত। মনে আছে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে রঙিন ছবি দেখিয়ে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করছেন। নীল-বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের অত্যাচারের ছবি পরদায় ফেলা হচ্ছে, এখনও মনে গেঁথে আছে। সভার শেষে দেশাত্মবোধক গান কোরাসে গাওয়া হত। দেশবন্ধুর বাড়ির মহিলারা তাতে যোগ দিতেন। তাছাড়া হাতের সুতোয় তৈরি খদ্দরের কাপড় মা বিক্রি করতে বেরোতেন, জাতীয় তহবিলের জন্য চাঁদা তুলতে। পরে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার পর 'কন্ট্র্যাব্যাণ্ড সল্ট' বা 'বেআইনী লবণ' মা বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দিতেন। মা'র আলমারিতে ছোট-বড় শিশিতে ঐ লবণ সাজানো থাকত দেখেছি। ঐ বস্তুটিই ছিল তখন আমাদের ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি প্রতীক।

বাবার মতো রাঙাকাকাবাবুরও সময় ছিল কম। দেশের ও কংগ্রেসের কাজে তিনি দিনরাত ডুবে থাকতেন। সকালের দিকে তাঁকে বড়-একটা দেখতাম না, বেশি রাত পর্যন্ত খাটা-খাটুনির পর সকালে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোতেন। দাড়ি কামানোটা ঘুমের মধ্যেই হত। কাজটা করত আমাদের বাড়ির জমকালো নাপিত-মহাশয় হরিচরণ দাস। দক্ষিণ কলকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে প্রতিদিন ভোরে সাইকেল চেপে সে রাউণ্ড দিত। সে বেশ গর্বের সঙ্গে বলত কত বড় ও নামজাদা মানুষের দাড়ির দায়িত্ব তার হাতে। তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'দি রয়াল বারবার'। বর্ষার দিনে কলকাতা ভেসে গেলেও হরি-নাপিতের সাইকেল ঠিক চালু থাকত। এতগুলো দামি দাড়ি তো আর ফেলে রাখা যায় না।

রাঙাকাকাবাবু খেতে আসতেন অনেক বেলায়। তাঁর খাবার সময় দক্ষিণের বারান্দার পাথরের টেবিলে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন আমার মা। রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা একই রকম। তিনি নিয়মিত অনিয়ম করতেন। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে যখন তিনি বিকেলে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেন, আমরা প্রায়ই তাঁকে দেখতে পেতাম। গায়ে ধোপদুরস্ত খদ্দরের কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি, কাঁধে কোঁচানো খদ্দরের চাদর। পোশাক অনাড়ম্বর, কিন্তু পরিপাটি ও খুবই মানানসই। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত নাগরা পরতেন, পরে সাধারণ চটি বা কাবলি ধরনের জুতো পরতে আরম্ভ করেন। কখনও কখনও বা তিনি খুবই গম্ভীর বা

গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে নামতেন বা উঠতেন। বাথরুমে তাঁর গান কিন্তু খুবই শোনা যেত। যেমন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম', 'শিকল পরা ছল' ইত্যাদি। রাজনৈতিক আবহাওয়াটা কেমন, তার উপরই বোধ করি তাঁর 'মুড' নির্ভর করত। তাঁর 'মুড'-এর কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যখন হাসিঠাট্টা করতেন তখন তিনি একেবারেই ছেলেমানুষ। হয়তো বললেন, এসো, তোমাদের ভাল একটা গল্প শোনাই, কথামালার গল্প। গম্ভীর ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন — 'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল....'। ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিরা যতই প্রতিবাদ করে, ততই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন, না, তিনি ঠিকই বলছেন। কখনও হয়তো আমাদের একজনের মাথা দু'হাতে ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে মুখে কলসীতে জল নাড়ার মতো আওয়াজ করে প্রমাণ করতে চাইতেন যে, আমাদের মাথা জলে ভরা। কতরকম হাল্কা ঠাট্টা যে তিনি আমাদের জন্য আবিষ্কার করতেন তার ঠিক নেই। আর হাসির তো কোন বাঁধ ছিল না, ছোটদের সঙ্গে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতেন।

রাঙাকাকাবাবুর রাগের 'মুড'ও কিন্তু দেখবার মতো ছিল। সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে যেত, কথা বেশি নয়, কিন্তু চাপা ভারী গলায় যে-কয়েকটি কথা বলতেন, তাতেই বুক কেঁপে উঠত। তবে তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম, সেজন্য ব্যক্তিগত রাগারাগি খুব কমই ঘটত।

দেশাত্মবোধক বা ভক্তিমূলক গান শুনতে-শুনতে যখন তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখবার মতো হত। তাঁর বাল্যবন্ধু দিলীপকুমার রায় ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায়ই উডবার্ন পার্কের বাড়িতে জমিয়ে গানের আসর বসাতেন। দুই ভাই—বাবা ও রাঙাকাকাবাবু— পাশাপাশি বসে গান শুনতেন। দুজনেই একেবারে অভিভূত হয়ে যেতেন, তাঁদের মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠত, দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

অনেক ব্যাপারে রাঙাকাকাবাবু এমনই সরল ও অবুঝ ছিলেন যে, তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা অন্যদের হাসির খোরাক জোগাত। একসময় মা কলকাতার বাইরে গেছেন। ঠাকুমা বাসন্তী দেবীর কাছে গিয়ে রাঙাকাকাবাবু নালিশ জানালেন, "দেখুন, মেজবৌদিদি বাড়িতে না-থাকলেই ধোপাটা খুব দুষ্টুমি করে, আমার পাঞ্জাবির সব বোতামগুলি ছিঁড়ে ফেরত দেয়, মেজবৌদিদি থাকলে তো এমন করতে সাহস পায় না !" ঠাকুমা খুব খানিকটা হেসে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংসারের খুঁটিনাটি কী ভাবে চলে।

একেবারে অন্য ধরনের এক 'মুড' ও আচরণের কথা মনে পড়ল। যদিও আমি তখন খুবই ছোট, যা দেখেছিলাম তা ভোলবার নয়। রাঙাকাকাবাবু ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ভিতরের দালানে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন একটি পাথরের মূর্তি—নিশ্চল ও গম্ভীর। মা বেরিয়ে এলেন। রাঙাকাকাবাবু আস্তে-আস্তে একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিয়ে থমথমে গলায় বললেন, "যতীন দাসের অস্থি, যত্ন করে রেখে দেবেন।" সকালে মা'র সঙ্গে আমরা শহিদ যতীন দাসের শোকযাত্রা দেখে এসেছি। শেষ কাজ সব সেরে শ্মশান থেকে ফিরতে রাঙাকাকাবাবুর সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির বাইরেও নানা সভা ও অনুষ্ঠানে আমরা মা'র সঙ্গে যেতাম। সবগুলিই রাঙাকাকাবাবুর উদ্যোগে। বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের সভায় তিনি বক্তৃতা করে বেড়াতেন। তাঁর সব কথাবার্তা বুঝতে পারতাম না, এবং বক্তৃতা বেশি লম্বা হলে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তাম। তবে স্বদেশী যাত্রা মুকুন্দ দাসের গান, শরীর-চর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা

ইত্যাদির অনুষ্ঠানে বেশ উৎসাহ পাওয়া যেত। উত্তর-কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বাঙলাদেশের সবচেয়ে বড় কুস্তিগির গোবরবাবুর কুস্তি দেখেছি মনে আছে। দেশের কাজে টাকা তোলার জন্যও গান-বাজনার অনুষ্ঠানও রাঙাকাকাবাবু করতেন। খুবই ছেলেবেলার একটি ছবি মনে আঁকা রয়েছে। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক বিরাট অনুষ্ঠান হচ্ছে। মঞ্চের উপর অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, কাজি নজরুল ইসলাম ও দিলীপকুমার রায়। নজরুল নিজেই গাইলেন "দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার," ঘণ্টা বাজিয়ে তাল মিলিয়ে। দিলীপবাবু গাইলেন তাঁর মন-মাতানো "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়"।

মা'র সঙ্গে পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানেও তো যেতাম। লাল জামা গায়ে বিয়েবাড়িও কত গিয়েছি। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, গতানুগতিক পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান মনে ততটা দাগ কাটত না যতটা কাটত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নানারকম অনুষ্ঠান ও সমাবেশ।

সকলেরই এ-কথা জানা যে, জেলে যাওয়া-আসা রাঙাকাকাবাবুর জীবনের অনেকটাই জুড়ে ছিল। তাঁর গ্রেফতারের বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের খবর আমরা প্রায়ই বড় হরফে খবরের কাগজে পড়তাম। এ-ধরনের খবর তো সুখের হতে পারে না, তবে শৈশবেও মনে-মনে দেশের জন্য রাঙাকাকাবাবুর লাঞ্ছনাভোগে গৌরব অনুভব করতাম, এবং স্বপ্ন দেখতাম কবে আমিও ঐ গৌরবের ভা . পাব। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমরা খবরের কাগজ প্রথম পাতা থেকেই পড়তে আরম্ভ করতাম। সব না বুঝলেও দেশ-বিদেশের রাজনীতির খবর নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। খেলাধুলোর খবরের পাতা সে-সময় আমাদের কাছে বড় আকর্ষণ ছিল না। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ছাড়া অন্য পত্র-পত্রিকা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ঢুকত না।

উডবার্ন পার্কের বাড়ির একতলায় বেশ বিচিত্র রকমের ভিড় লেগে থাকত। প্রথমত, বাবার পেশার সঙ্গে যুক্ত উকিল ব্যারিস্টার ও মক্কেলদের ভিড়। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির লোকদের বা কংগ্রেসীদের ভিড়—প্রধানত রাঙাকাকাবাবুর জন্য। আর, তৃতীয়ত, নানা ধরনের সাহায্য-প্রার্থীদের সমাবেশ। কে বোস-সাহেবের কাছে এসেছে ও কে সুভাষবাবুকে চায়, সেটা সামনের দালানেই ঠিক হয়ে যেত। বাবার নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত ছিল, কারণ কোর্টের কাজে তিনি সকাল-সন্ধ্যা খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে তিনি ফরওয়ার্ড কাগজ, করপোরেশন বা কংগ্রেসের জরুরি কাজ সারতেন। এই সূত্রে আর একটি পার্শ্বচরিত্রের কথা বলি—আমাদের খুড়ো-দাদাবাবু শৈলেন্দ্রনাথ বসু। বসুবাড়ির এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ছিলেন বাবাদের জেনারেশনের সর্বজনীন 'খুড়ো'। তিনি বাবার হাইকোর্টের 'বাবু'র কাজ করতেন। কোর্টের সময়টুকু ছাড়া তিনি সারা দিনটাই আমাদের বাড়িতে কাটাতেন এবং বাড়ির নানা কাজে সাহায্য করতেন। মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায় তিনি বাবার পেশাগত হিসাব-পত্র রাখতেন। তিনি কিন্তু প্রায়ই বাবার স্বভাবসিদ্ধ গোছানো ও নিয়মমাফিক কাজকর্মের সঙ্গে তাল রাখতে পারতেন না এবং পিছিয়ে পড়তেন। "এই যা, ভুলে গেছি" কথাটা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। আর বাবা তাঁকে বলতেন, "খুড়ো, মেমারি পিল খাও, মেমারি পিল খাও।" যাই হোক, খুড়ো-দাদাবাবু ছিলেন এক অতি প্রাণখোলা ও পরোপকারী লোক। বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলেই ছিল তাঁর বন্ধু। বাবা যতই

রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন, পেশাগত কাজ ক্রমেই তাঁকে কমিয়ে দিতে হত। বাবা অন্য কাজের জন্য যখন 'ব্রীফ' ফেরত দিতে বাধ্য হতেন, খুড়ো-দাদাবাবু বড়ই দুঃখ পেতেন। বলতেন, "খুড়ো (মানে আমার বাবা) এমন করে ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলছেন।" যেদিন কংগ্রেসের বড় মিটিং বাড়িতে বসত, খুড়ো-দাদাবাবু অবাঞ্ছিতের মতো ক্ষুণ্ণমনে উপরে চলে আসতেন আর আফসোস করতেন। বলতেন, "আজ তো নীচে মোহনবাগানের ম্যাচ, 'ভূতের' রাজত্ব, আমার কিছু করবার নেই।" শেষ পর্যন্ত বাবা যখন জেলে গেলেন খুড়ো-দাদাবাবু খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি ছাড়েননি।

॥ ১৩ ॥

ষাট দশকের মাঝামাঝি হবে। সন্ধ্যায় আমি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে একতলায় আমার চেম্বারে বসে আছি। এক ভদ্রলোক তাঁর কার্ড পাঠালেন, বড় একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় অফিসার।

ভিতরে এসে বললেন, তিনি রুগী দেখাতে আসেননি। প্রায় রোজই তিনি অফিস থেকে বাড়ি যান আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এবং রোজই বাড়িটাকে বাইরে থেকে নমস্কার করে যান। সেদিন কী মনে করে ঢুকে পড়েছেন।

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন, "দেখুন, আমি যে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি সে-সবই আপনার বাবার জন্য। আমি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলাম, আপনার বাবার সাহায্যেই আমি লেখাপড়া করি। সেজন্য ১ নং উডবার্ন পার্কের এই বাড়ি আমার কাছে এক পবিত্র স্থান। কিছু মনে করবেন না, বিরক্ত করে গেলাম।"

দাদাভাই জানকীনাথ খুব কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া শিখেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি যে, তিনি বাবাকে বলেছিলেন, যখন সামর্থ্য হবে তখন বাবা যেন গরিব কিন্তু যোগ্য কিছু ছাত্রকে লেখাপড়া করতে সাহায্য করেন। দাদাভাইয়ের কথামতো বাবা নিজে আইন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠালাভের পরে একদল দুঃস্থ কিন্তু মেধাবী ছাত্রকে নিয়মিত পড়াশোনার খরচ দিতেন। আমরা কৌতূহলী হয়ে ভাবতুম, মাসের প্রথমে নীচের তলায় ছেলে-ছোকরাদের এত ভিড় হয় কেন ? খুড়োদাদাবাবুকে (শৈলেন্দ্রনাথ বসু) এ ব্যাপারে সব খাতাপত্র রাখতে হত। তিনি প্রায়ই হিসাবপত্র গোলমাল করে ফেলতেন।

বাবা চেপে ধরলে বলতেন, "বেশী কিছু না, আমি তো কেবল এক মাস পিছিয়ে আছি।" যখনই পারতেন বাবা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত বাবাকে দেখাতে হত।

বাবা জেলে যাবার পর ঐ সব ছাত্ররা খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। অনেকেরই হয়তো লেখাপড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদেরই মধ্যে দুজন ভদ্রলোক যাঁরা তাঁদের ছাত্রাবস্থায় বাবার সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিলেন, আমাদের দুঃসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনকেই আমরা দাদা বলতাম এবং এখনও বলি। মায়ের আর্থিক অনটনের কথা ভেবে তাঁরা ছেলেমেয়েদের কাপড়জামা ইত্যাদি উপহার দেবার অছিলায় আমাদের সাহায্য করতেন। অসুখে-বিসুখে আমাদের কাছে কাছে থাকতেন। আমাদের

প্রফুল্ল রাখবার জন্য নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

রাঙাকাকাবাবু তো সবসময়ই রাজনৈতিক কাজ নিয়ে মেতে আছেন, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে তাঁর তো দিনরাত মেলামেশা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের ছেলেমেয়েদের প্রেরণাও অনেকক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র। বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক ছিল একটু ভিন্ন রকমের, কিন্তু খুবই গভীর। সেটা সাধারণ লোকের চোখে পড়ত না। দেশের কাজে সহকর্মীরা জেলে গেলে তাঁদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা, বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ইত্যাদি করতেন। এই কাজেও দুই ভাই ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। বাবা ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর পক্ষ সমর্থন করে পরিবারের এক শুভার্থী এক বড় ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে যান। ইংরেজ অফিসারটি বললেন, "দেখ, শরৎ বসু তো অনেক টাকা উপার্জন করেন। ইনকাম-ট্যাক্সও তো অনেক দেন। তবে আমরা দেখছি যে, এখন ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা নেই বললেই চলে। আমরা জানি, শরৎ বসুর কোনও বাজে বিলাসিতা শখ বা অভ্যাস নেই, তবে টাকাগুলো যায় কোথায়? নিশ্চয়ই তিনি গোপনে কংগ্রেসের কাজে ও বিপ্লবীদের টাকা দেন।"

এই যে বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের কথা বললাম, তাঁরাও অজান্তে আমাদের বেশ প্রভাবিত করতেন। খবরের কাগজে তাঁদের সম্বন্ধে দু'রকম খবর বেরোত। এক, অত্যাচারী ইংরেজ অফিসারদের ওপর আক্রমণের কাহিনী বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো দুঃসাহসিক অভিযান। দুই, এইসব বিপ্লবীদের বিচারের বিবরণ অথবা তাদের নির্বাসন বা ফাঁসির খবর। এইসব খবর আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় করত। বাংলার তরুণ বীরদের আত্মত্যাগে আমরা যেমন অভিভূত হতাম, তেমনি গর্বিতও হতাম। বাবা ও বাড়ির অন্যরা এই ধরনের খবরে যে বেশ বিচলিত বোধ করতেন, সেটা আমাদের মতো ছোটরাও বুঝতে পারত। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে এই সব ছেলেমেয়েদের যেন একটা নাড়ির টান ছিল। কোনও ফাঁসির খবর এলে সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করত। আরও একটু বড় হবার পরে বাবার মুখে একটা কথা বেশ কয়েকবার শুনেছি।

বাবা রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলতেন, "দেখ, এই সব ছেলেমেয়ের অনেককেই আমি কাছ থেকে দেখেছি ও জেনেছি। এরা সব 'স্টার্লিং গোল্ড', খাঁটি সোনা।"

অনেক পরে বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে শুনেছি, বাবা বিনয় বসুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে লুকিয়ে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন এবং তার জন্য যত টাকা লাগে নিজেই দিতে রাজি ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের বিপ্লবীদের যখন বিচার শুরু হল, আদালতে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য বাবা চট্টগ্রামে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। সেই সময় অনন্ত সিংহের বোন ইন্দুমতী আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ইন্দুমতীর সঙ্গে আমরা ছোটরাও বেশ ভাব জমিয়েছিলাম।

রাঙাকাকাবাবুর জীবন ছিল একমুখী—দেশ আর দেশ। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর জীবনযাত্রায় খানিকটা তফাত থাকা স্বাভাবিক। বাবার আইন ব্যবসা আছে, আছে দেশের কাজ, আরও আছে নিজের সংসারের দায়িত্ব। নেহাত কাজের কথা ছাড়া কথাবার্তা বলার অবকাশ কম। বসে গল্পগুজব বা তুচ্ছ সামাজিকতা করার কথাই ওঠে না। এই কারণে অনেকেই বাবার নাগাল পেত না। ভাবত, তিনি বোধহয় পাত্তাই দিচ্ছেন না। ফলে, কখনও-কখনও ভুল বোঝাবুঝি হত।

বাড়িতে তো অসুখ-বিসুখ করেই। এ ব্যাপারে আমি ছিলাম ফার্স্ট। আমার এত অসুখ করত যে কী বলব ! কত রকমের অসুখ। বাবা বাড়িতে অসুখবিসুখের সময় একেবারে শান্ত ও অবিচলিত থাকতেন। আমাদের নতুন কাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসুর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর হাতে ছেলেমেয়েদের বা মায়ের চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন। যখন বিশেষ কারণে অন্য ডাক্তার ডাকতে হত, নতুন কাকাবাবুর মতামতই বাবা গ্রহণ করতেন। ছোটবেলায় বুঝিনি, পরে বুঝেছি বিপদের সময় শান্ত ও অবিচলিত থাকার মূলে ছিল বাবার গভীর ভগবৎ বিশ্বাস।

বাবার দুটি দীর্ঘ-মেয়াদী কারাবাসের সময় বাড়িতে ছেলেমেয়েদের, মায়ের, দাদাভাই, মাজননীর ও অন্য অনেকের গুরুতর অসুখ-বিসুখ, অপারেশন ইত্যাদি হয়েছিল। প্রথমবার কারাবাসের সময় তিনি হারিয়েছিলেন দাদাভাইকে, দ্বিতীয়বার মাজননীকে। সব বিপর্যয়ই বাবা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন নিয়তির অমোঘ সত্য হিসাবে।

এই সূত্রে নতুন কাকাবাবুর কথা কিছু বলি। সুনীলচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি, এবং কথাবার্তায় খুব সপ্রতিভ। তিনি বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফেরার পরে কিছুদিন হ্যারিংটন স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাট-বাড়িতে ডাক্তারি শুরু করেন। দরকার পড়লেই মা তাঁকে খবর দিতেন। এমন হাঁকডাক করতে করতে তিনি আসতেন যে, বাড়িতে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিত। চিকিৎসা তো করতেনই। সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন, নানা রকম রসালো গল্প। তিনি পুরোপুরি সাহেব ছিলেন পোশাক-আশাকে, আদব-কায়দায় এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে আমাদের নিয়ে যেতেন। বিলিতি কেক, বিস্কুট, চকোলেট উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ঢুকত না। নতুন কাকাবাবুর কল্যাণে আমরা তার কিছু স্বাদ পেতাম।

তাঁর রাজনৈতিক মতামত অন্য ধরনের ছিল। তিনি বেশ খানিকটা ইংরেজ-ঘেঁষা ছিলেন বলা চলে। কিন্তু তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও তারতম্য ঘটত না।

তোমরা হয়তো ভাবছ, যে পরিবারে সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন, সেই পরিবারে অন্য মতের লোক কী ভাবে আসে ! কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক। কেবল রাজনৈতিক মতামতের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের তিক্ততা আসাটাই অস্বাভাবিক। ডাক পড়লেই নতুন কাকাবাবু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর রাজনৈতিক এমন কী বিপ্লবী বন্ধুদেরও মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতেন।

নতুন কাকাবাবুর কথা বলতে গিয়ে আর একজনকার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময়—তিরিশ দশকের প্রথমে নতুন কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁদের ছোটমামা, আমাদের ছোটদাদাবাবু, রণেন্দ্রনাথ দত্ত থাকতেন। ছোটদাদাবাবুর চেহারা ছিল সাহেবের মতো। আচার-ব্যবহারেও তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব। দেশী কায়দায় খাবার দিলে তিনি আমাদের দেশী শাক-সব্জি সম্বন্ধে মজার মজার মন্তব্য করতেন। যেমন "আবার তোদের সেই লক্ষ্মীছাড়া বেগুন, আর হতচ্ছাড়া পটল !"

কয়েকটি ব্যতিক্রম থাকলেও বাবাদের জেনারেশনে মামা-ভাগ্নের মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য ছিল। সেটা হল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। তাঁরা সকলেই ভোজনরসিক ছিলেন। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুও এই দলে পড়তেন। পরিমাণেও তাঁরা বেশি খেতেন।

আমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না বলে তাঁরা

আমাদের খানিকটা কৃপার চোখে দেখতেন। ছোটদাদাবাবু রণেন্দ্রনাথ ও লালদাদাবাবু সত্যেন্দ্রনাথের ডিমের ওমলেটের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। শুনেছি ছোটদাদাবাবু রাতের খাওয়া শেষ করে মুখ ধুয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে অন্যদের বলতেন, ওমলেটের টুকরো তাঁর মুখে ফেলে দিতে, যাতে তিনি ওমলেটের স্বাদ—যেটা তাঁর কাছে ছিল অমৃতসমান—মুখে নিয়ে ঘুমোতে পারেন। লালদাদাবাবু সারা জীবন আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাঁকে বড় মাপের একটা ওমলেট দেওয়া হত।

পিসিমাদের কাছে শোনা আর একটা পুরনো গল্প বলি। এলগিন রোডের বাড়িতে তো অনেক লোক। লালদাদাবাবু, তখন তাঁর বয়স অবশ্য কম, বাজি রাখলেন যে, বাড়িতে সকলের জন্য যতটা ভাত রান্না হয় সবটা তিনি একলাই খাবেন। প্রায় বাজিমাত করে এনেছিলেন। শেষ গ্রাস নেওয়ার সময় আর পারলেন না, সবটাই উঠে গেল।

॥ ১৪ ॥

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বাবা পেশাগত কাজ নিয়ে ধানবাদ অঞ্চলে গেছেন। ভোরে একদিন দেখা গেল পুলিস আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। দরজা খুলতেই পুলিস-অফিসারদের একটি বড় দল বাড়িতে ঢুকল। হাতে খানাতল্লাশির পরোয়ানা। খানাতল্লাশির সময় বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে পারবে না। ইতিমধ্যে মা অবশ্য অন্য উপায়ে খবর পাঠিয়ে দু-চারজন আত্মীয়-বন্ধু আনিয়ে নিলেন। এধরনের ব্যাপার তো কাছ থেকে আগে দেখিনি। সার্চের রকম-সকম দেখেও অবাক হয়ে গেলাম। বাবার অফিস ঘর ছাড়াও আরও দুটি ঘরে বই ঠাসা ছিল; একদিকে আইনের অনেক বই, অন্যদিকে রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি নানা ধরনের বই। বাবার অফিসের কাগজপত্রও পুলিসে তছনছ করে ফেলল। প্রত্যেকটি চিঠি খুলে পরীক্ষা করল। তাক ও আলমারি থেকে বইগুলি নামিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখল, কোনো বইয়ের ভিতরে লুকনো কিছু আছে কি না! তারপর বাকি বাড়িটা তো আছেই। খানাতল্লাশি শেষ করতে সারা দিন লেগে গেল। বেশ কিছু বই ও কাগজপত্র, যেগুলি তাদের রাজদ্রোহাত্মক বলে মনে হল, তারা আলাদা করে তালিকাভুক্ত করল এবং যাবার সময় নিয়ে চলে গেল। তালিকাটি পরে হারিয়ে গিয়েছিল এবং দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমরা কিছু ফেরত পাইনি। এইভাবে বাবার লাইব্রেরির বেশ একটা অংশ আমরা হারাই। পরে রাঙাকাকাবাবুর একটি মূল্যবান সংগ্রহের একই অবস্থা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে রাঙাকাকাবাবু যখন দেশে ফেরেন, অনেক বই কাঠের বাক্সে বোঝাই করে তিনি মালবাহী জাহাজে দেশে পাঠিয়েছিলেন। নিজে তো বোম্বাই পৌঁছোতেই গ্রেপ্তার হন। তাঁর বইগুলির বড় অংশই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

কলকাতায় যখন বাড়ি তল্লাশি চলছে, সরকার-বাহাদুর সেই সন্ধ্যায় ঝরিয়ায় বাবাকে গ্রেপ্তার করার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। পরে বাবার কাছে শুনেছি, সারাদিন কাজের পর রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে বাবা ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের বাংলোয় যখন একটু আরাম করে গল্পগুজব করছেন, তখন দেখা গেল চারিদিকের অন্ধকার ভেদ করে দুটি

C/o The Superintendent
Cowasji Sanatorium
Bhowali U.P.
২৯/১০/৩২

Censored and Passed
1/11/32
D.I.G. I.B., C.I.D. Bengal

মাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠি

মোটরগাড়ির জোরালো আলো তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাবা আন্দাজ করেছিলেন কী হতে যাচ্ছে। গ্রেপ্তারের পর সরকার বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসেনি। সুদূর মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের বেশ কিছু দূরে সিউনি বলে এক পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তাঁকে নিয়ে গেল। বাবা সেখানে পৌঁছে দেখলেন ভাই সুভাষচন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ইতিমধ্যেই

সেখানে পৌঁছে গেছেন। মাসখানেক আগে গান্ধীজির সঙ্গে বোম্বাইয়ে দেখা করে কলকাতা ফেরবার পথে রাঙাকাকাবাবুকে কল্যাণ স্টেশনে গ্রেপ্তার করে পরে সিউনি সাব-জেলে বন্দী করেছিল।

১৯৩০ সাল থেকেই বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনার পর বাবা ১৯৩০-এর মাঝামাঝি দাদাভাইকে একটা চিঠি লিখে জানান যে, তিনি কংগ্রেসের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবার জন্য কিছুদিনের জন্য আইনব্যবসা বন্ধ রাখছেন। ঐতিহাসিক ঐ চিঠিটি সম্প্রতি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো প্রকাশ করেছে। সেই যে বাবা এক বন্ধুর পথে পা বাড়ালেন, তারপর আর ফিরে তাকাননি, রাঙাকাকাবাবুর সংগ্রামের সাথী হয়ে সব বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেবল এগিয়েই গিয়েছেন।

বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলটি বসুবাড়ির দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ জায়গা। এখনই তো বললাম বাবা প্রথমবার ঐ অঞ্চল থেকেই গ্রেপ্তার হন। সেই থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেখানে ঘটেছে। আমার নিজের ঐ অঞ্চলে যাওয়া-আসা অবশ্য আরও আগে থেকে—যখন আমি খুবই ছোট। তার অনেক সুন্দর স্মৃতিও আমার মনে ধরা আছে। আমাদের ন'কাকাবাবু সুধীরচন্দ্র বসু ঐ অঞ্চলে কাজ করতেন। তিনি কয়লা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ন'কাকিমা শান্তিলতা দেবী আমার শিশু-বয়স থেকেই আমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন। জীবনের প্রথম বছরেই আমার অসুখ করতে আরম্ভ করে। সেই সময় আমার মা নিজের অসুস্থতার জন্য ন'কাকিমার হাতে আমার দেখাশুনোর ভার ছেড়ে দেন। সেই থেকে ন'কাকিমার সঙ্গে আমার এক বিশেষ মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে শান্তিমা বলে ডাকতাম। তাঁর নিজের ছেলে ছিল না। বড় মেয়ে ছায়া আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। সে অসাধারণ সুন্দরী ছিল এবং তার স্বভাবটি ছিল খুবই কোমল। ছায়া ও আমার মধ্যে ছিল আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক। আমার স্কুলের ছুটির সময় ন'কাকাবাবু ন'কাকিমা বেশ কয়েকবার তাঁদের কাছে আমাকে নিয়ে গেছেন এবং খুব সুখে ও আনন্দে আমি তাঁদের কাছে থেকেছি। কলকাতা থেকে গিয়ে বিহারের শুকনো, অনুর্বর, উঁচুনিচু খনি-অঞ্চল বেশ নতুন রকম ঠেকত। ন'কাকাবাবু গাড়িতে চাপিয়ে প্রায় রোজই আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। ফলে ছেলেবেলা থেকেই ঐ অঞ্চলটির সিজুয়া, জামাডোবা, কাতরাস ইত্যাদি জায়গার সঙ্গে আমার বেশ একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ন'কাকাবাবুর মতো প্রাণখোলা স্নেহপ্রবণ লোক আমি কমই দেখেছি। বসুবাড়ির অন্য অনেকের মতো খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁরও বেশ দুর্বলতা ছিল। তাঁর মতে জ্বর হলে পথ্য হওয়া উচিত লুচি আর মাংস। সত্যিই তিনি নিজে জ্বরে পড়লে ঐ পথ্য করতেন। আমার স্বাস্থ্যের গোলমাল হলে ন'কাকিমা যখন খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাট করতেন, ন'কাকাবাবু তাতে ঘোর আপত্তি জানাতেন। পরে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর রাঙাকাকাবাবু স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশ কিছুদিন ন'কাকাবাবুর জামাডোবার বাড়িতে ছিলেন। গান্ধীজিকে তাঁর অনেক ঐতিহাসিক চিঠি জামাডোবা থেকে লেখা। কংগ্রেসের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ নিয়ে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে জওহরলাল সেই সময় জামাডোবায় এসেছিলেন। তাছাড়া এটা তো এখন সকলেরই জানা যে, ১৯৪১-এ রাঙাকাকাবাবুর ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের ব্যাপারে ঐ অঞ্চলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি



আমার আঁকা রাঙাকাকাবাবুর ছবি

ছিল। ধানবাদের কাছাকাছি বারারিতে তিনি একদিন আত্মগোপন করেছিলেন, এবং গোমো থেকে পেশোয়ারের পথে রওনা হন। এ বিষয়ে আমি "মহানিষ্ক্রমণ"-এ লিখেছি। পরে আরও কিছু বলব।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, দুঃসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। এর যথার্থতা আমরা বাবার দুই দীর্ঘ কারাবাসের সময় বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। প্রথমবার—১৯৩২-১৯৩৫—

মা খুবই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথমত নিজের সংসার চালাতে হবে। বাবার জমানো পুঁজি ছিল না—ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর অভ্যাস বা অবকাশ তাঁর কোনোদিনই ছিল না। দ্বিতীয়ত বাবা গ্রেপ্তার হবার বছর খানেক পরেই রাঙাকাকাবাবুকে স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপ পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। রাঙাকাকাবাবুর ইউরোপের খরচ চালাবে কে? বাবা তো নিজেই জেলে। সুতরাং এই ভারটাও মার উপর পড়ল। সেই সময় পরিবারের কয়েকজন অকৃত্রিম বন্ধু মাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের কথা আমরা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই সূত্রে দুজন বন্ধু ও তাঁদের পরিবারের কথা আগে বলি। একজন প্রভাসচন্দ্র বসু, অন্যজন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। দুজনকেই আমরা চিরকাল কাকাবাবু ডেকে এসেছি। বাবা গ্রেপ্তারের একবছর আগে আমার বড় দাদাকে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাবা গ্রেপ্তার হওয়া মাত্র প্রভাসচন্দ্রবাবু এসে মাকে বললেন যে, বাবা যতদিন জেলে থাকবেন, দাদার জার্মানির খরচের ভার তাঁর। বাবা ফিরে শোধ দেবেন। প্রভাসচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা অবশ্য তার অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বাবা-মা'র সঙ্গে ছুটিতে আমরা যখন পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম প্রায়ই কাকাবাবু প্রভাস বসু, কাকিমা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা আমাদের সাথী হতেন। নৃপেনবাবু তো বাবার জেলবাসের সময় নিজেই আমাদের পাহারা দেওয়ার ভার নিয়ে ফেললেন। প্রায় রোজই সন্ধ্যায় তিনি আমাদের দেখতে আসতেন। বলতে পারি সেই সময় আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তিনজন, মামাবাবু অজিতকুমার দে, প্রভাসচন্দ্র বসু ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। বাবার সঙ্গে সৌহার্দ্যের ফলে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গেও শেষোক্ত দুজনের বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নৃপেনবাবুকে রাঙাকাকাবাবু নিজের ব্যক্তিগত এটর্নি নিযুক্ত করেন, যাতে আইনানুসারে নৃপেনবাবু তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। আজ তাঁর বয়স নব্বুই ছাড়ালেও নৃপেনবাবু সাধ্যমতো নেতাজী ভবনের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তিনিই বর্তমানে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর চেয়ারম্যান।

সিউনি সাব-জেলে বন্দী হবার পর থেকেই বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসার সূত্রে ব্রিটিশ সরকার রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ঘোরাতে থাকে, মাদ্রাজ, ভাওয়ালি, লখনৌ, জব্বলপুর। বাবাকে জব্বলপুরেই রাখে। রাঙাকাকাবাবুর স্বাস্থ্যের অবস্থা শেষ পর্যন্ত এতই খারাপ হয় যে, ভারত সরকারের সঙ্গে বসু-পরিবারের পক্ষ থেকে কথাবার্তা শুরু করা স্থির হয়। ভারত সরকারের কট্টর হোম মেম্বারের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলার ভারও পড়ে আমার মা'র উপর। লখনৌয়ের বলরামপুর হাসপাতালে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে প্রথমে আলোচনা করে মা দিল্লি যান হোম মেম্বার হ্যাটে সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হল যে, চিকিৎসার জন্য রাঙাকাকাবাবুকে তারা ইউরোপ যেতে দেবে, তবে ভারতের মাটি ছাড়ার পরই তিনি মুক্ত হবেন। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি রওনা হয়ে গেলেন ভিয়েনার পথে।

ইউরোপ থেকে রুগ্‌ণ অবস্থায় রাঙাকাকাবাবুর একটি ছবি মা'র কাছে পাঠান। আমার আর্টের মাস্টারমশাই হরেনবাবু আমাকে সেটা আঁকতে দিয়েছিলেন। শৈশবে আঁকা সেই ছবিটি এখনও আমার কাছে আছে।

॥ ১৫ ॥

১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা করবার আগে দাদাভাই, মাজননীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দেখা হল না। মা যখন দিল্লিতে ইংরেজি হোম মেম্বারের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, সরকারের মনোভাব খুবই কঠোর। যাত্রার আগে কিছুদিনের জন্য কেবল তারা রাঙাকাকাবাবুকে বাবার কাছে জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলে এনে রাখতে রাজি হল। তাঁকে দেখতে দল বেঁধে আমরা জব্বলপুর গিয়েছিলাম আগেই বলেছি।

বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে জেলে দেখা করবার সময় আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা হত। প্রথমত, দুজনেই রাজবন্দীদের অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, সরকারি বা জেলের কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করছেন কী না! না করলে তুমুল গোলমাল শুরু হত। যেমন হয়তো পরিবারবর্গের 'বডি-সার্চ' করার আদেশ হল। এরকম ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের বেলায়, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু তো দেখা করতেই অস্বীকার করতেন। এমন ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে পরে ঘটেছে। কিন্তু জেলের নিয়ম অনুযায়ী দেখা করবার সময় পুলিসের লোকও উপস্থিত থাকবেই। সব কথা তো তাদের সামনে বলা সম্ভব নয়। তাদের চোখে ধুলো দেবার নানারকম উপায় বাবা ও রাঙাকাকাবাবু বের করতেন। যেমন, জব্বলপুর জেলে তাঁদের ব্যারাকের মধ্যে পার্টিশন দিয়ে পুজোর ঘর করেছিলেন। তাঁরা আমাদের, বিশেষ করে মা বা বাড়ির মহিলাদের, পুজোর ঘর দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং চাইতেন আমরা যেন ইন্টারভিউ শেষ হবার আগে অতি অবশ্য পুজোর ঘর দর্শন করে যাই। ঠাকুরের আসনের নীচে গোপনীয় কাগজপত্র লুকনো থাকত। মা বা বাড়ির অন্য কোনও মহিলা সেগুলি সংগ্রহ করে লুকিয়ে বাইরে নিয়ে আসতেন।

রাঙাকাকাবাবু আবার আমাদের মতো 'অতিথি'দের জন্য নানারকম জলখাবারের আয়োজন করতেন। জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে এর জন্য অতিরিক্ত রেশন দাবি করতেন। তাঁদের সঙ্গে যে-সব সাধারণ কয়েদি থাকত, তাদের মধ্যে দু-একজনের উপর রান্নার ভার দেওয়া হত এবং তারা রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশমতো নানারকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করত। তবে আর যাই হোক, আমার মনে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রান্নার ব্যাপারে বিশেষ পটু ছিলেন না। চপের মাংস প্রায়ই আধসিদ্ধ থেকে যেত, সন্দেশ বলে যা আমাদের পরিবেশন করতেন তা প্রায় হত পাথরের মতো শক্ত।

রাঙাকাকাবাবুর জন্য জব্বলপুর জেলের মধ্যেই তাড়াহুড়ো করে ইউরোপের উপযোগী গরম জামা-কাপড়, টুপি, জুতো ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হল। পুলিস-পাহারায় দর্জি ও জুতো বানাবার লোককে হাজির করা হল। ইউরোপ গিয়ে রাঙাকাকাবাবু কী ধরনের পোশাক ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট মতামত ছিল। কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময় ভারতীয় পোশাক পরাটাই তিনি উচিত মনে করতেন। আমার মনে হয়, তিনি এইভাবে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বভারতীয় পোশাক উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। লম্বা আচকান, কাশ্মীরি টুপির সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় প্যান্ট ও ফিতে-বাঁধা জুতো মিলিয়ে পরতেন—এই পোশাকে তাঁর বহু ছবিও

আছে। একটা কথা তাঁকে ইউরোপ থেকে ঘুরে আসার পরে বলতে শুনেছি। ইউরোপে চুড়িদার পায়জামা পরা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল। কারণ, ঐ ধরনের পায়জামা ইউরোপে 'আণ্ডারওয়েয়ার'এর পর্যায়ে পড়ে এবং তিনি শুনেছেন সেখানকার সমাজে চুড়িদার পায়জামাপরা কোনো-কোনো ভারতীয়কে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে। অবশ্য রাঙাকাকাবাবু পরে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইউরোপীয় পোশাক আনুষ্ঠানিকভাবেও পরেছেন। তবে, পোশাক যাই হোক না কেন, বিদেশে গিয়ে ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে যাতে কোনোরকম খুঁত না থাকে সে-বিষয়ে তিনি খুব সজাগ থাকতেন। তিনি বলতেন, বিদেশে গেলেই পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার খুবই রুচিসম্মত হওয়া চাই। কারণ, সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, আমরা অন্য দেশে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের মহান দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কী রকম আচার-ব্যবহার করি তার উপর আমাদের দেশের সুনাম নির্ভর করছে।

জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে কড়া পুলিস পাহারায় অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে সরকারি কর্মচারীরা রাঙাকাকাবাবুকে স্টেশনে নিয়ে গেল এবং স্ট্রেচারে করে বোম্বাই মেলে তাঁর নির্দিষ্ট কামরায় তুলে দিল। খবরটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় স্টেশনে বেশ ভিড় হয়েছিল। বাড়ির যারা জব্বলপুর গিয়েছিলাম, প্রায় সকলেই তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম।

তাঁর জাহাজ বোম্বাই ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়নি।

জব্বলপুর জেলে বাবা একলা পড়ে গেলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে লাগল। বাবার স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা ও লেখালেখি আরম্ভ হল। আমাদের পরিবারের দুই বন্ধু প্রভাসচন্দ্র বসু ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং মামা অজিতকুমার দে উঠে পড়ে লাগলেন। বাবার গ্রেপ্তারের পর দিল্লির সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বিরোধীপক্ষ থেকে মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন তোলা হত। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে একবার হোম মেম্বার চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে বসলেন, "গভর্নমেণ্ট হ্যাভ রিসনস টু বিলিভ দ্যাট হি ইজ ডিপ্‌লি ইনভল্‌ভড্ ইন দি টেররিস্ট মুভমেণ্ট।" (সরকারের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।) সুতরাং সরকার বাবাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবার প্রস্তাব বিবেচনা করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক চেষ্টার পর, বাবার স্বাস্থ্য যখন সত্যিই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা বাবার কার্শিয়ঙের বাড়িতে তাঁকে বন্দী করে রাখতে রাজি হল।

নিজের বাড়িতে পাহারাওয়ালা-বেষ্টিত হয়ে বন্দী হয়ে থাকাটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বাবা পথ দেখালেন। পরে ১৯৩৬-এ রাঙাকাকাবাবুও একই ভাবে কার্শিয়ঙে আমাদের বাড়িতে বন্দীজীবন যাপন করেন।

রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ চলে যাবার পরে ও বাবা কার্শিয়ঙে স্থানান্তরিত হবার পরে মা আমাকে নিয়ে পুরীতে দাদাভাই ও মাজননীর সঙ্গে দেখা করতে যান। মায়ের উদ্দেশ্য ছিল দাদাভাইকে অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলা। মা যে দিল্লিতে নিজে দরবার করেও ইউরোপ যাবার আগে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দাদাভাই ও মাজননীর দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেননি, সেজন্য মায়ের গভীর দুঃখ ছিল। ফলে দাদাভাইয়ের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আর

জীবনে দেখা হয়নি। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দাদাভাই সেই সময় বলেছিলেন, "তোমাকে তো আমি আমার 'মাজননী' বলেই এতদিন জানতাম, দুঃখ কোরো না, তুমি তো আজ আমার ছেলের কাজ করলে।"

পুরী থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে আমরা সকলে ছুটির সময় সরকারের অনুমতি নিয়ে বাবার কাছে আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে থাকতে গেলাম। বাড়িটি কার্শিয়াং শহর থেকে বেশ কিছু দূরে এবং মোটরের রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। দিনরাত রাইফেলধারী ডবল-ডবল সিপাই বাড়িটি পাহারা দিত। তা ছাড়া আমাদের সন্দেহ হত যে, আরও জনাকয়েক স্থানীয় বাসিন্দাকেও কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে পুলিস তাদের কাজে লাগাত। কার্শিয়াং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সব সময় কড়া নজর রাখতেন। দার্জিলিংয়ের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারও নিয়মিত এসে সব ব্যবস্থা দেখে যেতেন। বাবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন সিভিল-সার্জন মেজর এস বি মুখার্জি। মেজর মুখার্জিব মতো নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক কমই দেখেছি। সরকারি কাজ করতে এসে বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা বহুদিন অব্যাহত ছিল। পরে মেজর মুখার্জির অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাবা ভ্রাতৃবিয়োগের ব্যথা পেয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের কষ্ট লাঘব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাস্থ্যের কারণে সরকার বাবাকে পুলিস পাহারায় বিকেলে হিলকার্ট রোডে ওপরের দিকে এক মাইল ও নীচের দিকে এক মাইল বেড়াতে দিত। আমরাও বাবার সঙ্গে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে বেড়াবার সময় রাস্তায় অঘটন ঘটে যাবার উপক্রম হত। যাঁরা দার্জিলিং বা ঐ অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন, তাঁদের ঐ রাস্তা দিয়েই যেতে হত। বাবাকে দেখতে পেয়ে অনেকে উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করতেন। পেছনেই তো পুলিস। বাবা মুখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কথা বলা বারণ।

গ্রেপ্তার, খানাতল্লাশি, নির্বাসন সম্বন্ধে তো কত কথা বললাম। একটা কথা এই সূত্রে না বলে পারছি না। আজকালকার-ছেলেমেয়েরা এসপ্ল্যানেডে যে মাঝে মাঝে গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার খেলা দেখে, এখানে-ওখানে রিলে-অনশন, চব্বিশ ঘণ্টার অনশনের গল্প শোনে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা কিন্তু এ ধরনের ফাঁকি দিয়ে দেশ উদ্ধাবের প্রহসনের সাক্ষী ছিলাম না। গ্রেপ্তার বা খানাতল্লাশি বা অনশন ছিল অতি গুরুতর ও সর্বনাশা ব্যাপার। ব্যক্তির পক্ষে তো বটেই, বহু পরিবারের ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও বাংলার বিপ্লবীরা সংগ্রামের এসব হাতিয়ার কখনও ফাঁকা লোক-দেখানো তামাশার মতো ব্যবহার করতেন না। যখন পুরনো দিনের কথা লিখি, তখন ভাবি, কবে আবার অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের ঢেউ বাংলা তথা ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

॥ ১৬ ॥

কার্শিয়ঙে গিধাপাহাড়ে আমাদের বাড়ি ও নীচে আঁকাবাঁকা হিলকার্ট রোডের সঙ্গে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর স্মৃতি আমার মনে মিশে আছে। কারণ ঐ বাড়িতে দু'জনকে খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং দু'জনের সঙ্গেই হিলকার্ট রোডে যে কত বেড়িয়েছি তার হিসেব নেই। লেখাপড়ার ব্যাপারে বা জীবনের ছোট বড় মূল প্রশ্ন নিয়েই অনেক শিক্ষা সেখানেই

পেয়েছি। এখনও প্রায়ই মনে পড়ে, গিধাপাহাড়ের বাড়ির বসবার ঘরে বাবা বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁর দরাজ গলায় শোনাচ্ছেন। রাঙাকাকাবাবু আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা সহজ করে বোঝাচ্ছেন, বা তাঁদের সঙ্গে হিলকার্ট রোডে বেড়াচ্ছি, কথা বলছি, আর মধ্যে মধ্যে খুব আওয়াজ করে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের খেলনার মতো রেলগাড়ি নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে।

বাবা যখন কার্শিয়ঙে বাড়িতে বন্দীজীবন যাপন করছেন, আমি তখন ইস্কুলের মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করেছি। দেখা যায় বিপর্যয়ের মধ্যেও অনেক সময় কিছু কল্যাণ হয়।

বাবা কার্শিয়ঙে বন্দী থাকার সময় ইস্কুলে ছুটি হলেই আমরা মা'র সঙ্গে সকলে মিলে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতাম। সরকারের এই অনুগ্রহে আমার বিশেষ একটা লাভ হয়েছিল। বাবার কাছে কিছু লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমত, বাবার বোধহয় মনে হয়েছিল যে, আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। সেজন্য যখন কাছে থাকতাম না তখন আমাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলতেন। চিঠিগুলির ভুলত্রুটি দাগ দিয়ে সংশোধন করে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। কাছে থাকলে কী কী বাবা পড়াতেন বা পড়তে বলতেন সে সম্বন্ধে কিছু বলি।

আমার মনে হয় বাবার বিশ্বাস ছিল যে, ভাষা ও সাহিত্যেই আমাদের শিক্ষার বুনিয়াদ। আমরা যা কিছু পরে শিখি সবই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের গভীরে প্রবেশ করে—সেটা আদর্শগত ব্যাপারই হোক বা বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতি যাই হোক না কেন। আর একটা কথা বাবা খুব জোর দিয়ে বলতেন, ভাষা ভাল করে শিখতে হলে মুখস্থ করা চাই। অনেকেই জানেন যে, বাবা ইংরেজ কবি মিলটনের কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। কলেজে ঢোকার পর সেই কাব্যের অংশবিশেষ মুখস্থ করতে আমরা তো হিমশিম খেতাম।

বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে বাবা প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা পড়তে বলেন। শুধু পড়াই নয়, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী থেকে কতকগুলি লম্বা লম্বা রচনা মুখস্থ করতে হত। মনে আছে আমার দিদি মীরাকে ও আমাকে কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' পুরোটা মুখস্থ করে বাবাকে শোনাতে হয়েছিল। প্রাণ যায় আর কী। কেবল মুখস্থ হলেই চলবে না, উচ্চারণ ও পড়ার কায়দা ঠিক হওয়া চাই। কয়েকটা অংশ এখনও ঠিক মুখস্থ আছে :

"সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল। আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম। আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম।"

"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা ? কই আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি ?"

"এস ভাই সকল ! আমরা কালস্রোতে ঝাঁপ দিই ! এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি...ভয় কী ? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কী ?..."

ইংরেজি শেখাতে বাবা একদিকে বাইবেল, অন্যদিকে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়াতেন। তিনি নিজে কোরানও পড়তেন। বাবা বলতেন ভাল ইংরেজি শিখবার প্রথম পদক্ষেপ মন দিয়ে বাইবেল পড়া। বাইবেলের অনেক অংশও আমাকে মুখস্থ করতে হত। ইংরেজিতে

বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী বাবার কাছে ছিল। পরিচ্ছেদ বেছে বেছে পড়তে দিতেন। শিকাগোর পার্লামেন্ট অব রিলিজনস-এ বিবেকানন্দের ইংরেজি বক্তৃতা মুখস্থ করতে হয়েছিল। এখনও বেশ খানিকটা মুখস্থ আছে। বাবা বলতেন, বিবেকানন্দের মতো ইংরেজি লেখা তিনি খুব কমই পড়েছেন। আর ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী যদি নিতে পারা যায় তাহলে তো কথাই নেই। এখনও বাবার গলায় শুনতে পাই বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা থেকে কয়েকটি লাইন :

May the bell that tolled this morning in honour of this convention be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.

ইংরেজি কবিতাও মুখস্থ করে শোনাতে হত। শেলির 'দি স্কাইলার্ক' পুরোটা কণ্ঠস্থ করে বাবার কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল—আরও ছিল কোলরিজের 'দি এনসিয়েন্ট মেরিনার'।

বাবা 'গল্পগুচ্ছ' দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়া আরম্ভ করতে বলেছিলেন। বিদেশী গল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়ান লেখকরা ছিলেন বাবার খুব প্রিয়, বিশেষ করে লিও টলস্টয়। টলস্টয়ের 'টোয়েন্টিথ্রী টেলস' আমাকে প্রথম পড়তে দিয়েছিলেন। পরে টলস্টয়ের কিছু-কিছু প্রবন্ধও পড়িয়েছিলেন। বাবা বলতেন যে, গান্ধীজি অনেক ব্যাপারেই টলস্টয়পন্থী ছিলেন. পরে বড় হয়ে বাবার সংগ্রহ থেকে টলস্টয়ের ও টুর্গেনিভের বড় বড় উপন্যাস পড়েছি।

কার্শিয়াঙে গিয়ে বাবার শরীরের কিছু উন্নতি হল। যদিও বন্দী হয়ে থাকার যে অশান্তি, সে তো যাবার নয়। অন্যদিকে ইউরোপ-প্রবাসী রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে বাবা-মার খুব চিন্তা। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ডাক্তারের মতামত রাঙাকাকাবাবু জানাচ্ছেন, কোনোটা আশাপ্রদ, আবার কোনোটা নয়। নানা রকমের চিকিৎসা তিনি করাচ্ছিলেন। বেশ কিছুদিন তো ভিয়েনা ছেড়ে চেকোস্লোভাকিয়ার কার্লসবাদ স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে সেখানকার প্রাকৃতিক উষ্ণ জল অনেক খেলেন। কিন্তু তাঁর 'গল-ব্লাডার' বা পিত্তকোষের অসুখ কিছুতেই বাগ মানছিল না। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করাতেই হয়, সেকথা পরে বলব।

ইউরোপে চিকিৎসা তো হবে, কিন্তু খরচ ? সেটাও একটা বড় চিন্তা। বাবা জেলে যাওয়ার পর কটকের সংসার চালাবার জন্য দাদাভাই জানকীনাথকে আবার কোর্টে বেরোতে হয়। আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত দিল্লির সরকার যে ভাতা মঞ্জুর করেন তার পরিমাণ বাবার মাসিক আয়ের তিরিশ ভাগের একভাগ হবে ! বাবার যা কিছু জীবনবীমার পলিসি ছিল সে তো সব ভেস্তে গেল। এই অবস্থায় আমার মাকে রাঙাকাকাবাবুর জন্য অন্য পথ খুঁজে বের করতে হল। ঐ সূত্রে দুজনের কথা বিশেষ করে বলছি। একজন ছিলেন নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের পিতৃতুল্য রাজা নরেন্দ্রলাল খানের ছেলে। দেবেন্দ্রলাল খান এগিয়ে এলেন রাঙাকাকাবাবুর জন্য অর্থ-সাহায্য নিয়ে। মাকে বললেন, এ সাহায্য গ্রহণ করতে যেন কোনো দ্বিধা না করেন, কারণ তিনি কেবল একটি জাতীয় কর্তব্য করছেন। সেই থেকে দেবেন্দ্রলালও আমাদের আর এক কাকাবাবু হয়ে গেলেন, এবং দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বাবা দেবেন্দ্রলালের কোনো সামাজিক আমন্ত্রণও কখনও এড়িয়ে যেতে পারতেন না। বলতেন, ওখানেও চিরকালের জন্য আমরা বাঁধা পড়ে আছি।

ব্যারিস্টারিতে বাবার 'গুরুজী' ছিলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। রাজনীতিতে তাঁদের মতামত ছিল সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। বাবার কাছে শুনেছি, দেশবন্ধু প্রায়ই বলতেন, লাইফ ইজ লারজার দ্যান পলিটিকস। বাবা ও নৃপেন্দ্রনাথের সম্পর্কটা ছিল এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন তো দেখছি উলটো কথা শেখানো হয়। বোধহয় অনেকে আজও জানেন না কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে ভারত সরকারের ল মেম্বার স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সুভাষচন্দ্র বসুর ইউরোপে চিকিৎসার জন্য গোপনে মাকে অর্থ সাহায্য করতেন। সরকার সাহেবের সঙ্গে এই সূত্রে দেখা করতে মা বেশ কয়েকবার আমাকে সঙ্গে করে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। সরকার-সাহেব গভীর স্নেহের সুরে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর খবর নিতেন এবং অতি নম্রভাবে একটি খাম মা'র দিকে এগিয়ে দিতেন।

বাবার কাছে লেখাপড়ার কথা বললাম। বাড়ির ছেলেমেয়েদের আরও একটা বিধান ছিল—সন্ধ্যাবেলা একসঙ্গে বসে স্তোত্র পাঠ। এটা বোধহয় রাঙাকাকাবাবুই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, কারণ বড় ভাইবোনেদের কাছে শুনেছি ছেলেবেলায় তাঁদেরও এলগিন রোডের বাড়িতে এটা করতে হত। আমাদের স্কুলজীবনে উডবার্ন পার্কেও ঐ নির্দেশ জারি ছিল, কিন্তু কার্শিয়ঙে গেলে স্তোত্রপাঠের অধিবেশন প্রতি সন্ধ্যায় বসবেই। আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের স্তবের খাতা ছিল এবং স্তবগুলি মুখস্থ করতে হত। দুটি স্তবের কয়েকটি মনে আছে। একটি ভবানী-স্তোত্র :

> ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্নদাতা
> ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা
> ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তি মমৈব
> গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী।

অন্যটি ছিল শিবস্তোত্র :

> প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্
> গুণহীনমহীশ গরলাভরণম্
> রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরম্
> প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

॥ ১৭ ॥

ব্রিটিশ সরকার ইউরোপ যাওয়ার ব্যাপারে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে একটা চাতুরি করেছিল। ১৯৪১ সালে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পুরনো নথিপত্র দেখতে গিয়ে আমি এটা বুঝতে পারি। একদিকে তো লণ্ডন থেকে ইণ্ডিয়া অফিস (মানে সেকালকার আমাদের দেশশাসনের হর্তাকর্তারা) ইউরোপের নানা দেশে ইংরেজ সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, অতি বিপজ্জনক এক ব্যক্তি ইউরোপে এসেছেন, তাঁর উপর যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। অন্যদিকে তাঁদের জানাচ্ছেন যে, সুভাষচন্দ্র বসুর পাসপোর্টে গন্তব্যস্থান হিসাবে ইটালি ও অস্ট্রিয়া এই দুটি দেশের নাম লেখা আছে। এতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, অন্য কোনো দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ড, যাবার ছাড়পত্র তাঁর

নেই। আসলে কিন্তু তারা গোপনে স্বীকার করছে যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের যে-কোনো অধিবাসীর (যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট আছে) ইংল্যাণ্ডে যাবার অধিকার আছে। আবার বলছে যে, সুভাষচন্দ্র বসুর একটা ধারণা হয়েছে যে, তাঁর ইংল্যাণ্ডে যাবার ছাড়পত্র নেই, এই ভুল ধারণাটা যেন ব্রিটিশ কূটনীতিকেরা ভেঙে না দেন! কারণ, দুটি জায়গা থেকে তাঁকে দূরে রাখা বিশেষ দরকার—লণ্ডন ও বার্লিন। ঐ দুটি জায়গায় অনেক ভারতীয় ছাত্র আছে। ইংরেজ সরকারের ভয়, সুভাষচন্দ্রের প্রভাব তাদের উপর পড়লে সমূহ বিপদ। যাই হোক, তিরিশের দশকে এই চাতুরি কাজ করলেও, চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে রাঙাকাকাবাবু ব্রিটিশ সরকারকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের ছাড়পত্র বিনাই তিনি পৃথিবীর যে-কোনো দেশে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে পারেন।

১৯৩৪-এর মাঝামাঝি, রাঙাকাকাবাবু যখন ইউরোপে ও বাবা কার্শিয়ঙে অন্তরীণ, দাদাভাই জানকীনাথ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত কটক থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। প্রায় মাস তিনেক ধরে যমে-মানুষে লড়াই চলল।

১৯৩১ সালে আমাদের কাকাবাবু শৈলেশচন্দ্রের বিয়ে ছিল দাদাভাইয়ের জীবনের শেষ আনন্দোৎসব। ছোটকাকা সন্তোষচন্দ্র আগেই মারা গিয়েছিলেন, ফলে কাকাবাবুই সেই সময় বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বিয়েতে বসু-বাড়ির যে যেখানে আছেন, কলকাতায় এসে মিলিত হন। বিয়ের পর ১নং উডবার্ন পার্কের মাঠে বৃহত্তর বসু-পরিবারের একটা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। শ'খানেক লোক—বসু-বাড়ির চার পুরুষ একসঙ্গে। ছবিটা তুলতে ফোটোগ্রাফারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ ক্যামেরার পরিধির মধ্যে সকলকে ধরানোই যাচ্ছিল না। আমাদের সৌভাগ্য, রাঙাকাকাবাবু বিয়ের সময় জেলের বাইরে ছিলেন এবং সব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালের পর থেকে নানারকম পারিবারিক বিপর্যয়—বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর গ্রেফতার এবং একের পর এক নিকট-আত্মীয় ও কনিষ্ঠদের মৃত্যু—দাদাভাইয়ের শরীর ও মন ভেঙে দিয়েছিল। এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর জীবনের শেষ দু-তিন মাসের স্মৃতি আমাদের সকলের মনেই খুব বেদনার উদ্রেক করে। বেশ কিছুদিন তিনি একেবারেই শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা নতুনকাকাবাবু করেছিলেন, বাড়িতে বড়-বড় ডাক্তার-কবিরাজের ক্রমাগতই আনাগোনা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুরা প্রায় সব সময়েই ভিড় করে থাকতেন। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। এখন তো গুরুতর অসুস্থ রোগীর ঘরে ডাক্তাররা কাউকে ঢুকতেই দেন না। আর আজকাল বেশি অসুখ করলে তো হাসপাতালে দেওয়াই রেওয়াজ। দাদাভাইয়ের ঘর—যেটা এখন নেতাজীর ঘর বলে সকলে জানে—প্রায়ই ভরে থাকত। আমি আজ ডাক্তার ও মানুষ হিসাবে প্রায়ই ভাবি, কোনটা ঠিক—অসুস্থ অবস্থায় আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-পরিবৃত হয়ে বাড়িতে থাকা, না হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের এক নির্জন ঘরে একলা-একলা দিন গোনা। যাই হোক, ছেলেবেলায় কিন্তু আমার কখনো-কখনো মনে হয়েছে যে, দাদাভাইয়ের ঘরে বড্ড বেশি লোক ভিড় করে থাকে, সকলেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং অতিরিক্ত গোলমাল হয়। তা ছাড়া প্রায়ই হঠাৎ-হঠাৎ যখন দাদাভাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হত তখন চারিদিকে খবর পাঠানো হত ও বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ত। মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধের কানের কাছে সমবেত কণ্ঠে ও সরবে নামকীর্তন শুনে আমি তো বেশ হকচকিয়ে যেতাম।

ডাক্তাররা যখন বুঝলেন যে, সে-যাত্রায় দাদাভাইয়ের রক্ষা পাবার আশা কম, তখন বাবাকে গৃহবন্দী অবস্থায় কলকাতায় এনে রাখবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হল। অনুসন্ধান করে সরকার যখন আশ্বস্ত হলেন যে, দাদাভাইয়ের জীবনসংশয় সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই, তখন তাঁরা বাবাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করলেন। বাবা উডবার্ন পার্কের বাড়তেই গৃহবন্দী হলেন, তবে তাঁকে এলগিন রোডের বাড়িতে যাওয়া-আসা করার অনুমতি দেওয়া হল। দিনের বেশির ভাগটাই বাবা এলগিন রোডের বাড়িতে দাদাভাইয়ের কাছে কাছে থাকতেন। দুই বাড়ির মধ্যে ব্যবধান তো খুবই কম, যাওয়া-আসা হেঁটেই করতেন। সেই সময় গোয়েন্দাদের কড়া পাহারা খুব নজরে পড়ত। মনে আছে, বাবা বা রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে যখনই আমরা হেঁটে এবাড়ি-ওবাড়ি করতাম, তাঁরা আমাদের রাস্তায় পুলিসের চর বা "টিকটিকি"দের চিনিয়ে দিতেন। তাদের হাবভাব ও আচরণে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে, ভাল করে নজর করলেই আন্দাজ করা যেত তারা কী জাতের লোক। পরে "টিকটিকি" চিনে নেবার ক্ষমতা নিজের জীবনে বেশ কাজ দিয়েছিল।

দাদাভাই মাঝে-মাঝে যখন খানিকটা সুস্থ বোধ করতেন, বাবাকে কাছে ডেকে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে অনেক মনের কথা বলতেন। একদিন খুব আবেগের সঙ্গে বাবাকে বলেছিলেন, "তুমিই বসু-বাড়ির মধ্যমণি এবং আমার বিশ্বাস, বংশের মর্যাদা তোমার হাতে অক্ষুণ্ণ থাকবে।" দাদাভাইয়ের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে বাবাকে একটা মর্মান্তিক কাজ করতে হয়েছিল। ডাক্তাররা যখন জবাব দিয়ে গেছেন এবং সকলেই দাদাভাইয়ের শেষ দিনের অপেক্ষায় রয়েছেন, বাবা এলগিন রোডের বাড়িতে শান্তভাবে বসে সরকারকে একটি চিঠি লিখলেন। লিখলেন যে, তাঁর বাবার জীবন তিলে-তিলে শেষ হয়ে আসছে, সরকার যেন আগে থেকেই তাঁকে পিতার শেষকৃত্য করবার জন্য এবং তাঁর শেষ-যাত্রায় অংশ গ্রহণ করবার অনুমতি দিয়ে রাখেন। কারণ, কখন কী হয় তা বলা যায় না। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে যে-কোনো সরকারি সিদ্ধান্তই সময়সাপেক্ষ। কী জানি কেন, বাবা ঐ চিঠির খানিকটা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন।

একেবারে শেষের দিকে ঠিক হল যে, দাদাভাইকে শেষ দেখার জন্য রাঙাকাকাবাবুকে ইউরোপ থেকে এরোপ্লেনে আনানো হবে। আমার মনে হয়, এটাই ছিল রাঙাকাকাবাবুর প্রথম এরোপ্লেন-যাত্রা। সেকালে রাত্রে এরোপ্লেন চলত না। গতিও ছিল আজকের তুলনায় খুবই মন্থর। ইউরোপ থেকে ভারতে আসতে দিন তিনেক লেগে যেত। অনেক চেষ্টা করেও রাঙাকাকাবাবু ঠিক সময়ে কলকাতায় পৌঁছতে পারলেন না—দেড় দিন দেরি হয়ে গেল।

এদিকে ইংরেজ সরকার তাদের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে। আমরা দল বেঁধেই দমদম বিমান-বন্দরে গিয়েছি। বিমানবন্দরটি তখন ছিল নেহাতই ছোট। এরোপ্লেনের হ্যাঙ্গার ছাড়া ঘরবাড়ি কিছু ছিল না। কিন্তু বন্দরের এলাকাটা বেশ বড়ই ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম, পুলিস চারিদিক থেকে বিমান-বন্দরটি ঘিরে ফেলেছে, কারুর ঢোকবার বা বেরোবার অনুমতি নেই। বেশ কিছুক্ষণ পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলল, কিন্তু কোনো রকমেই বিমানের কাছাকাছি আমরা যেতে পারলাম না। বিমান থেকে নামতেই রাঙাকাকাবাবুর উপর একটা কড়া আদেশ জারি হল। তাঁকে এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হবে, সেই অবস্থাতেই তাঁকে স্বর্গত পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হবে এবং তারপর আবার ইউরোপ পাড়ি দিতে হবে। পুলিসের গাড়িতে পাহারা সমেত

তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

এলগিন রোডের বাড়ির গাড়িবারান্দায় বাবার সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আবেগরুদ্ধ পুনর্মিলনের দৃশ্য আমার বেশ মনে আছে।

॥ ১৮ ॥

বড় একটা পরিবারের মাথার উপরে যিনি থাকেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলকে কেমন একসূত্রে বেঁধে রাখে, তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন আমাদের দাদাভাই জানকীনাথ। সব বড়-বড় পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা থাকে, বসু-বাড়িতেও ছিল। যেমন একদিকে এক বৈপ্লবিক ধারা ও ত্যাগধর্মী মানুষ, তেমনই অন্যদিকে গোঁড়া সংস্কারের ধারা ও পুরোপুরি সংসারধর্মী বিষয়ী মানুষ। এই দুই বিপরীত ধারার মধ্যে আবার বেশ কিছু পাঁচমেশালি লোক। যা একটা বড় পরিবারের বেলায় খাটে, দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও বোধহয় সেটা সত্য। দাদাভাই ছিলেন নানা রঙের ও নানা ধর্মের এই বসু-বাড়ির সমন্বয়ের প্রতীক। দেশ ও জাতিকে এক করে রাখার জন্যও এই ধরনের প্রতীকের প্রয়োজন হয়।

দাদাভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বসু-বাড়ির ইতিহাসের একট যুগ শেষ হয়ে গেল। যে-সব বাড়ির বড় ঐতিহ্য আছে, একটা জেনারেশনের অবলুপ্তির পর সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার কে বহন করবে এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এ-রকম ঘটনার পর বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটাকেই বড় করে দেখেন। বসু-বাড়িতেও স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু, সুখের বিষয়, ব্যাপারটার সুষ্ঠুভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে সমাধান হয়ে গিয়েছিল। আদর্শগত ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর উপর পড়ল, কারণ বসু-বাড়িতে তাঁরা দু'জনই দেশের ও দশের কাজে ব্রতী ছিলেন।

দাদাভাইয়ের তিন ভাইয়ের মধ্যে আমরা কেবল আর-একজনকেই দেখেছিলাম। দাদাভাই ছিলেন সবচেয়ে ছোট, তাঁর উপরেই ছিলেন সেজ-দাদাভাই দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন পণ্ডিত লোক। সারা জীবন শিক্ষকতা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অবসর নেওয়ার পর উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগানে থাকতেন। মা'র সঙ্গে অনেকবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি। তিনি দাদাভাইয়ের মতোই অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধার ভাব জাগত। শিক্ষক হিসাবে তাঁর নিজের পরিবারেও তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে একেবারে প্রথম পাঠ থেকে শুরু করে ইংরেজি সাহিত্যের উঁচু স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মা'র কাছে শুনেছি, আমাদের সেজ-দিদিমণি মাত্র অক্ষর-পরিচয় নিয়ে বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে শেকসপীয়র মিলটন আলোচনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ দাদাভাইয়ের মৃত্যুর বছর চারেক আগেই মারা যান।

আমাদের ছয় পিসির মধ্যে একজনকে তো আমি দেখিনি। ন-পিসিমা অল্পবয়সেই মারা যান। কিন্তু ন-পিসেমশাই সরোজেন্দ্রকুমার দত্ত ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসু-বাড়ির ঘনিষ্ঠতা চিরকাল বজায় ছিল। বড়-পিসিমা প্রমীলা অল্পবয়সেই বিধবা হন। বাবা প্রায়ই তাঁকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এনে রাখতেন। সেই সময় আমি প্রায়ই রাত্রে বড়পিসিমার হেফাজতে থাকতাম। রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হত না, অনেকক্ষণ বই পড়তেন—বেশির ভাগই

সুভাষের পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের
দিনে এই দু ছত্র লিখে দিলাম।
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৭ই পৌষ ১৩৪১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অটোগ্রাফ্

কিন্তু ইংরেজি বই। কথা বলবার জন্য নানা অজুহাতে আমাকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ইংরেজির জ্ঞান ও উচ্চারণ খুব ভাল ছিল এবং অনেক সময়ে ভাইপো-ভাইঝিদের ইংরেজি উচ্চারণ শুধরে দিতেন। বড়-পিসিমার হাতের নিরামিষ রান্না ছিল উৎকৃষ্ট, আমরা তো তাঁর হাতের রান্না খাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। পরে অনেক সময় ভেবেছি, এরকম সর্বগুণসম্পন্না মহিলাদের জীবন অকাল-বৈধব্যের ফলে আমাদের সমাজে কেমন যেন বিস্বাদ ও বিফল হয়ে যায়। পিসিমাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলতে পারি, তাঁদের স্বভাবের মাধুর্যই আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সেজ-পিসিমা তরুবালা ও নতুন-পিসিমা প্রতিভা তো খুবই কোমল স্বভাবের ছিলেন। ওরই মধ্যে মেজ-পিসিমা সরলা ও ছোট-পিসিমা কনকলতা ছিলেন একটু মেজাজি।

গভীর শোকের মধ্যে হলেও ১৯৩৪-এর শেষে বাবা ও রাঙাকাকাবাবু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও আলোচনার বেশ একটা ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। রাঙাকাকাবাবু প্রায় দু বছর ইউরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বাবাকে ওয়াকিবহাল করতে পেরেছিলেন। আমার মনে হয়, দুই ভাই তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনার অনেকটাই সেই সময় ছকে ফেলেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়ির তিনতলার উত্তরের একটি ঘরে মেঝেতে মুখোমুখি বসে দীর্ঘ আলোচনা করছেন। তারই ফাঁকে রাঙাকাকাবাবু একদিন আমাকে উপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমি কী করব জানতে চেয়েছিলেন। আমি কেবল এইটুকুই বলতে পেরেছিলাম যে, আর্টস না পড়ে সায়ান্স পড়াটাই আমি মোটামুটিভাবে ঠিক করেছি। সিদ্ধান্তটা ঠিক হয়েছিল বলে আমি আজ মনে করি না। সেই সময় সাহস করে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি বিশদ আলোচনা করতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হত।

দাদাভাই যেদিন রাত্রে মারা গেলেন, তার পরের দিনই ছিল আমার বার্ষিক পরীক্ষার দুটি পেপার। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন পরীক্ষা না দিলে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়ব কি না। দুটো পেপারে না বসেও আমি অপ্রত্যাশিতভাবে পরীক্ষায় বেশ ভাল করে ফেললাম।

দাদাভাইয়ের মৃত্যুর পর বসু-বাড়িতে পুরো এক মাস অশৌচ পালন করা হয়েছিল। আগেই বলেছি আমাদের বাড়িতে গোঁড়ামির একটা ধারা ছিল। আচার-অনুষ্ঠানের শেষ ছিল না। অনেকেই তথাকথিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে বেশ বাড়াবাড়িই করতেন। এটা তো সকলেরই জানা যে, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু দুজনেই, আপাতদৃষ্টিতে নয়, অন্তরের গভীরে ধার্মিক ছিলেন। অনেক অর্থহীন আচার সম্বন্ধেও তাঁরা একটা উদার মনোভাব দেখাতেন। আমার মনে হয়, তাঁরা কারও বিশ্বাসে বা শ্রদ্ধায় অযথা আঘাত দিতে চাইতেন না। দাদাভাইয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বেশ বড় করেই হয়েছিল। সাত ছেলের দানসামগ্রীর সাতটা সেট দেখে আমি তো বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। গো-দানের জন্য গোরু-বাছুরও প্যাণ্ডেলের বাইরে হাজির ছিল। তবে যখন কানাঘুষো শুনলাম যে, শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই গেটের বাইরে দানসামগ্রী নিয়ে পুরোহিতদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের চুক্তি হয়ে গেছে, তখন ঐ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জোর ঘা খেল। গোরু-বাছুরের অধিকারী তো মূল্য আদায় করে তার পোষ্য নিয়ে বাড়ি গেল।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের এক দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলিনি। একদল ব্রাহ্মণ এসেছেন বসু-বাড়ির দায় উদ্ধার করতে। খেতে বসেছেন ছাদে। খাবার পরিবেশনকারীরা হিমসিম খাচ্ছেন—এত তাড়াতাড়ি সব উধাও হচ্ছে। দেখি বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণের পাঞ্জাবির ভিতরে বেশ বড় গোছের ঝোলা। খানিকটা খাচ্ছেন, আর বেশ খানিকটা ঝোলাতে ফেলছেন।

অন্যদিকে বাবা ও রাঙাকাকাবাবু অন্য ধরনের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েকজন পণ্ডিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ বন্ধু এসেছেন খেতে। তাঁদের জন্য ব্যবস্থা আলাদা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার বোন গীতার অটোগ্রাফের খাতায় তিনি ঐ উপলক্ষে দু লাইন লিখে রেখে গেলেন।

॥ ১৯ ॥

বাবা জব্বলপুরে বন্দী থাকার সময় একবার মা আমাদের মামার বাড়িতে রেখে মামাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমরা তো বয়সে তখন খুবই ছোট, বাবাকে দেখতে যেতে না পারলে আমাদের মন বেশ খারাপ হত। কথাটা শুনে বাবা সেন্সরের চোখ এড়িয়ে আমাদের নামে একখানা সুন্দর চিঠি মার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটির কথা আমার বেশ মনে আছে—ইংরেজিতে লেখা, শুরু করেছিলেন 'মাই চিলড্রেন' দিয়ে। চিঠিটি ছিল আবেগে ভরা। আমাদের মন প্রফুল্ল রাখতে বলে তিনি লিখেছিলেন যে, বিধির নিয়ম সব সময়ে আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিধাতা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। এই সূত্রে বলি, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু দুজনেই বিধাতাকে মাতৃরূপে দেখতেন। বাবার চিঠিপত্রে সেজন্য পদে-পদে 'ডিভাইন মাদার'-এর উল্লেখ থাকত। ঐ চিঠিতে বাবা আরও বলেছিলেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত নির্যাতনভোগের মধ্যে নিশ্চয়ই দেশ ও দেশবাসীর কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেদিন তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন তিনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। আমরা তখন জানতাম না যে তিরিশের দশকের প্রথম

জেলবাসের চেয়ে আরও কঠিন পরীক্ষা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভারতে বাবার সুদীর্ঘ বন্দী-দশা তাঁর মন ভাঙতে না পারলেও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়েছিল।

রাঙাকাকাবাবুর জেল-জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তো আগে কিছু লিখেছি। বাবা বন্দী-জীবন কেমন কাটাতেন তার একটা ধারণা দেবার জন্য জব্বলপুর জেল থেকে মা'র কাছে লেখা একখানা চিঠি থেকে খানিকটা পড়ে শোনাই।

"...তুমি আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। আমি একলা আছি বটে, কিন্তু সত্য বলছি মন ভাঙেনি এবং আশা করি ভগবানের কৃপায় মন ভাঙিবে না। অবশ্য সুভাষ যখন ছিল তখন নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময় কাটিত ; এখন সে সুযোগ নাই। তবে পড়াশুনা করিয়া সময় একরকম কাটিয়া যাইতেছে ; এবং সেই জন্য আরও কিছু বইয়ের জন্য তোমাকে লিখেছি। কতক বই সুভাষ লইয়া গিয়াছে। সে বেচারার আরও কষ্ট হইবে, বিশেষত যখন শরীর অসুস্থ। তবে ভগবান তাহাকে বাল্যাবস্থা থেকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং বন্দীজীবনে সে একরকম অভ্যস্ত। সুভাষ ফিরে আসতে বোধহয় আরও তিন সপ্তাহ ; ততদিন পড়াশুনা লইয়া সময় কাটাইয়া দিব। মনে যে নানারকম চিন্তা আসে না একথা বলা মিথ্যা হবে ; কিন্তু তোমরা যদি সুস্থ শরীরে থাক ও মনের জোর করিয়া থাক তাহলে আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব। আমি শরীরের প্রতি খুব যত্ন করি এবং রান্নার সম্বন্ধে নিজে ব্যবস্থা করি এবং কী রকম করে রাঁধতে হবে তাহাও মাঝে মাঝে বলিয়া দি। দেখছ ত দরকার হলে এসবও করিতে পারি। যখন পড়াশুনা করিতে ভাল লাগে না, তখন কয়েদিদের সঙ্গে তাহাদের চুরি-ডাকাতির গল্প জুড়িয়া দি!..."

১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি বাবা মুক্তি পান। রাঙাকাকাবাবু তখন ইউরোপে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি ইউরোপের নানা দেশে যে কাজ করেছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। মা'র কাছে ও বাড়ির বন্ধুবান্ধবদের কাছে রাঙাকাকাবাবু নিয়মিত চিঠি লিখতেন, তাছাড়া দেশের খবরের কাগজে যতটা সম্ভব তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে খবর ছাপাবার চেষ্টা করা হত। অন্য দেশের পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে যা বেরোত, তিনি প্রায়ই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। আমরা সকলেই এই সব সূত্রে তাঁর খবর পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। তাছাড়া তিরিশের দশকে ইউরোপ প্রবাসের সময় তিনি তাঁর বই 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০—৩৪' লেখেন। বইটি সহজ ও স্বচ্ছ ইংরেজিতে লেখা। সেজন্য স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও বইটি পড়তে পারে। বই লেখবার জন্য নানারকম তথ্য ও উপাদান রাঙাকাকাবাবু চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে সেগুলি তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তবে প্রবাসে যথেষ্ট বই বা কাগজপত্র তিনি পাননি, সেজন্য বেশির ভাগটাই তাঁকে মন থেকে লিখতে হয়েছিল। দাদাভাইকে শেষ দেখা দেখতে দেশে আসার সময় তিনি তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপির একটা কপি সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু দেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র করাচিতে পুলিস সেটা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। বইটি পরের বছরের গোড়ায় লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কালক্ষেপ না করে ব্রিটিশ সরকার সেটা ভারতে নিষিদ্ধ করে দেয়। এই বই লেখার সূত্রেই রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে পরবর্তীকালে আমাদের কাকিমা শ্রীমতী এমিলি শেঙ্কেলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। তাছাড়া ভিয়েনা ও ইউরোপের অন্যত্র বেশ কয়েকটি সম্ভ্রান্ত, বিদগ্ধ ও ভারতপ্রেমী পরিবারের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর গভীর বন্ধুত্ব

Best wishes for a very happy Xmas and a happy new Year to follow from

SUBHAS CHANDRA BOSE

1. WOODBURN PARK
CALCUTTA

Dec 1935

রাঙাকাকাবাবুর কার্ড (ইউরোপে ব্যবহৃত)

হয়। তাঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত বসু-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার ও শ্রীমতী ফেতার, রেনি ও হেডি ফুলপমিলার, আলেকজাণ্ডার ও কিটি কুরতি ও আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রীমতী উড্‌স।এদেশ থেকে কেউ কিছু দেবার আগেই শ্রীমতী ফেতার ও শ্রীমতী ফুলপ-মিলার বহু চিঠি, কাগজপত্র ও ছবি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতী কুরতি তো নেতাজী সম্বন্ধে একটি ছোট কিন্তু মূল্যবান বই-ই লিখেছেন।

বহুদিন ধরে পরাধীন থাকবার একটা বড় কুফল হচ্ছে যে, দাসত্বের মানসিকতা জাতিকে পেয়ে বসে। আমরা ছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ। ইংরেজের চোখ দিয়ে সারা জগৎকে দেখতে আমাদের শেখানো হয়েছিল। আর বাইরের জগৎ বলতে আমরা বুঝতাম ইংল্যাণ্ড। প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে রাঙাকাকাবাবুই প্রথম ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে নিজের চোখ দিয়ে ও মুক্ত মনে জগৎকে বিচার করতে শুরু করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পক্ষে ইউরোপের নানা দেশে সরাসরি প্রচার আরম্ভ করেন। ইংল্যাণ্ড যে ইউরোপ নয়, এবং মধ্য ইউরোপের সঙ্গে যে আমাদের একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে, সেটা রাঙাকাকাবাবুই প্রথম আমাদের বোঝাতে আরম্ভ করেন। এখন দেখছি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা বরং সহজ, কিন্তু ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করা শক্ত ও সময়-সাপেক্ষ। আজও দাস-সুলভ মনোভাব আমাদের কাটেনি, কোন্ বিদেশী ও বিজাতীয় মতাদর্শ আমাদের পক্ষে ভাল, এই নিয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় নামি। তিরিশের দশকেই ইউরোপ থেকে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীতে মানবসমাজ পুনর্গঠনের নতুন ভাব, নতুন আদর্শ ও নতুন পরিকল্পনা ভারতের মাটিতেই জন্ম নেবে।

বছর দুয়েক নানারকম চিকিৎসার পর শেষ পর্যন্ত ভিয়েনার ডাক্তাররা রাঙাকাকাবাবুর উপর অস্ত্রোপচারের সিধান্ত নিলেন। পিত্তকোষ বা গলব্লাডার বিকল হয়ে যাওয়াই তাঁর সব অসুখের মূল কারণ বলে সাব্যস্ত হল। ভিয়েনার বিখ্যাত সার্জেন প্রোফেসর ডেমেল অপারেশন করেন। পরে রাঙাকাকাবাবুর কাছে শুনেছি তাঁর এক অদ্ভুত শখের কথা। তিনি বলে বসলেন যে, তিনি নিজের অপারেশন দেখবেন। সুতরাং লোকাল অ্যানেস্‌থিসিয়া দিয়ে যেন কাটাকুটি করা হয়। কিন্তু অপারেশন শুরু করবার পর এত অসহ্য ব্যথা হতে থাকে যে, ডাক্তাররা তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করতে বাধ্য হন।

সেকালে অজ্ঞান করে বড় অপারেশন করা আজকালকার মতো নিরাপদ ছিল না। সেজন্য, যদি কোনো বিভ্রাট হয় এই মনে করে রোগীকে বলা হত, শেষ ইচ্ছা বা উইলের আকারে কিছু লিখে রাখতে। রাঙাকাকাবাবু প্রোফেসর ডেমেলের হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বলেন, তিনি যেন সেটা তাঁর ভারপ্রাপ্ত এটর্নি নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। রাঙাকাকাবাবু ইংরেজিতে দু লাইন লিখেছিলেন যার মর্মার্থ হল :

"আমার যা কিছু সম্পদ তা রইল আমার দেশবাসীর জন্য ; আমার যা কিছু দায় আছে, আমি আমার মেজ দাদাকে দিয়ে গেলাম।"

॥ ২০ ॥

জেলে থাকতেই বাবা তখনকার কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর তাঁর মুক্তির দাবি করে, অন্ততপক্ষে তাঁর সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে যোগদানের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য, বিরোধী পক্ষ অনেক শোরগোল করলেন। কিন্তু সরকারের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। বাবার অ্যাসেমব্লির আসনটি খালিই পড়ে রইল।

এক দুপুরে যখন বাবার মুক্তির আদেশ এল তখন আমি স্কুলে। মনে আছে, খবরটা পেয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি সারা পথটা দৌড়ে এসেছিলাম। বাবা জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন দেশের পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। বাংলা দেশে কংগ্রেসের তখন একজন বিশিষ্ট নেতার প্রয়োজন। দুই প্রধান নেতার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে থাকতেই মারা গেছেন। রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে, কবে ফিরবেন খুবই অনিশ্চিত। বাংলার কংগ্রেসের বেশির ভাগ দল ও উপদল বাবাকেই চাইলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সবেমাত্র ভারতের জন্য এক নতুন সংবিধান—গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫—পাস করেছে। জাতীয়তাবাদীরা বুঝলেন যে, বড় একটা চ্যালেঞ্জ এগিয়ে আসছে। বিশেষ করে বাংলা দেশের পরিস্থিতিটা ছিল খুবই জটিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের শাসকেরা যে ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা ছিল ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বলে যে ফরমুলাটি তাঁরা বাংলা দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন তার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমে আরও তিক্ত হয়ে উঠল এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ভাল করে লড়তে হলে কংগ্রেসে তখন একজন শক্তিমান পুরুষের দরকার ছিল।

অন্যদিকে বাবা ফিরেছেন খবর বেরোতেই হাইকোর্টে একটা প্রচণ্ড শোরগোল পড়ে গেল। মক্কেলরা ব্রীফের স্তূপ মাথায় করে উডবার্ন পার্কে ভিড় করলেন। খবরের কাগজে বেরোল, মিঃ বোস ফ্লাডেড উইথ ব্রীফস্।

১৯৩৫-এর শেষে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে প্রথম বিয়ে লাগল। আমার দিদি মীরার সম্বন্ধ মোটামুটি ঠিক করে বাবা সোজা এলগিন রোডের বাড়িতে মাজননীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বাবাকে দেখেই মাজননী বললেন যে, তিনি সবেমাত্র স্বপ্নে দেখেছেন যে দাদাভাই গায়ের চাদর ও লাঠি নিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করতে দাদাভাই বললেন—অবশ্যই স্বপ্নে—যে তিনি মীরাবাঈয়ের জন্য বর দেখতে যাচ্ছেন। বাবা আশ্চর্য হয়ে মাজননীকে জানালেন, তিনি তো বর দেখেই সোজা তাঁর কাছে এসেছেন। শুনে মাজননী বাবাকে বললেন ঐ সম্বন্ধটাই পাকাপাকি করে ফেলতে। পরে আমাদের বড় ভগ্নীপতিকে অনেকেই 'স্বপ্নে পাওয়া জামাই' বলে অভিহিত করতেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাবা কিছু আধুনিকতা আনতে চাইলেন। বললেন, ভিয়েন বসিয়ে পাত পেড়ে খাওয়ানোটা সংক্ষেপে করতে হবে। তার বদলে টী-পার্টি হবে। এই প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে আপত্তি তুললেন—যেন শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে! যা-ই হোক, বাবা নিজের মতে অবিচল রইলেন। তবে কার্যত বাবার পাত পেড়ে খাওয়ানো ও টী-পার্টি দুটোই খুব বড় করে হল। টী-পার্টি থেকে বসু-বাড়ির মহিলা-মহলের অনেকে দূরে সরে রইলেন।

১৯৩৬ সালে বাবার উপর কংগ্রেসের কাজের চাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল। রাঙাকাকাবাবুর অনুপস্থিতিতে বাবাই বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেই বছরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হবে লখনৌতে—সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সময় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীর রাজনীতি দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে এবং সাধারণভাবে বলা যায় জওহরলাল, রাঙাকাকাবাবু ও বাবা এক পথের যাত্রী। রাঙাকাকাবাবু ঠিক করলেন যে, তিনি লখনৌতে কংগ্রেসে যোগ দেবেন এবং মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেশে ফিরে আসবেন। খবরটা প্রচার হয়ে যাওয়া মাত্র রাঙাকাকাবাবু ভিয়েনার ইংরেজ কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাছ থেকে এই চিঠি পেলেন:

12th March 1936

I have today received instructions from the Secretary of State for Foreign Affairs to communicate to you a warning that the Government of India have seen in the press statements that you propose to return to India this month and the Government of India desire to make it clear to you that should you do so you cannot expect to remain at liberty.

J. W. Taylor
His Majesty's Consul

যেমন কথা তেমন কাজ। রাঙাকাকাবাবু সরকারের হুমকি উপেক্ষা করে এপ্রিলের গোড়ায় বোম্বাই বন্দরে পৌঁছনো মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

কংগ্রেসের সভাপতির কাজ তুলে নেবার পর ১৯৩৬-৩৭ সালে বেশ কয়েকবার পণ্ডিত

জওহরলাল কলকাতায় সফরে আসেন। বাবার আমন্ত্রণে তিনি আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে উঠতেন। তিনি একতলার যে ঘরে থাকতেন সেটার নামই হয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতজির ঘর—পণ্ডিতজিকা কামরা। তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ আকর্ষণ ছিল—আমরা তো তাঁকে দেখবার জন্য তাঁর ঘরের আনাচে-কানাচে ক্রমাগতই ঘোরাফেরা করতাম। তাঁর জীবনযাত্রার ধারাটা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু সব দিক দিয়েই ফিটফাট ও নিয়মমাফিক। তাঁর অতিবিনয়ী ও সদাহাস্যময় সেক্রেটারি উপাধ্যায়জি একটি বিশেষ কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই ভোরে পণ্ডিতজির ঘরে নিয়ে যেতেন। বাথরুমে জল গরম করবার গ্যাসের যন্ত্রটি আমাকে চালু করে দিতে হত। কী জানি কেন, পণ্ডিতজি হেসে বলতেন, ও কাজটা বড়ই গোলমেলে, আমি পারি না। সেই সময় প্রায়ই দেখতাম, পণ্ডিতজি মেজেতে একটি চাদর পেতে ব্যায়াম করছেন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতজি খুবই হিসেবি ছিলেন। বিদেশী ও দেশী দুরকম রান্নাই টেবিলে তাঁর জন্য দেওয়া হত। তিনি কিন্তু খুব বেছে অল্প খেতেন, গুরুপাক খাদ্য মোটেই খেতেন না। মনে পড়ে, খাবার পর তাঁকে ফলমিষ্টি দেওয়া হয়েছে। আপেলটা বা সন্দেশটা ছুরি দিয়ে আধখানা করে অর্ধেকটা নিয়ে মুচকি হেসে বাকিটা আমাদের কারুর দিকে ঠেলে দিয়ে বলতেন, 'উইল ইউ হ্যাভ দি আদার হাফ ?' সারাদিন খাটাখাটুনির পর রাত্রের খাওয়াটা তিনি খুবই হালকা রাখতেন—স্ক্র্যাম্‌বেলড ডিম ও কফি। হয়তো বাইরের কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পদ রান্নাও হয়েছে, সব দেখেশুনে হাসতে হাসতে বাবার দিকে চেয়ে বলতেন, 'শরৎ বোসের ডিনার ইজ্ এ ন্যুস্যান্স, ইট নেভার এনড্‌স্।' সিগারেট খেতেন গুনে গুনে। খাবার পর দুটি-একটি। মনে আছে, বাবা আমাকে পণ্ডিতজির জন্য ভাল বিলিতি সিগারেট—ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট কিনতে দিয়েছেন—অতিথি-সৎকারে কোনো বাধা নেই। বহুদিন পরে ১৯৬০-এ দিল্লিতে পণ্ডিতজির সঙ্গে কাজে দেখা করতে গিয়েছি, দেখি একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন। বললাম, আপনি এত সিগারেট খাচ্ছেন কেন। আগে তো খেতেন না ! উত্তরে বললেন, শুনেছি সুভাষ তো যুদ্ধের সময় চেন-স্মোকিং করত, তাই না ? আমি সায় দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সিগারেট চলে নাকি ?' আমতা-আমতা করে বললাম, 'মাঝে মাঝে চলে।' 'তাহলে চলুক না একটা—' বলে আমাকে একটা সিগারেট খাওয়ালেন। আরও বললেন, 'বোধহয় নানারকম স্ট্রেনের জন্য সিগারেট খাই, সুভাষও বোধহয় তাই করত।'

জওহরলালকে দেখবার জন্য উডবার্ন পার্কে কী ভিড়ই না হত ! কংগ্রেসীদের ভিড় তো আছেই, তার উপর সব স্তরের সব বয়সের মানুষ ভেঙে পড়ত। তিনি ভিড় সামলাতে ভালই পারতেন, কিন্তু কখনও কখনও ধৈর্য হারাতেন ও রেগে যেতেন। দুটি জিনিস তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এক, দু'মিনিটের কাজ আছে বলে কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট করা। দুই, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা।

যখন কংগ্রেসের প্রচারে তিনি বেরোতেন, সারাদিনে প্রায়ই আঠারো-বিশটা সভায় বক্তৃতা করতেন। বাবা ও জওহরলালকে এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছি। পণ্ডিতজির গলায় জোর ছিল কম, মাইক না হলে চলত না। মিটিং করতে যাবার সময় গাড়িতে তাঁর জন্য ফ্লাস্কে ভরে গরম জল দেওয়া হত। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে তিনি জলে চুমুক দিতেন।

॥ ২১ ॥

রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে খেতে বসেছি কার্শিয়ঙে আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে। কালু সিং ইউরোপীয় ধাঁচের খাবার দিচ্ছে, প্রথমেই সূপ। আমরা তো সূপের বাটিটা উল্টো দিকে কাত করে নিয়ে চামচে করে সূপ খেতে অভ্যস্ত। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু সূপের বাটিটা নিজের দিকে কাত করে খাচ্ছেন। বললেন, "তোমরা বাটিটা উল্টো দিকে কাত করে খাচ্ছ কেন?" ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি। মুচকি হেসে বললেন, "তোমরা যেমন করে খাচ্ছ সেটা তো ইংরেজি কায়দা, ইউরোপের অন্যান্য দেশে কিন্তু আমি যেমন করে খাচ্ছি তেমনি করে খায়।"

আমরা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আচার-ব্যবহারে, অভ্যাসে ও রুচিতে, ইংরেজদের অন্ধ অনুসরণ করি, সেটা রাঙাকাকাবাবু সুস্থ ও মুক্ত মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করতেন না। অনেক দিনের দাসত্বের ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিই। ছোটখাটো দৃষ্টান্ত দিয়ে রাঙাকাকাবাবু আমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন যে, সব বিষয়ে ইংরেজদের অনুকরণের স্পৃহা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ইউরোপে থাকার ফলে রাঙাকাকাবাবু মধ্য ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মানদের, কৃষ্টি, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদির দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া মধ্য ইউরোপের ভারতপ্রেমী বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বুঝেছিলেন যে, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সমানে-সমানে হতে পারে। কারণ সেখানে প্রভু-প্রজার সম্পর্কের লেশমাত্র নেই। জার্মান পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদরা বহুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অপর পক্ষে ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিলেন মূলত ব্যবসা করতে এবং শেষ পর্যন্ত রাজা হয়ে বসেছিলেন। দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক।

আমি যে-সময়ের কথা বলছি তখন রাঙাকাকাবাবু কার্শিয়ঙে আমাদের বাড়িতে বন্দী হয়ে রয়েছেন, এবং আমি ও আমার দাদা অমিয়নাথ সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে গরমের ছুটি কাটাচ্ছি। বছর দুয়েক আগে বাবা নিজের বাড়িতে বন্দী-জীবন কাটিয়ে গেছেন। রাঙাকাকাবাবুর ওপরও শর্ত ও বিধিনিষেধ ঠিক একই রকম ছিল। দেখা করা বা কথা বলা কারুর সঙ্গেই চলবে না। পুলিস-পাহারা বেশ কড়া। হিলকার্ট রোডে একমাইল উপর দিকে ও একমাইল নীচের দিকে বেড়াতে পারতেন, পেছন-পেছন বন্দুকধারী পুলিস তাঁকে অনুসরণ করত। আমাদের তো কোনো কাজ নেই, কেবল রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া ও গল্প করা। তবে আমি তখনও পর্যন্ত কথা বলতাম খুব কম, সেজন্য রাঙাকাকাবাবু আমাকে 'সাইলেন্ট বয়' আখ্যা দিয়েছিলেন।

'সাইলেন্ট' হবার যেমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, তেমনি সুবিধাও আছে। কথাবার্তা কম বললে পারিবারিক দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হয়। তবে চুপচাপ থেকেও যদি চোখ কান ও মন খুলে রাখা যায়, এবং একাগ্র হয়ে সব-কিছু বিচার করা যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত লাভ বই লোকসান হয় না। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমি তো অনেকদিন খোলাখুলি বাক্যালাপ করতে পারতাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আমি এত অকপটে কথাবার্তা বলেছি যে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে

গেছি। কথাবার্তা কম বলার আর একটা বড় লাভ হচ্ছে গভীর চিন্তার অবকাশ পাওয়া। অনেক বড় হবার পরেও এবং হাজার কাজের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেন। গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে থাকতে দেখেছি তিনি কেমন টুকরো-টুকরো কাগজে কথার জবাব লিখে লিখে দিচ্ছেন—তা প্রশ্নকর্তা যিনিই হোন না কেন। মনে আছে বাড়িতে একদিন চায়ের আসরে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বাবাও আছেন। কেউ বললেন ব্যারিস্টারি করা আমার দ্বারা হবে না, কারণ আমি বড়ই 'কুনো', মুখে তো কথাই ফোটে না। বাবা কিন্তু বললেন, ওর আইনব্যবসার 'গুরুজি' স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ছেলেবেলায় নাকি খুবই লাজুক ছিলেন, এবং কথাবার্তায় পটু ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত বড় ব্যারিস্টার হয়েছিলেন।

গল ব্লাডার অপারেশনের পর বেশ কিছুদিন হজমের দিক থেকে অসুবিধা থাকে। পরে নিজের একই অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সেটা ভাল করে বুঝতে পারি। রাঙাকাকাবাবুকে সেজন্য ১৯৩৬ সালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকতে হত। কালু সিং খুব সাদাসিধে ইউরোপীয় ধরনের খাবার তৈরি করে দিত। উপায় নেই তো, সে অন্য কথা—কিন্তু আমার মনে হয়, রাঙাকাকাবাবুর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হত। কারণ, মুখরোচক সুস্বাদু খাবার তিনি খুব উপভোগ করতেন, এবং দেখেছি, সময়-সময় অতিরিক্ত পরিমাণ খেয়ে ফেলতেন। খেয়ে হাঁসফাঁস করতেন আর বলতেন, "ও খাবারগুলো পেটের মধ্যে দমে বসে আছে!" কড়াইশুঁটির কচুরি, শিঙাড়া, চিকেন কাটলেট ইত্যাদি সামনে দেখলে তাঁর মুখে বেশ আনন্দের ভাব ফুটে উঠত।

১৯৩৭ সালে পুজোর সময় বাবা, রাঙাকাকাবাবু ও আমরা ভাইবোনেরা প্রায় সকলে কার্শিয়ঙে একসঙ্গে ছিলাম। তখন যেন দুই ভাইয়ে খাওয়ার কম্পিটিশন। বাবার মিষ্টি কম খাওয়ার কথা, কিন্তু মিষ্টি তিনি খাবেনই। রাঙাকাকাবাবুর গুরুপাক ভাজা মুখরোচক জিনিস খেলে অসুবিধা হয়, কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। বাজারের মুখরোচক খাবারও তিনি সুযোগ পেলেই খেতেন। ১৯৩৭-এর এপ্রিলে মুক্তি পাবার পর এলগিন রোডের বাড়িতে তিনি দাদাভাইয়ের ঘরে থাকতেন। সেই ঘরটি বর্তমানে 'নেতাজী ভবনে' নেতাজীর ঘর বলে পরিচিত। ঠিক পাশের ঘরেই থাকতেন মাজননী। দুপুরবেলা সামনের রাস্তা দিয়ে 'হট প্যাটিস' ফেরি করে যেত। বাড়ির সামনে প্যাটি কিনলে তো মাজননী দেখে ফেলতে পারেন। সুতরাং রাঙাকাকাবাবু পাশের গলিতে ফেরিওয়ালাকে বসিয়ে চুপিসারে প্যাটি কিনিয়ে আনতেন ও ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করে খেতেন।

বন্দী অবস্থায় কার্শিয়ঙে রাঙাকাকাবাবুর সকাল-সন্ধে বেড়ানো চাই। জুন মাস, বর্ষা নেমে গিয়েছে। পাহাড়ের বৃষ্টি কি ছাতা বর্ষাতির বাধা মানে? তা ছাড়া হিলকার্ট রোডে তো নদীর স্রোতের মতো জল বয়ে চলেছে। তাতে কী? বেড়াতে বেরোতেই হবে। আর বেড়াতে বেড়াতে কত গল্প! ছেলেবেলার গল্প, পারিবারিক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা, নানা লোকের চরিত্র বিশ্লেষণ, দেশের কথা, বিশ্বরাজনীতির কথা ইত্যাদি। খানিকটা দুঃখের সুরে হয়তো বললেন, "জানো, আমি যখন ছোট ছিলাম, প্রায় সকলেই বলত, আরে ওটা একটা বদ্ধ পাগল, জীবনে ওর কিছুই হবে না।" আমি মনে-মনে ভাবতাম, কথাটা তো পুরোপুরি ভুল নয়, পাগলামির তো চূড়ান্ত দেখছি, আর সাধারণ মানুষে যাকে 'কিছু হওয়া'

বলে তা তো সুভাষচন্দ্রের কিছুই হয়নি। অসাধারণত্ব ও পাগলামির ব্যবধান বোধহয় অল্পই।

॥ ২২ ॥

এটা তো সকলেই জানেন যে, প্রথম জীবনে রাঙাকাকাবাবু সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্বে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং এক সময়ে ভেবেছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন কিনা। ১৯৩৬-এ কার্শিয়ঙে পারিবারিক নানা সমস্যা বা পরিবারের বিভিন্ন লোকের বা ছেলেমেয়েদের আচার-ব্যবহার, লেখাপড়া, কেরিয়ার ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠত। তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যেত যে, তিনি প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনের ধারা ও আচরণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। এমন কী আমাদের জেনারেশনের যে-কোনো ছেলে বা মেয়ের স্বভাব-চরিত্রের ও আচরণের বেশ একটা ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারতেন। কার চরিত্রের কোন দিকটা সবল, কোন দিকটা দুর্বল, এসব বিষয়ে তাঁর নিজের একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল। নিজের জেনারেশনের লোকেদের সম্বন্ধে তিনি আমাদের সামনে আলোচনা করতেন কম, কিন্তু আমার ধারণা সেক্ষেত্রেও তাঁর মতামত খুব পরিষ্কার ছিল। তিনি তো অন্যদের মতো সংসারে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু পারিবারিক কোনো সমস্যা বা কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কথা উঠলে তিনি একটা কথা বারবার আমাদের বলতেন, সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে "উদার হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।" তিনি আমাদের বোঝাতে চাইতেন যে, ছোটখাটো, অপ্রিয় বা হিংসাপ্রসূত যা-কিছু আছে সেগুলি উদার মনোভাব নিয়ে উপেক্ষা করতে না পারলে সাংসারিক বা সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে বাধ্য।

ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে, ভিন্নভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলে বিশ্ব-রাজনীতির ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবুর বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। এ-ব্যাপারে আমাদের অধিকাংশ নেতার অনীহা ও অজ্ঞতা তাঁকে পীড়া দিত। একদিকে তখন তো জাপান ছাড়া এশিয়ার ও আফ্রিকার প্রায় সব দেশই ছিল পরাধীন। অন্য দিকে আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে নিস্পৃহ। সেজন্য ইউরোপীয় রাজনীতি ভাল করে না বুঝলে বিশ্বরাজনীতির রূপ ও গতি বোঝা সম্ভব ছিল না। আমাদের লড়াই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কোন্ কোন্ নতুন শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ বা খর্ব করতে পারে, এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হতে পারে এ-বিষয়ে রাঙাকাকাবাবু গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁর চিন্তাধারা দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের থেকে পৃথক ছিল, ফলে তাঁর কাজের ধারাও অন্য স্রোতে বইত। আদর্শবাদ ও ব্যবহারিক রাজনীতির বেশ একটা সমন্বয় তিনি করতে পেরেছিলেন। আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা তাঁর লেখা ও কর্মজীবন থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

রাঙাকাকাবাবুর কথাবার্তা থেকে মনে হত না যে, তাঁর ছেলেবেলাটা শান্তিপূর্ণ ছিল। ইস্কুল-কলেজ যাওয়া-আসা করা, পরীক্ষা পাস করা, বৃত্তি পাওয়া গতানুগতিক এসব নিশ্চয়

ছিল, কিন্তু তাঁর ভিতরে নিজের বিবেকের সঙ্গে ও বাইরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করতে-করতে তিনি বড় হয়েছিলেন। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই হয়। আমাদের দেশের অন্য অনেক নেতার ক্ষেত্রে দেখেছি, পরিণত বয়সে বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার ফলে অথবা হঠাৎ বিশেষ কারুর ডাকে সংগ্রামের পথে চলে আসেন। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু ছিলেন সত্যই আজীবন সংগ্রামী। এ-কথাটি আমি প্রথম বুঝি ১৯৩৬ সালে কার্শিয়ঙে আঁকাবাঁকা পথে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে।

১৯৩৬-এর শেষের দিকে সরকার রাঙাকাকাবাবুকে কলকাতায় নিয়ে এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেয়। তাঁর শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। তাছাড়া শীতের সময় কার্শিয়ঙে থাকাটা খুব সুখেরও নয়। মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন সময়ে কত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী বা বিপ্লবী যে বন্দী হয়ে থেকেছেন, তার ইয়ত্তা নেই, এর একটা হিসেব নিলে হয়। পরে ১৯৪২-এ আন্দোলনের সময় আমার নিজেরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ১৯৩৬-এ আমরা দল বেঁধে সরকারের অনুমতি নিয়ে মেডিকেল কলেজে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাবা তখন নতুন সাধারণ নির্বাচনের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। বেশ বোঝা যেত, রাঙাকাকাবাবু বাবার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য ছটফট করতেন, নানাভাবে বাবার কাছে নির্বাচনের প্রচার সম্বন্ধে বা কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন সম্বন্ধে নিজের মতামত পাঠিয়ে দিতেন।

মাজননীর শরীর তখন ভাল নয়, নিয়মিত মেডিকেল কলেজে গিয়ে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পরে সরকার রাঙাকাকাবাবুকে পুলিস পাহারায় এলগিন রোডের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে আসত, আবার ফেরত নিয়ে যেত। তাঁকে দেখবার জন্য সেই সময় বাড়িতে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের বেশ ভিড় হত।

১৯৩৬-এ ইউরোপ থেকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এক অতিথি এলেন, রাঙাকাকাবাবুরই আমন্ত্রণে। ভিয়েনার শ্রীমতী হেডি ফুলপ-মিলার। রাঙাকাকাবাবু ভিয়েনাতে থাকার সময় শ্রীমতী ফুলপ-মিলার তাঁকে খুবই দেখাশুনো করেছিলেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের দর্শন, কলা ও কৃষ্টির প্রতি তাঁর টান ছিল গভীর। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনিও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে যেতেন। শ্রীমতী ইউরোপীয় অপেরা সঙ্গীতে পারদর্শিনী ছিলেন এবং কলকাতার রেডিওতে তিনি গানও গেয়েছিলেন। সমঝদারেরা তখন বলেছিলেন, অত উঁচু মানের ইউরোপীয় সঙ্গীত তখনও পর্যন্ত কলকাতার রেডিও স্টেশন থেকে কমই প্রচারিত হয়েছে। আমাদের বাড়িতে অতিথি থাকার ফলে শ্রীমতী ফুলপ-মিলারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাড়ির সব ছেলেমেয়েকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি চিরকাল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং ইউরোপে পরে আমাদের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।

১৯৩৭ সালে এপ্রিলে রাঙাকাকাবাবু মুক্তি পেলেন। মুক্তির পর স্বাস্থ্যের জন্য তিনি কিছুদিন ড্যালহাউসি পাহাড়ে ধরমবীর-দম্পতির সঙ্গে কাটিয়ে আসেন। ছাত্রজীবনে, ১৯২০-২১ সালে, ইংল্যাণ্ডে ডাক্তার ও শ্রীমতী ধরমবীরের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর পরিচয় হয়। শ্রীমতী ধরমবীর ছিলেন ইংল্যাণ্ডবাসী রাশিয়ান মহিলা। তাঁর মাতৃসুলভ ব্যবহার ও

চরিত্রের মাধুর্যে রাঙাকাকাবাবু যে শুধু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয় ; দিলীপকুমার রায়ের মুখে শুনেছি, শ্রীমতী ধরমবীরকে দেখার পর ইউরোপীয় মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও মতামতের পরিবর্তন ঘটে। এর আগে রাঙাকাকাবাবুরই আমন্ত্রণে এক ধরমবীর-কন্যা বেশ কিছুদিন আমাদের সঙ্গে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করেছিলেন। সেই সময় আমরাও শ্রীমতী ধরমবীরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ড্যালহাউসি থেকে ফিরে রাঙাকাকাবাবু পুরোপুরি আবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হবে। তার আগেই সব ব্যবস্থা করতে পুজোর সময় তিনি কার্শিয়ঙে বাবার সঙ্গে মিলিত হলেন।

॥ ২৩ ॥

যেখানে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক, সেখানে অনেক সময় অভিমানের মাত্রাটাও বেশি হয়। ১৯৩৭-এ রাঙাকাকাবাবু মুক্তি পাবার আগেই মাজননী মা-র কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, মুক্তির পর রাঙাকাকাবাবু যেন উডবার্ন পার্কে না থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর কাছে থাকেন। বিধবা হবার পর যে-কোনো মায়ের এ-রকম ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয় মাজননীর ঐ প্রস্তাবে আমার মা-র মন ঠিক সায় দেয়নি। যাই হোক, শাশুড়ির কথামতো মা রাঙাকাকাবাবুকে মাজননীর ইচ্ছার কথা বলেন এবং সোজাসুজি আরও বলেন যে, তিনি রাঙাকাকাবাবুর পথ আগলাবেন না। কথাটা শুনে রাঙাকাকাবাবুর খুব অভিমান হয় এবং মাকে বেদনায় ভরা একখানা চিঠি লেখেন। এমন কথাও তিনি লিখেছিলেন যে, আমার মা যেন একরকম জোর করেই তাঁর জীবনের এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছেন। আসলে অবশ্য তেমন কিছুই হয়নি, বাবা-মার সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর গভীর প্রীতির সম্পর্কে কোনোদিন কোনো ছেদ পড়েনি। রাঙাকাকাবাবুর সেই চিঠিখানা মা পরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

আগেই তো বলেছি ১৯৩৭-এর পুজোর সময় ড্যালহাউসি থেকে ফিরে রাঙাকাকাবাবু কার্শিয়ঙ-এ আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ছিলেন। দিনকতক পরেই কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল তো আসবেনই, গান্ধীজিও আসবেন। দুজনেই বাবার আমন্ত্রণে আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকবেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদি নিয়ে বাবা ও রাঙাকাকাবাবু কার্শিয়ঙ-এ নিজেদের মধ্যে ক্রমাগতই আলোচনা চালাতেন। নানা দিকে অনেক চিঠি লেখালেখি চলত। বাবা ও রাঙাকাকাবাবু একসঙ্গে কার্শিয়ঙ-এ আছেন খবর পেয়ে কিন্তু কার্শিয়ং ও দার্জিলিঙ থেকে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোকজন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এতে সময় নষ্ট হত, কাজেরও অসুবিধা হত। খুব বাঞ্ছনীয় নয় এমন কেউ আসছেন দেখা গেলেই দুই ভাই ঠিক ছোট শিশুদের মতো খেলার ছলে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিতেন। রাঙাকাকাবাবু হয়তো বললেন, 'এই রে, আবার অমুক আসছে, ঐ যে মেজদার পরম বন্ধু, তোমার কাছেই আসছে। আমি বেড়াতে চললুম, মেজদা, তুমিই তাহলে আদর-আপ্যায়ন করো।' জবাবে বাবা বললেন, 'ও মোটেই আমার

রাঙাকাকাবাবুকে লেখা মাজননীর চিঠি

প্রিয় বন্ধু নয়, ও তোর শাকরেদ, তোর কাছেই আসছে। তুই কথাবার্তা বল্, আমি কাজ করি।' এধরনের কবির লড়াই চলতে-চলতে অতিথি এসেই পড়তেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাঙাকাকাবাবুকেই সামাল দিতে হত। বেশ ঘটা করে বলতেন, 'আরে আরে আসুন, বসুন! কতদিন দেখা নেই, জমিয়ে গল্প করা যাক' ইত্যাদি। আমরা এই ধরনের অভিনয় বেশ উপভোগ করতাম।

ঐ সময় রাঙাকাকাবাবুর শরীর বেশ সেরে গিয়েছে। কার্শিয়ঙে পৌঁছেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, 'বলো, কে আমার সঙ্গে ভোরে বেড়াতে বেরোবে।' ঠাণ্ডার সময়, তার উপর আবার সূর্যোদয়ের আগেই উঠতে হবে। আগের বছরে তাঁর সঙ্গে থাকবার সময় বুঝেছিলাম বাড়ির কোনো-কোনো লোককে তিনি উইক-মাইণ্ডেড-এর পর্যায়ে ফেলতেন। যাতে আমাকে তিনি ঐ দলে না ফেলেন, আমি বোকার মতো রাজি হয়ে গেলাম। বুদ্ধিমানেরা আরাম করে ঘুমোচ্ছে, আর আমি নিজের মান রাখতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়লাম! ভোরে তিনিই আমাকে ঘুম থেকে তুললেন! দেখলেন যে, আমি ঠিকমতো জামাকাপড় পরেছি, আর তারপর শুরু হত একটা অসম প্রতিযোগিতা। রাঙাকাকাবাবুর হাঁটার ধরন তখন বদলে গিয়েছে। তখন কি জানি যে, ইনি ভবিষ্যতের আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক! কেবলই পিছিয়ে পড়ি, আর খানিকটা দৌড়ে তাঁকে ধরি। গিধাপাহাড় থেকে মহানদী স্টেশন তিন মাইল। মহানদী স্টেশনে পৌঁছে ভাবছি হয়তো ফেরবার আগে একটু বিশ্রাম নেবেন। কোথায় বিশ্রাম! একেবারে 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' আর আবার মিলিটারি কায়দায় হাঁটা। হাতের ছাতাটা সোজাসুজি ধরে, হাত পুরোপুরি দুলিয়ে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া!

জওহরলাল আমাদের বাড়িতে আগেও থেকেছেন। তাঁর জন্য কী ধরনের ব্যবস্থাদি করা দরকার মোটামুটি জানাই আছে। তবে গান্ধীজির জীবনযাত্রা তো একেবারেই অন্য—সেজন্য বাবা, মা ও রাঙাকাকাবাবু খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। একটা কথা অবশ্য আমি তখন জানতাম না—গান্ধীজির সঙ্গে বসু-বাড়ির প্রথম যোগাযোগ অনেক পুরনো। ১৯২৫—২৬ সালে মামলায় বন্দী রাঙাকাকাবাবুকে মাজননীর লেখা একখানা চিঠিতে দেখছি, গান্ধীজি আমাদের কটকের বাড়িতে গিয়েছেন, দাদাভাই মাজননীর কাছে তাঁর নির্বাসিত পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। কটকের বাড়িতে গান্ধীজি একটা সভাও করেছিলেন বলে শুনেছি। যাই হোক, ১৯৩৭-এ উডবার্ন পার্কের বাড়িতে যখন মহাত্মা আসবেন তখন তিনি দেশের অবিসংবাদী নেতা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন অন্তত জন-ছয়েক ব্যক্তি। ঠিক হল যে, বাড়ির তিনতলাটা পুরোপুরি তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। বেশ বড় ছাদও আছে। সেখানে গান্ধীজি বেড়াতে পারবেন, প্রার্থনাসভাও হতে পারবে। রান্নাবাড়ির একটা অংশও তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে।

বড়রা দিনকতক আগেই কলকাতায় চলে এলেন। হাওড়া স্টেশনের ভিড় এড়াবার জন্য গান্ধীজিকে আগের একটি ছোট স্টেশনে নামিয়ে নেওয়া হল এবং উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তোলা হল। আমরা ছোটরা দিনকয়েক পরে এলাম। তখন গান্ধীজি ও জওহরলাল দুজনেই আমাদের বাড়িতে। জওহরলালের বোন বিজয়লক্ষ্মীও উডবার্ন পার্কে উঠলেন, তাঁর জন্য দোতলায় একটি ঘর বিশেষ করে সাজিয়ে দেওয়া হল। জওহরলালের কন্যা ইন্দিরাও এসেছিলেন, তবে আমাদের বাড়িতে ছিলেন না। ক্ষীণকায় লাজুক মুখচোরা অল্পবয়সী

একটি মেয়ে বলে তাঁকে মনে আছে।

মহাত্মা গান্ধীকে তার আগে তো দেখিনি। বাড়িতে পৌঁছেই উপরতলায় তাঁকে দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বারান্দায় উঠে দেখি, গান্ধীজির ঘরের সামনেই রাঙাকাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'চলো, মহাত্মাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, প্রথমেই কিন্তু প্রণাম করবে।' ঘরে ঢুকেই দেখলাম ছোট্ট-খাট্টো একটি মানুষ, পুরনো ধরনের চশমা নাকে এঁটে, মেজেতে বিছানায় বসে কী যেন লিখছেন। আমি প্রণাম করতেই চশমার উপর দিয়ে একবার চোখ তুলে চাইলেন, রাঙাকাকাবাবু পরিচয় করিয়ে দিতে মাথাটা একটু নাড়লেন, কিন্তু মুখের ভাবের বিশেষ পরিবর্তন হল না। সরোজিনী নাইডু গান্ধীজিকে একবার মিকি মাউস বলে অভিহিত করেছিলেন। আমি ভাবলাম এই মিকি মাউসটি আমাদের দেশের একচ্ছত্র নেতা। স্বীকার করছি গান্ধীজিকে প্রথম দেখে আমি একটু দমেই গিয়েছিলাম। সেই সময় তিনি নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং আমার মতো কিশোরের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু তার পর দিনের পর দিন নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্যে তাঁকে দেখে আমি সত্যিই খুব অভিভূত হয়েছিলাম। এক অতি অসাধারণ ব্যক্তি যে আমাদের দেশের নেতা সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

গান্ধীজি ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে বেশ কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় কত রকম লোক যে উডবার্ন পার্কে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। অন্য কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে জওহরলাল ছাড়া রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু ও মৌলানা আজাদকে বেশ মনে আছে। রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল যে, তিনি একজন অতি বিনয়ী ভদ্রলোক এবং গান্ধীজির একান্ত অনুগত। ক্রমাগতই হাঁপানিতে ভুগতেন, সেজন্য তিনতলায় ওঠানামা করতে তাঁর বেশ কষ্ট হত। বল্লভভাইয়ের এমন গম্ভীর মেজাজ যে, আমরা কাছে ঘেঁষতে চাইতাম না। তবে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথা ছিল না। সন্ধ্যায় বেড়াবার সময় গান্ধীজির সঙ্গে প্রায়ই মৌলানা আজাদ থাকতেন। তাঁর চেহারা বেশ আকর্ষণীয় ছিল। সরোজিনী নাইডু খুব কথা বলতেন, ইংরেজি তো নয়, যেন সংগীতের মূর্ছনা। সকলের সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ। খেতে খুব ভালবাসতেন এবং খেতেনও, যদিও প্রায়ই বলতেন ডাক্তার রায়ের বারণ আছে।

॥ ২৪ ॥

ষাটের দশকের শেষের দিকে একদিন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছি, প্রবীণ শিখ ড্রাইভার নানারকম গল্প করতে-করতে বাড়িতে পৌঁছে দিল। গাড়িবারান্দায় থেমেই বলে উঠল, "তুমি শরৎবাবুর বাড়িতে আসবে আগে বলোনি কেন, এ-জায়গাটা আমার খুব চেনা। কতবার কত লোককে এখানে পৌঁছে দিয়েছি।" বিশেষ করে তিরিশ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বলল, "তখন গান্ধীজি এখানে রয়েছেন, আমরা দল বেঁধে এসেছি সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে। ছাদ ভরে গিয়েছে, সেজন্য আমরা ঐ দরজাটার সামনে ধস্তাধস্তি করছি। শেষ পর্যন্ত দরজার বড় কাঁচটা আমাদের চাপে ভেঙে গেল!

কথাটা শুনে আমারও সেই সময়কার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায়

প্রার্থনাসভার সময় ভিড় সামলাতে আমাদের হিমসিম খেতে হত। মনে আছে আমি একদিন লোহার কোলাপসিব্‌ল গেট ধরে সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। ছাদে আর জায়গা নেই। গাড়িবারান্দায় যাঁরা আছেন তাঁদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করছি, বলছি, বুঝতেই তো পারছেন এটা পাবলিক প্লেস নয়, বসতবাড়ি, জায়গা কম ; আপনারা আর একদিন আসুন। এক ভদ্রলোক আমাকে শাসিয়ে বললেন, "দ্যাখো তোমার যুক্তি আমি মানতে রাজি নই, মহাত্মা গান্ধী ইজ এ পাবলিক ম্যান, হোয়্যারএভার হি স্টেজ বিকামস এ পাবলিক প্লেস। তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দেবার অধিকার থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করতে পারো না।"

সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের বাড়ির ছাদটা প্রার্থনাসভার সময় ভরে তো যেতই, কত লোক যে আশেপাশে বারান্দায় বা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকত তার হিসেব নেই। তাছাড়া বাড়ির সামনের রাস্তায় বিকেল থেকেই ভিড় জমে থাকত। তারা মাঝে-মাঝে 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' ধ্বনি দিত। প্রার্থনাসভা আরম্ভ হবার আগে গান্ধীজি মাঝে-মাঝে ছাদের ধারে এসে তাদের দর্শন দিতেন। তাঁকে দেখা গেলে আরও ঘন-ঘন ও সজোরে ধ্বনি উঠত।

আমাদের বাড়িতে প্রার্থনাসভায় কেবল যে রামধূন হত তা-ই নয়, অন্য ধরনের অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হত। সবচেয়ে জমত যখন দিলীপকুমার রায় গান গাইতেন। ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক গান তো গাইতেনই। মাঝে-মাঝে ইংরেজিতেও প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতেন। এক সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে তিনি 'অ্যাবাউড উইথ মি' গেয়েছিলেন। কী পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। উমা বসুকে তিনিই সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন, যাঁর গান শুনে গান্ধীজি তাঁকে "নাইটিঙ্গেল অব ইণ্ডিয়া" নাম দিয়েছিলেন।

এই সূত্রে দিলীপবাবুর কথা একটু বলে নিই। গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে আসবার কিছু আগে দিলীপকুমার আমাদের সঙ্গে বেশ দিনকতক ছিলেন। গানের আসর ছাড়াও তাঁর প্রাণোচ্ছল কথাবার্তায় সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন। ছোটদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলতে পারতেন। দুপুরে তিনি যখন খেতে বসতেন মা তো থাকতেনই, আমরাও আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতাম তাঁর রসিক মনের আস্বাদ পাবার আশায়। একদিন বললেন, তোমাদের একটা পরীক্ষা নেব, শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ করার পরীক্ষা। দু'লাইনের একটা ছড়া ঠিকমতো যে যত তাড়াতাড়ি বলতে পারবে, তার ততই কৃতিত্ব। তিনিও আমাদের সঙ্গে পাল্লা দেবেন। ছড়াটি হল :

তেলে চুল তাজা
জলে চুন তাজা

তাড়াতাড়ি করে বলতে গিয়ে আমাদের তো কথা উল্টোপাল্টা হয়ে যায় কিংবা উচ্চারণে আটকে যায়। দিলীপবাবুই শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন।

তিনি তো গেরুয়া পরতেন। আমি ভাবতাম গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এত হাসিখুশি হন কী করে। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ও সখ্য কারুরই চোখ এড়াত না। যুদ্ধের পর দিলীপবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুকাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজ খানিকটা এগোবার পর আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি, পুনাতে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখা করি। তাঁর কাছে রাঙাকাকাবাবুর যা চিঠিপত্র ছিল, সেগুলো তো অসঙ্কোচে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেনই, শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত তিনি রিসার্চ ব্যুরোর কাজে ক্রমাগত আমাদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর দুটি খুব বড় অনুষ্ঠানে তিনিই

প্রধান ছিলেন। বারেবারেই আমাকে বলেছেন, "এটা খুব বড় কাজ, চালিয়ে যেও। দেশ যদি সুভাষকে ভুলে যায় তাহলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না।"

একদিন তো গান্ধীজির জন্য আমাদের ছাদে উড়িষ্যার ছৌ-নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল। আর একদিন হল ব্রতচারী নাচ, গুরুসদয় দত্ত নিজে নাচ পরিচালনা করলেন এবং নাচে অংশগ্রহণও করলেন। ঐ দুদিন আমাদের মনে হয়েছিল বুঝিবা আমাদের ছাদ ভেঙে পড়বে। অতগুলো মানুষের দাপাদাপি এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ও ঢাক-ঢোলের কান-ফাটানো আওয়াজ!

সকাল-সন্ধ্যায় লাঠি হাতে কারুর কাঁধে ভর দিয়ে এই ছাদেই গান্ধীজি পায়চারি করতেন। গরমের দিনে অতি সাধারণ একটি খাটে শুয়ে ছাদে রাতও কাটিয়েছেন। উঠতেন ভোর চারটেতে। সেজন্য ভোরের প্রার্থনাসভা ও বেড়ানোর খবর আমি জানি না। রাত আটটা নাগাদ শুয়ে পড়তেন। আমি এখনও ভেবে অবাক হই, রাত না জেগে গান্ধীজি এত কাজ কী করে করতেন। তাঁর সারাদিনের প্রোগ্রাম ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলত, কোনও কারণেই তার হেরফের হত না। সন্ধ্যায় তাঁর খাবার সময় ছটা, এক মিনিট আগেও হবে না, এক মিনিট পরেও হলে চলবে না। যদি কোনও বিশেষ অতিথি সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি এসে কথা বলতে পারেন, গান্ধীজি কিন্তু খেতে-খেতেই তাঁর কথা শুনবেন।

গান্ধীজি তাঁর পাশে বেশ কয়েকটি অনুগত শিষ্য-শিষ্যা পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন সত্যিই একজন দক্ষ সেক্রেটারি—মহাদেব দেশাই। মহাদেব দেশাই এত কাজের মধ্যেও অভাবনীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। তাঁকে অবশ্য খাটতে হত খুব কিন্তু মুখে সব সময়েই হাসি লেগে থাকত। মহাদেব দেশাই বেশ ভালই বাংলা জানতেন এবং দু-চার ছত্র বাংলা লিখে মাঝে-মাঝে আমাদের দেখাতেন। গান্ধীজিও নাকি সেই সময় বাংলা শিখেছিলেন। মহাদেব দেশাইকে সাহায্য করতেন পিয়ারেলাল। গান্ধীজির দলে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সুশীলা নায়ার, কানু গান্ধী ও আভা গান্ধী। একবার কস্তুরবাও এসেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা ও ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

গান্ধীজি যখন আমাদের মধ্যে থাকতেন, সাত-সকালে ঘণ্টা বাজিয়ে হাজির হত একটা ছাগল, সঙ্গে আসত দুটি ছাগ-শিশু। গান্ধীজি যে ছাগলের দুধ খেতেন, সেটা তো সকলেই জানেন। তবে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ধরনটা আমাদের একটু অদ্ভুত ঠেকত। শাকসব্জি সিদ্ধ, দই ও রসুনবাটা ইত্যাদি একটা কাঠের পাত্রে নিজের হাতে মিশিয়ে তিনি একটা জগাখিচুড়ি তৈরি করতেন—খেতে কেমন হত কে জানে! সঙ্গে কিছু ফলমূল থাকত। তিনি কিন্তু বেশ তৃপ্তি করে খেতেন। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সম্বন্ধে তাঁর একান্ত নিজস্ব কিছু মতামত ছিল—পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসব বের করেছিলেন বলে তিনি দাবি করতেন। ডাক্তারদের মতামতের তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না, তা সেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বা যে-কেউ হোন না কেন। আমাদের রান্নাবাড়িতে পিয়ারেলাল এক বিশেষ দেশী যন্ত্রের সাহায্যে গান্ধীজির জন্য পাঁউরুটি তৈরি করতেন। কিন্তু গান্ধী-মার্কা পাঁউরুটি খেতে খুব ভাল হত বলে আমাদের মনে হত না। সেই সময় কলকাতার বিশেষ কোনও হোটেলের পাঁউরুটির বেশ নামডাক ছিল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গান্ধীজিকে সেই পাঁউরুটি চেখে দেখতে রাজি করানো গেল। খেয়ে তিনি কিন্তু স্বীকার করলেন যে, আমাদের পাঁউরুটিই ভাল।

১৯৩৭-৩৮ সালে গান্ধীজি ও জওহরলাল তো কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকতেন। তা ছাড়া সেই সময় দেশের অন্যান্য বড় বড় নেতাদেরও বেশ কাছ থেকে দেখা যেত। এ-সুযোগ কে ছাড়তে চায়। ১৯৩৭-এর কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল মঞ্চে একসাথে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি। অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। জওহরলাল ও রাঙাকাকাবাবুকে ঠিক সময়ে ধরতে পারলে অটোগ্রাফ পেতে বিশেষ অসুবিধা হত না।

গান্ধীজির বেলায় কিন্তু নিয়ম ছিল একেবারে অন্যরকম। পাঁচটা টাকা অটোগ্রাফের খাতার ভিতরে গুঁজে দিয়ে তবেই জমা দিতে হত, রোজই অটোগ্রাফের বইয়ের স্তূপ ঘরের এককোনায় দেখা যেত। এই ভাবে গান্ধীজি হরিজন ফাণ্ডের জন্য টাকা তুলতেন। দর্শন করতে এসে অনেক মহিলাও গয়না খুলে গান্ধীজির হাতে সমর্পণ করে যেতেন। কোনো কোনো অটোগ্রাফপ্রার্থী আবদার করতেন যে, ইংরেজি অক্ষরে গান্ধীজির সই চাই। এ-সব ক্ষেত্রে বিশেষ আরজির প্রয়োজন হত। মনে আছে, একদিন বিশেষ কোনো অটোগ্রাফপ্রার্থীর হয়ে সাহস করে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম যে, তিনি যেন দয়া করে দেবনাগরীতে না লিখে ইংরেজিতে সই করে দেন। নাকের ডগায় চশমার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন গান্ধীজি, তারপর মুচকি হেসে বললেন যে, সেবারকার মতো তিনি ইংরেজিতে সই করে দিচ্ছেন, কিন্তু 'ইফ এনিবডি এল্‌স এগেন আসক্‌স্ ফর অ্যান অটোগ্রাফ ইন ইংলিশ, প্লীজ টেল হিম্ দ্যাট দি চার্জ ইজ টেন রুপিজ, অ্যাণ্ড নট ফাইভ।'

লক্ষ করার বিষয় যে, দেশের কাজে দেশবাসীর কাছে কোনো দাবি রাখতে মহাত্মা গান্ধীর দ্বিধা ছিল না। পরে যেমন আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সময় রাঙাকাকাবাবু পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব দাবি করেছিলেন—সব ত্যাগ করে ফকির হতে বলেছিলেন।

আগেই তো বলেছি, যতই গান্ধীজিকে কাছ থেকে দেখতে লাগলাম, ওঁর অসাধারণত্ব ততই প্রকট হতে লাগল। কেবল অসাধারণত্ব নয়, অভিনবত্বও বটে। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে তিনি কোনো কিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি সোজাসুজি ডাক্তার বিধান রায় বা নতুনকাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসুকে বলে দিতেন যে, পাশ্চাত্ত্যের চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁর কাছে গ্রাহ্য নয়। বেশি রসুন খাওয়া নিয়ে আপত্তি করলে জবাব দিতেন যে, তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন সেটা তাঁর পক্ষে ভাল, তাঁর ব্লাড প্রেশার ঠিক রাখে। গঙ্গার ঘাট থেকে মাটি আনিয়ে কাপড়ের মধ্যে পুরু করে প্রলেপ তৈরি করে কপালে ও পেটের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতেন। বড় বড় ডাক্তারেরা হাঁ করে দেখতেন। অন্যদিকে আবার কয়েকটি ব্যাপারে তিনি বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিও মেনে চলতেন। যেমন, তাঁর জন্য আনা শাকসব্জি জীবাণুমুক্ত করার জন্য পোটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখা হত। শরীর ভাল রাখার জন্য তিনি একটি বিখ্যাত জার্মান কোম্পানির গ্লুকোজ খেতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তিনি খুবই কড়াকড়ি করতেন। বাবা গান্ধীজির জন্য

রাতারাতি তাঁর ঘরের পাশের বাথরুমে বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাথরুম পরিষ্কার রাখার ভার গান্ধীজি কাউকে ছাড়বেন না। গৃহস্বামী যতই বিব্রত হোন না কেন, নিজের বাথরুম গান্ধীজি নিজের হাতে পরিষ্কার করবেনই।

গান্ধীজির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাদি করতেন আমার মা ও বোন গীতা। যোগাড় দিতেন আমাদের মাসতুতো দাদা রবীন্দ্রকুমার ঘোষ, যাঁকে সকলেই 'ডাঁটিদা' বলে জানত। ডাঁটিদা গান্ধীজির জন্য কলকাতার বাজার তোলপাড় করে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যা আছে এনে হাজির করতেন। এ-ব্যাপারে কেউ কোনো সমালোচনা করলে ডাঁটিদা বড়ই দুঃখ পেতেন। জানতে পারলে গান্ধীজি কিন্তু ডাঁটিদার পক্ষে এগিয়ে আসতেন। বলতেন, "রবিবাবু আমার জন্য বাজারের সেরা জিনিস আনেন।" তাঁর সম্বন্ধে যে-কেউ কিছু ভাল বললেই ডাঁটিদা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন, চোখে জল এসে পড়ত। এই সূত্রে ডাঁটিদা সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। এমন প্রাণখোলা পরোপকারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ করে গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে আসার সময় থেকে বাবা মা ও আমাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মাত্র কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেটা বজায় ছিল। মনে হত যেন কেবল অন্যের কাজ হাসিমুখে করবার জন্যই বিধাতাপুরুষ ডাঁটিদাকে এ-জগতে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে সুদিনে ও দুর্দিনে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তিনি প্রায় রোজই আসতেন ; যেমন সব রকম কাজের ভার নিজে থেকেই নিতেন, তেমনি জমিয়ে আড্ডাও দিতেন। বাবা তাঁকে ডাকতেন 'ডাঁটি-মহারাজ' বলে, বাবার প্রতি আনুগত্যে তাঁর কোনোদিন হেরফের হয়নি। যুদ্ধের সময় যখন আমি সুদূর পাঞ্জাবে বন্দী, তখন মার কাছে লুকিয়ে একটি চিঠি পাঠাবার সময় আমি ডাঁটিদার ঠিকানা ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজে তিনি শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অকুণ্ঠ ও সহৃদয় সাহায্য দিয়ে গেছেন।

কলকাতায় গান্ধীজির অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা বিশেষ কাজ ছিল। বাংলার রাজবন্দীদের নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বড়ই বেগ দিত। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হলে তারা অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিলেও বাংলার বিপ্লবী রাজবন্দীদের সহজে ছাড়তে চাইত না। এ-বিষয়ে রাঙাকাকাবাবুর মনোভাব ছিল খুব কঠিন ও পরিষ্কার। তাঁর মত ছিল যে, যখনই যুদ্ধবিরতি হবে, সব রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে, হিংসা-অহিংসার অজুহাত দিয়ে এই নীতির ব্যতিক্রম করা চলবে না। ব্রিটিশ সরকারের উপর এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার জন্য তিনি গান্ধীজির সহযোগিতা চান। গান্ধীজি কলকাতায় এসে একদিকে ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, অন্যদিকে জেলে গিয়ে আমাদের বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে দেখা করছিলেন। গান্ধীজির ও বাবা-রাঙাকাকাবাবুর এ-ব্যাপারে কাজের ধারাটা ঠিক একরকম না হলেও, উদ্দেশ্য ছিল এক। শেষ পর্যন্ত সমস্যার একটা সুরাহা হয়, বেশির ভাগ বন্দী মুক্তি পান, এবং তাঁরা কংগ্রেসে সামিল হয়ে জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

১ নং উডবার্ন পার্কে আমাদের বাড়িতে দুই মহামানবের মিলন হয়েছিল দু'বার। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ। একবার আমি তো সাক্ষীই ছিলাম, অন্যবার একটা বিপদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল, রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে

পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠতে পারবেন না। গান্ধীজি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। একতলায় যে-ঘরটা পণ্ডিতজির ঘর বলে চিহ্নিত ছিল, সেই ঘরে দুজনের দেখা হল। যাবার সময় হলে গান্ধীজি নিজের হাতে করে রবীন্দ্রনাথের চটিজোড়া এগিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকরা এসে পড়লেন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল।

অন্যবার যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন গান্ধীজি খুবই অসুস্থ, রক্তের চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। সারা বাড়ি থমথম করছে। বাবা, রাঙাকাকাবাবু, জওহরলাল চিন্তায় আকুল। ডাক্তার রায় ও নতুনকাকাবাবু অস্থির হয়ে যা করতে পারেন করছেন। গান্ধীজি তখন দোতালায় বাবার ঘরে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখতে আসতে চাইলেন। এবার তাঁকে চেয়ারে করে উপরে তুলতে হল। চেয়ার বহন করলেন সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু ও মহাদেব দেশাই।

॥ ২৬ ॥

১৯৩৭-এর মাঝামাঝি থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, রাঙাকাকাবাবু সম্ভবত ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবেন। অক্টোবরে জওহরলালের সভাপতিত্বে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর এবং গান্ধীজি কলকাতায় ঘুরে যাবার পর গুজবটা জোরদার হল। রাঙাকাকাবাবু সেই সময় ইউরোপে ও দেশের কোনো কোনো বন্ধুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এই মর্মে আভাস দিচ্ছিলেন। সেকালে কংগ্রেসের সভাপতির পদের গুরুত্ব আজকালকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। কংগ্রেসের সভাপতিকে তখন 'রাষ্ট্রপতি' বলা হত। স্বাধীনতাকামী কোটি-কোটি ভারতবাসীর কাছে তিনিই হতেন আমাদের জাতীয়তার প্রতিভূ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ভারতের বাইরেও ভারতপ্রেমী বিদেশী বন্ধুদের কাছে এর গুরুত্ব কম ছিল না। পুরনো চিঠিপত্র দেখছি, রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের প্রধান হবার সম্ভাবনায় তাঁরা খুবই আনন্দিত হচ্ছেন। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের শেষে রাঙাকাকাবাবু অল্প সময়ের জন্য হলেও ইউরোপ সফরে যান।

ঐ ইউরোপ ভ্রমণ মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, রাঙাকাকাবাবু নিজের চোখে ইউরোপের রাজনীতির চেহারাটা একবার দেখে নিলেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপে ও পরে ইংল্যাণ্ডে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই তিনি আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা করছিলেন। ইংল্যাণ্ডের এক নামকরা প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গে বই প্রকাশ করার চুক্তির মূল কপি আমাদের কাছে রয়েছে। তাতে দেখছি, প্রকাশক আত্মজীবনীর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ১৯৩৭-এর নভেম্বরের মধ্যে চাইছেন। নানা কাজের মধ্যে যে রাঙাকাকাবাবু চুক্তি অনুযায়ী লেখা শেষ করতে পারেননি তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

ঝড়ের মতো যাঁদের জীবনের গতি, লেখালেখির কাজ ভাল করে করতে হলে দেখছি হয় তাঁদের জেলে যেতে হয়, নয়তো নির্বাসনে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত যদি রাঙাকাকাবাবু

ইউরোপে নির্বাসনে না থাকতেন, তাহলে 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' লেখা হত কিনা সন্দেহ। কী হুড়োহুড়ির মধ্যে তিনি লেখার কাজ করতেন, তার দুটো বড় দৃষ্টান্ত দিতে পারি। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ রাঙাকাকাবাবু দুদিনের মধ্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা লিখেছিলেন। দৃশ্যটি মনে আছে। তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর ঘরে বসে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। দু-এক পাতা লেখা হলেই একজন দৌড়ে সেটা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। উডবার্ন পার্কে টাইপ করা হচ্ছে, টাইপ করা হলে বাবার সেক্রেটারি নীরদ চৌধুরী মহাশয় সেটা মিলিয়ে দেখে দিচ্ছেন। তারপর আর-একজন দৌড়ে সেটা প্রেসে পৌঁছে দিচ্ছে। হরিপুরার পথে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু তাঁর ভাষণ লিখছিলেন। নিজে ফিরে একবার পড়বার বা শোধরাবার কোনো সময় তিনি পাননি। তাঁর সঙ্গে ভাষণের ছাপা কপি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সারা রাত এবং পরের দিন পুরোদমে প্রেসের কাজ চালিয়ে, বই বাঁধিয়ে পরের দিন রাতের ট্রেনে পাঠানো হয়। আজাদ হিন্দ সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটিও রাঙাকাকাবাবু সিঙ্গাপুরে একটা পুরো রাত জেগে লিখেছিলেন। ২১শে অক্টোবর সরকার ঘোষণা হবে, কিন্তু ১৯শে পর্যন্ত ঘোষণাপত্রটি লেখা হয়নি। ১৯শে রাত বারোটায় শুরু করে ২০শে ভোর ছটা পর্যন্ত কালো কফিতে চুমুক দিতে-দিতে একটানা লিখে গেলেন। দু-একখানা পাতা লেখা হচ্ছে, আর আবিদ হাসান বা এন· জি· স্বামী পাশের ঘরে এস· এ· আয়ারের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। আয়ার টাইপ করে চলেছেন। টাইপ করা হবার পর বিন্দু-বিসর্গও বদলাতে হয়নি। যেমন আমরা দেখেছিলাম হরিপুরা ভাষণের বেলায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি অতি মূল্যবান ও স্মরণীয় দলিল এই ভাবে ঝড়ের বেগে লেখা হয়েছিল।

আত্মজীবনী তো একরাতে লেখা যায় না। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরের ইউরোপ যাত্রায় তিনি প্রথমেই গেলেন অস্ট্রিয়ায় তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস বাদগাস্টাইনে। সেখানে শ্রীমতী এমিলিয়ের সাহায্যে দিন দশেক ইংরাজিতে আত্মজীবনীর দশটি পরিচ্ছেদ লিখলেন। জন্ম থেকে আই· সি· এস· থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত তিনটি খাতায় লেখা হল। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, রাঙাকাকাবাবুর গুরুত্বপূর্ণ অনেক চিঠি বা প্রবন্ধ পেনসিলে লেখা, এটিও তাই। সেজন্য সংরক্ষণের কাজে নেতাজী রিসার্চ· ব্যুরোতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

আত্মজীবনীতে রাঙাকাকাবাবু বসুবাড়ির সাতাশ পুরুষ পর্যন্ত পারিবারিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এর আগে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ও তাঁদের জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি। জানতামও খুব কম। আমাদের গোষ্ঠীর বা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দশরথ বসু। তাঁর চার পুরুষ পরে মুক্তি বসু কলকাতার চোদ্দ মাইল দক্ষিণে মাহীনগর গ্রামে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই থেকে আমরা মাহীনগরের বসু-পরিবার বলে খ্যাত। দশরথের এগারো পুরুষ পর থেকে বসু-পরিবার জনজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহীপতি বসু সেই সময় বাংলার অর্থ ও যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মহীপতির নাতি গোপীনাথ আরও এগিয়ে যান এবং তৎকালীন বাংলার অধিপতি সুলতান হুসেন শাহের অর্থমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত হন। সুলতান তাঁকে 'পুরন্দর খাঁ' উপাধি দেন এবং মাহীনগরের কাছেই পুরন্দরপুর বলে যে একটা গ্রাম আছে সেটা তাঁরই জায়গির। পুরন্দরের বাগানই এখন হয়েছে মালঞ্চ গ্রাম। এই মালঞ্চে দাদাভাইয়ের বেশ

একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল। পুজোর সময় ছেলেবেলায় আমরা যখন দল বেঁধে দেশে যেতাম, সেই সময় রাঙাকাকাবাবুকে এই বাগানের পুকুরে সাঁতার কাটতে দেখেছি।

দুশো বছর আগে মাহীনগরের কাছ দিয়েই হুগলী নদী বইত। কিন্তু নদীর গতি ধীরে-ধীরে সরে যাওয়ায় মাহীনগর ও আশপাশের গ্রামগুলিতে মহামারী দেখা দেয় এবং গ্রামবাসীরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েন। বসুবাড়ির একটি শাখা পুরন্দরের বংশধরেরা কাছেই কোদালিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। আমরা কোদালিয়াকেই আমাদের গ্রাম বলে জেনে এসেছি। গ্রামের নামের বেশ একটা ইতিহাস আছে। পুরন্দর বা গোপীনাথ বসু প্রগতিবাদী ছিলেন। জাত, কুল ইত্যাদি সম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম ও বিধিগুলি পরিবর্তন করার জন্য তিনি এক বিরাট সম্মেলন ডেকেছিলেন, যাতে নাকি এক লক্ষেরও বেশি লোক যোগ দিয়েছিলেন। ঐ বিরাট সমাবেশে জল সরবরাহের জন্য অনেক লোক লাগিয়ে তিনি লম্বা একটা পুকুর বা খাল কাটিয়েছিলেন। কাজের পর মজুরেরা তাদের কোদালগুলি যেখানে জড় করে রাখতেন, সেখানেই কোদালিয়া গ্রামটি গড়ে ওঠে।

যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু তাঁর আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করবার সময় পেলেন না, এবং লণ্ডন থেকে বই প্রকাশের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ১৯৩৮-এর জানুয়ারি প্রথমে তিনি লণ্ডনে পৌঁছলেন। সেখানেই খবর পেলেন যে, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। লণ্ডনে দেশী বিদেশী বহু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। বেশ কয়েকটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। একটি সভায় বন্ধুভাবাপন্ন ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। রাঙাকাকাবাবু তাঁদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংল্যাণ্ডের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো সাহায্য তিনি প্রত্যাশা করেন না, লড়াই করেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব। সেই সময় কোনো কূটনৈতিক আলোচনার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতা ডি· ভ্যালেরা লণ্ডনে ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও রাঙাকাকাবাবুর দেখা হয়। ফেরার পথে ইটালির রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইউরোপ-রওনা হবার সময় বসু-বাড়ির একটা বিরাট দল দমদম বিমান-ঘাঁটিতে তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। মাসখানেক পরে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি যেদিন ফিরলেন, সেদিন দমদমে খুব ভিড়। তাঁকে দেখে মনে হল, অল্পদিনের ঐ ইউরোপ সফরে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে—সবল, সুঠাম দেহ, গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে।

॥ ২৭ ॥

বাড়ির কেউ বিশেষ কোনো সম্মান বা জীবনে বড় রকমের প্রতিষ্ঠা লাভ করলে পরিবারে, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের মধ্যে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়াগুলি যদি আমি বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মনের ও চরিত্রের একটা ছবি বেশ ফুটে ওঠে। বসুবাড়িও ব্যতিক্রম ছিল না।

বলাই বাহুল্য, রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে বসুবাড়ির ছোটবড় সকলেরই মর্যাদা বেড়ে গেল এবং সকলেই বেশ গৌরব বোধ করলেন। তবে

আমার মনে হয় রাঙাকাকাবাবু 'রাষ্ট্রপতি' হবার আগে পর্যন্ত বসুবাড়ির মধ্যমণি ছিলেন না। অনেকেই তাঁকে দূর থেকে দেখতেন বা দূরত্ব রেখে চলতেন, এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা ফিরেও তাকাতেন না। এখন থেকে কিন্তু রাঙাকাকাবাবুকে ঘিরেই বসুবাড়ি চলতে লাগল। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মাজননীর ইচ্ছায় তিনি অনেকদিন পরে এলগিন রোডের সাবেক বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন। দাদাভাইয়ের শোবার ঘরটি তাঁর জন্য বরাদ্দ হল। বাড়ির অনেক ব্যবস্থা পালটাতে হল। কারণ সভাপতির তো একটা ভাল অফিস চাই। তাছাড়া রোজ কত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, বসবার জায়গা চাই। বাড়ির পেছনের দিকের একটা বড় ঘর খাওয়াদাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত, সেটা আসবাবপত্র গুছিয়ে রাঙাকাকাবাবুর অফিস হল। আজও নেতাজী ভবনে ঘরটি একইভাবে সাজানো আছে। অতিথিদের বসবার জন্য নীচের তলায় একটা ও উপর তলায় একটা ঘর রাখা হল।

অনেকদিন বাংলা থেকে কেউ কংগ্রেসের সভাপতি হননি। সেই ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু দাশ। পরে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কলকাতার এসপ্ল্যানেডে বেআইনি কংগ্রেসের একটি বিশেষ ও ক্ষণস্থায়ী অধিবেশনের সভানেত্রীত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা। এতদিন পরে রাঙাকাকাবাবুর এই পদ লাভ করার একটা বিশেষ ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল। এ কথাটা আজ বাংলা দেশে অনেকেই ভুলে গেছেন। প্রথমতঃ, বাংলার জনমানসে সেদিন একটা নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলার রাজনীতিতে তখন একটা ছন্নছাড়া ভাব এসেছিল, সেটা কেটে গেল। তৃতীয়ত, বাংলার বিপ্লববাদী রাজনৈতিক কর্মীরা রাঙাকাকাবাবুর মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে খানিকটা প্রতিনিধিত্ব পেলেন। চতুর্থত, ব্যাপারটা ছিল মহাত্মা গান্ধী ও রাঙাকাকাবাবু দুজনের দিক থেকেই একটা ঐতিহাসিক এক্সপেরিমেন্ট। স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় সংগ্রামের দুটি স্রোত যুক্ত করে অগ্রসর হবার চেষ্টা দুদিক থেকেই করা হয়েছিল। আমি অবশ্য কট্টর ও গোঁড়া সুভাষবিরোধীদের কথা বাদ দিচ্ছি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের ইতিহাস ও দেশের রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া, আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেবল অতীতকে বোঝবার জন্যই আমি একথা বলছি না। আজকের রাজনীতি মূলত সেই সময়কার ঘটনাবলীরই পরিণাম। ঐক্যবদ্ধ ও প্রগতিশীল ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হলে গান্ধীজির গণজাগরণ ও লোকশক্তির পথ এবং সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সংগ্রামী ও বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের একটা সমন্বয় ঘটানো যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের যুবসমাজ দিতে পারে।

একটা অপ্রিয় কথা না বলে পারছি না, যদিও ব্যাপারটা গুটিকতক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই খাটে। রাঙাকাকাবাবুর সমসাময়িক কোনো কোনো রাজনীতিবিদ্ ও বন্ধু তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বেশ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও জনজীবনে মানুষের চরিত্রের এই দুর্বলতা প্রায়ই দেখা দেয়। যাঁরা বড় তাঁরা উদার হয়ে এসব উপেক্ষা করেন।

মাজননী, বাবা, মা ও বাড়ির অন্য অনেকে দল বেঁধে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হরিপুরায় গিয়েছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর খুব ইচ্ছা ছিল যে বাসন্তী দেবীও তাঁর সঙ্গে হরিপুরায় যান। এ বিষয়ে তিনি ঠাকুমাকে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন, কিন্তু ঠাকুমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

38-2. ELGIN ROAD.
CALCUTTA.

বাসন্তী দেবীকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠি

কংগ্রেস খুব জমকালো হয়েছিল। একান্নটি বলদ দিয়ে টানা এক্কাগাড়ি ধরনের একটা সাজানো রথে বসিয়ে সভাপতিকে বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দৃশ্যটি ফিল্‌মে ধরা আছে এবং আমরা মাঝে মাঝে দেখি। সভাপতির অভিভাষণ রাঙাকাকাবাবু খানিকটা হিন্দিতে পড়েছিলেন। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা বলেন যে তখনও তিনি ঠেকে ঠেকে হিন্দি বলতেন। অবশ্য আগে থেকেই তিনি হিন্দি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। শেখবার জন্য একজন শিক্ষকও রেখেছিলেন। অমায়িক, স্বল্পভাষী ঐ পণ্ডিতজি যে কেবল বাড়িতে এসে রাঙাকাকাবাবুকে হিন্দি অভ্যাস করাতেন তাই নয়। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তিনি সফরেও যেতেন, যাতে ক্রমাগতই হিন্দি শিক্ষা চলতে পারে। কয়েক মাসের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু হিন্দিভাষা বেশ রপ্ত করে ফেললেন। ক্রমে ক্রমে কথাবার্তায় ও বক্তৃতায়

তিনি উর্দু কথা মেশাতে আরম্ভ করলেন। শুনেছি, অন্য কেউ সভায় হিন্দুস্তানি বা উর্দুতে বক্তৃতা করলে রাঙাকাকাবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং নতুন কয়েকটি কথা মনে মনে তুলে নিতেন। পরের সভায় তিনি নিজেই সেই কথাগুলি ব্যবহার করতেন।

রাঙাকাকাবাবুর হরিপুরা ভাষণ স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। ঐ ভাষণে তিনি ইতিহাসের পটভূমিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি, গতি ও লক্ষ্যের একটা পরিষ্কার ছবি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী। রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে কোনো গোঁড়ামি—যা আজ আমরা এত দেখতে পাই—তাঁর মধ্যে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বিচার করে দেখলে হয়। তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দুস্তানি—হিন্দি ও উর্দুর একটা সহজ সংমিশ্রণ—আমাদের জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। আরও বলেছিলেন যে, জাতীয় সংহতি ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য রোমান বা ল্যাটিন লিপি আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

বসুবাড়ির যাঁরা রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হরিপুরায় গিয়েছিলেন তাঁরা বেশ আদরযত্ন পেয়েছিলেন। গুজরাটের জীবনযাত্রার ধরন তো অন্য রকম, বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে। তা সত্ত্বেও দেশের যেখানেই যাই না কেন, বুঝতে পারি কেমন একটা মূলগত ঐক্যের বাঁধনে আমরা ভারতবাসীরা একসূত্রে বাঁধা। আর-একটা বড় কথা হল, গান্ধীজির ইচ্ছায় ও নির্দেশে বার্ষিক অধিবেশনগুলি গ্রামে করার নীতি কংগ্রেস সবেমাত্র গ্রহণ করেছে। যেটা কদিন আগেও একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল, সেখানে অত বড় সম্মেলনের ও জনসমাবেশের জন্য সবরকম ব্যবস্থা দেখে আমাদের বাড়ির সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

শুনেছি, হরিপুরায় রাষ্ট্রপতির মা, আমাদের মাজননীর বিনয় ও স্বভাবিকতা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়টা তো ছিল ত্যাগ ও সেবার যুগ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দম্ভের অভিব্যক্তি ছিল কম।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর রাঙাকাকাবাবু মাজননী ও বাড়ির অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে বোম্বাই যান। সেই সূত্রে বোম্বাইয়ে এক গুজরাটি দম্পতি নাথালাল পারিখ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসুবাড়ির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের বাড়িতেই রাঙাকাকাবাবু অতিথি ছিলেন। পরেও যতবার বোম্বাই গিয়েছেন তাঁদের বাড়িতেই থেকেছেন। ইউরোপে থাকতেই নাথালালের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩৮ থেকে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রাঙাকাকাবাবু একটা বিরাট কাজের সূচনা করেছিলেন—স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনার জন্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন। সেই সূত্রে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে বেশ কয়েকবার এলগিন রোডের বাড়িতে এসে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে দেখেছি।

॥ ২৮ ॥

আমার মনে হয় অনেক অসুবিধার মধ্যে রাঙাকাকাবাবুকে কংগ্রেস সভাপতির কাজ চালাতে হয়েছিল। কংগ্রেসের সদর অফিস ছিল এলাহাবাদে। সভাপতির কাজের যা চাপ

সেটা সামলাতে তাঁর জন্য কলকাতায় অন্তত দুজন দক্ষ সেক্রেটারির প্রয়োজন ছিল। তিনি অবশ্য মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল নেহাতই চলনসই, উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত নয়। অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর চিঠিপত্র, অফিসের কাগজপত্র ইত্যাদি খুবই এলোমেলো হয়ে যেত। ফলে পরে সবকিছু একত্র ও সুসংবদ্ধ করে দেশবাসীর জন্য বাঁচিয়ে রাখতে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে খুবই বেগ পেতে হয়েছে।

রাঙাকাকাবাবুর অত্যধিক খাটুনির আরও একটা দিক ছিল। ১৯২১ সালে জনজীবনে প্রবেশ করার সময় থেকে রাজনীতির বাইরেও তিনি কলকাতা ও বাঙলার নানা ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তা সে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও যুবকদের নানা সংগঠন, বিদ্যায়তন, লাইব্রেরি, ব্যায়ামাগার—যাই হোক না কেন। তাছাড়া কলকাতা করপোরেশন তো ছিলই, যেটা একাধারে রাজনীতি ও খানিকটা সমাজ সংগঠনের এলাকা ছিল।

রাঙাকাকাবাবু যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত হতেন, তার কাজকর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন, কেবল উপদেশ, পরামর্শ ও বক্তৃতার মধ্যে তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ থাকত না। আমি নিজে তখনও ভেবেছি, কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর তিনি স্থানীয় ও প্রাদেশিক নানা কাজ ও সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছেন না কেন। যেমন কংগ্রেসের সভাপতি হবার পরও তিনি করপোরেশনের অলডারম্যান হয়েছিলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দৈনন্দিন কাজেও তাঁকে বেশ সময় দিতে হত। কত লোকের সঙ্গে যে রোজ দেখা করতেন বলবার নয়। অনেকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হত মোটরগাড়িতে। এমন কী, হয়তো বাইরে সফরে বেরোচ্ছেন, বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কারুর সঙ্গে জরুরি কথা বলবেন। অথবা কাউকে হয়তো বললেন বর্ধমান কি আসানসোল পর্যন্ত চলুন, ট্রেনে কথা হবে।

এমন লোকের ড্রাইভারও জবরদস্ত হওয়া দরকার। ১৯৩৭ সালে কার্শিয়ঙ-এ আমাদের সঙ্গে থাকার সময় এক বিলেত-ফেরত নেপালি ড্রাইভারকে পছন্দ করে রাঙাকাকাবাবু কলকাতায় নিয়ে আসেন। 'বাহাদুর' ড্রাইভার DKW নামে এক মজবুত জার্মান গাড়িতে রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে ঘুরত। প্রায়ই তো শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরতে হত, বাহাদুর রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে দশবারো মিনিটে এলগিন রোড থেকে হাওড়া স্টেশন পৌঁছে দিয়ে রেকর্ড করত। কতবার যে পুলিসের হাত অমান্য করেছে তার ঠিক নেই। ঝড়ের বেগে গিয়েও যে ঠিক সময়ে পৌঁছতেন তা নয়। অনেক সময় মেল ট্রেনও কয়েক মিনিট দেরিতে ছাড়ত—রাষ্ট্রপতি না-আসা পর্যন্ত গার্ড হুইস্‌ল দিতেন না।

রাঙাকাকাবাবু তো ক্রমাগতই বড়-বড় জনসভায় বক্তৃতা করতেন। মধ্য-কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই সভা হত বেশি। মেডিকেল কলেজ থেকে জায়গাটা তো কাছেই—১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর অনেক বক্তৃতা সেখানে শুনেছি। আমি কিন্তু রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে সভায় যেতাম না, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাঠে বসে বক্তৃতা শুনতাম। রাঙাকাকাবাবু প্রায় প্রত্যেক মীটিঙেই দেরি করে আসতেন। আমি হিসেব করে দেখেছিলাম, মোটামুটিভাবে আড়াই ঘণ্টা দেরি নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লোকেরা কিন্তু স্থির ও শান্ত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত এবং তাঁর লম্বা-লম্বা বক্তৃতা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়ত না।

বক্তৃতার ধরনটা রাঙাকাকাবাবু একেবারেই বদলে ফেলেছিলেন। শুদ্ধ বাংলায় দার্শনিকের মতো বক্তৃতা তিনি জনসভায় আর করতেন না—সহজ ও সোজাসুজি কথাবার্তার ঢঙে বলতেন। মাঝে-মাঝে রসিকতার সুরে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে সকলকে চমকে দিতেন। যেমন, একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "যদি ইংরেজরা এই যুদ্ধে হেরে যায়, আপনারা কি দুঃখিত হবেন ?" কোনো জবাব নেই, সব চুপ। তখন বললেন, "ও, ভয় করছে বুঝি! আমি আপনাদের হয়ে বলে দিচ্ছি, আমরা মোটেই দুঃখিত হব না।" আর একবার প্রশ্ন করলেন, "এই যে জার্মানরা লণ্ডনের উপর জিনিসপত্র ফেলছে, তাতে আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে ?" আবার সব চুপ। নিজেই জবাব দিলেন, বললেন, "আপনাদের মনের কথা আমিই বলে দিচ্ছি, এতে আমাদের কোনো কষ্ট নেই।" তিনি জবাবগুলি বলে দেবার পর তুমুল হাততালি পড়ত। আর একটা কথা তিনি প্রায় প্রতি সভায় বক্তৃতার শেষে জিজ্ঞাসা করতেন—স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের জন্য সকলে প্রস্তুত আছেন কিনা। সকলেই একবাক্যে হাত তুলে সম্মতি জানাতেন।

দেশত্যাগ করার আগে যে তিন বছর রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়িতে ছিলেন, সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে একজনকার সম্বন্ধে না লিখলেই নয়। আমার খুড়তুতো বোন ইলার কথা। সেই সময় যে স্নেহ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইলা রাঙাকাকাবাবুর দেখাশুনো সেবা করেছিলেন, তার তুলনা পাওয়া শক্ত। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, অসুখে-বিসুখে এবং অনেক ছোটবড় কাজে রাঙাকাকাবাবু অনেকটা ইলার উপর নির্ভর করতেন। মহানিষ্ক্রমণের সময় ইলার ভূমিকা সম্বন্ধে পরে বলব। তবে রাঙাকাকাবাবুর কথা বলতে গেলেই আমার এই কোমলহৃদয় প্রিয় বোনটির কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য বাড়ির সব ছেলেমেয়েরাই যার যেমন সাধ্য রাঙাকাকাবাবুর কাজ করতে কখনও পেছপা হত না। ১৯৩৮-এ এলগিন রোডের বাড়িতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হল। বাড়ির সকলেই কাজে লেগে গেল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ১৯৩৮-৩৯-এ আমাদের দেশের দুই মনীষীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছিল। একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ, আর অন্যজন হলেন গান্ধীজি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে বলেছেন যে, অনেকদিন পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু দ্বিধা ছিল। পুরনো চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় রাঙাকাকাবাবুরও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু অভিমান ছিল। কিন্তু ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের সব দ্বিধা কেটে গিয়েছে এবং তিনি রাঙাকাকাবাবুকে দেশনেতার সর্বোচ্চ আসনে আহ্বান করলেন। শুধু তাই নয়, আগামী কালের মুক্তিসংগ্রামের অধিনায়ককে তিনি সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই দেখতে পেলেন।

১৯৩৮-এর শেষের দিকে যখন রাঙাকাকাবাবু দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হবেন বলে ঠিক করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া একরকম তো হলই না, পরস্পরবিরোধী হল বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ডামাডোলে নিজেকে বড়-একটা জড়াতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, তিনি তাঁর মতামত গান্ধীজিকে জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের মঙ্গলের জন্য দেশের দুই আধুনিক-মতাবলম্বী নেতা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

জওহরলালকে ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান করেছেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বললেন, সুভাষচন্দ্রকেই কংগ্রেসের সভাপতির পদে রাখা উচিত। গান্ধীজি কিন্তু একমত হলেন না। এক বছর আগেই গান্ধীজি রাঙাকাকাবাবুকে সাদরে সভাপতির পদে আহ্বান করেছিলেন। কেন গান্ধীজি নিজের মত ও পথ একেবারে পালটে ফেললেন এটা ঐতিহাসিকদের কাছে একটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা বোঝাপড়ার জন্য জওহরলাল কিছু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। বোধ হয়, সেই সময় গান্ধীজির উপর উগ্র ও কট্টর গান্ধীবাদীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিকে রাঙাকাকাবাবুর স্থির বিশ্বাস হল যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা আপসের চেষ্টা ব্যর্থ করতে তাঁর উচিত সভাপতির পদের জন্য লড়া। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা তীব্র লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠল।

॥ ২৯ ॥

১৯৩৯-এর জানুয়ারির শেষে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি-নির্বাচন হল। এ-ধরনের নির্বাচন কংগ্রেসের ইতিহাসে আর হয়নি। সেই সময় আমাদের বড় দাদার বিয়ে লাগল। বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে, সেজন্য কলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের বেশ একটা বড় জমায়েত হল। যেদিন কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনে সারা দেশে ভোট নেওয়া হচ্ছে সেই দিনই বিকালে বাবা উডবার্ন পার্কের সাউথ ক্লাবের মাঠে বিয়ের চা-পার্টি দিচ্ছেন। রাঙাকাকাবাবুও আছেন। একে-একে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ফলাফল জানা যাচ্ছে হয় টেলিগ্রাম বা প্রেস মারফত—দৌড়ে এসে কেউ-না-কেউ খবরটা দিয়ে যাচ্ছেন। সে কী উত্তেজনা। প্রথমটা প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র মনে হচ্ছিল, ভোট প্রায় সমান-সমান চলছিল।

রাঙাকাকাবাবু চা খাচ্ছেন আর শান্তভাবে হিসেব করে দেখছেন, ভোটের ধারা সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে নিজের মন্তব্য করছেন। ক্রমে এটা বোঝা গেল যে, রাঙাকাকাবাবুর দিকের পাল্লাটাই ভারী। চা-পার্টি শেষ হবার পর রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর অফিসঘরে গিয়ে বসলেন। বাড়ির ছোটবড় সকলেই আমরা তাঁকে ঘিরে রইলাম। শেষের ফলাফলগুলো তখন আসছে। রাঙাকাকাবাবু ক্রমাগতই টেলিফোনে কথা বলছেন। এই সূত্রে একটা কথা আমার মনে গেঁথে আছে। প্রত্যেক বারই বলছেন "আমরা জিতছি" বা "আমরা জিতব", একবারও ভুলে বলছেন না যে "আমি জিতছি"। এই সামান্য কথার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়, সকলে মিলে একটা আদর্শের জন্য লড়াই।

আর-একটা কথাও মনে আছে। রাঙাকাকাবাবুর নির্বাচনের জয়ের খবরে বাড়ির ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সুরে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন। যেন এটা ছিল সর্বভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার একটা সাফল্য বা কৃতিত্ব। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা ও ধারণা সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাছাড়া গান্ধীজির একটা খুবই দুঃখজনক মন্তব্যের পরেও তিনি তাঁর মানসিক স্থৈর্য হারাননি। নির্বাচনের ফল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনো হীন আপসের বিরুদ্ধে রায় বলে মেনে নিয়ে তিনি আবার কংগ্রেসের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা

করেছিলেন।

সপ্তাহ-দুই পরে রাঙাকাকাবাবু ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কলকাতা ফেরবার পথে ট্রেনেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনে হয়, অসুখের গুরুত্বটা তিনি নিজেও ঠিক বুঝতে পারেননি। কলকাতায় ফিরে তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম করার চেষ্টা করলেন। দু-একদিন পরেই সফরে বের হবার কথা। ভাবলেন প্রোগ্রাম ঠিকই চলবে। কিন্তু একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সব কাজকর্ম বন্ধ হল, সফর বাতিল হল। নতুনকাকাবাবু ডাঃ সুনীল বসুকে রাঙাকাকাবাবুর স্বাস্থ্য নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হতে কখনও দেখিনি। ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ মণি দে-র মতো বড়-বড় ডাক্তার প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। রাঙাকাকাবাবু গোঁ ধরে বসলেন, যাই হোক না কেন, মার্চ মাসের প্রথমে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁকে যেতেই হবে। ডাক্তাররা বললেন, তিনি যদি ডাক্তারদের সব নির্দেশ না মেনে চলেন তাহলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যাওয়ার আশাও তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং ওয়ার্ধায় বসবার কথা। ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং-এ যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। রাঙাকাকাবাবু কমিটির মীটিং পেছিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। উত্তরে কমিটির প্রায় সব সদস্যই পদত্যাগ করে বসলেন। চারদিক থেকে নানা রকম বিপদ যেন রাঙাকাকাবাবুকে চেপে ধরল। তাঁর অসুখ নিয়ে কেবল ডাক্তাররাই নয়, বাড়ির সকলেই খুবই শঙ্কিত হয়ে ছিলেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তাঁকে আবার বেশ একটা বড় রকমের রাজনৈতিক লড়াইও লড়তে হচ্ছিল। রাঙাকাকাবাবু নিজেই পরে লিখেছিলেন যে, জীবনে তিনি অনেক ভুগেছেন কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় এক মাস তিনি যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, সেরকম কষ্ট জীবনে পাননি। রোগ নির্ণয় করতে ডাক্তারদের অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ উপসর্গগুলি ছিল অদ্ভুত ধরনের। জ্বর আসে যায় কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। রাঙাকাকাবাবুর কাছে শুনেছি, দুই ফুসফুসেই নাকি এক মারাত্মক রকমের নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং রাঙাকাকাবাবু সেযাত্রায় রক্ষা পাবেন কিনা সেবিষয়ে ডাক্তারদের বেশ সন্দেহ ছিল।

যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু ত্রিপুরী যাবেনই। নতুনকাকাবাবু দুজন সহকারী ডাক্তার নিয়ে সঙ্গে যাবেন, বাড়ির আরও অনেকে সঙ্গে থাকবেন। আমি ত্রিপুরী যাইনি, সেখানকার সব ঘটনার কথা বাবা মা ও অন্যান্যদের কাছে পরে শুনেছিলাম। বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তো অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে দিয়ে যাওয়া হল। রাঙাকাকাবাবু যখন ত্রিপুরীর সভাপতির ক্যাম্পে পৌঁছলেন তখন তাঁর জ্বর ১০৩ ডিগ্রি। কংগ্রেস ক্যাম্পের ডাক্তাররা তাঁর অবস্থা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। শুনেছি তাঁরা নাকি বলেছিলেন, তাঁকে জব্বলপুরের ভাল হাসপাতালে রাখা হোক, ক্যাম্পে রাখাটা নিরাপদ নয়। রোগী নিজে কিন্তু ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অনেক জ্বর নিয়েও রাঙাকাকাবাবু অ্যাম্বুলেন্সে চেপে মণ্ডপে গিয়ে বিষয়-নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ফলে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয়। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। বাবা তাঁর অভিভাষণ পড়েছিলেন। শুনেছি ক্যাম্পে শুয়ে-শুয়ে তিনি মাইক্রোফোনে বাবার গলা শোনার অপেক্ষায় থাকতেন। মাঝে-মাঝে বলে উঠতেন, ঐ শোনো, মেজদা বলছেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের এমন একটি প্রস্তাব পাস হল যাতে করে সভাপতির হাত-পা বেঁধে

দেওয়া হয় বলা যেতে পারে। যাঁদের রাঙাকাকাবাবু তাঁর সমর্থক বলে মনে করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য দিকে চলে যান কিংবা কোনো অজুহাত দেখিয়ে দু' নৌকোয় পা রেখে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ত্রিপুরীতে উপরতলার রাজনৈতিক মহলের ক্ষুদ্রতা রাঙাকাকাবাবুকে বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। তিনি পরে লেখেন, এতই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে সবকিছু ছেড়ে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা তাঁর আবার জেগেছিল। কিন্তু ঐ সাময়িক দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। ভারতের সব প্রান্তের অগণিত লোকের ভালবাসা ও সমর্থনের যথেষ্ট পরিচয় তিনি নানা ভাবে পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর মনের বল আবার ফিরে এসেছিল। ত্রিপুরী যে আসল ভারতবর্ষের প্রতিভূ নয় তা তিনি বুঝেছিলেন এবং আবার দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন।

ডাক্তারদের ও বাড়ির সকলের মত হল যে, ত্রিপুরীর পর রাঙাকাকাবাবুকে কলকাতায় না এনে অন্তত কিছু দিন অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা উচিত। কলকাতার পথে ধানবাদে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হল এবং আমাদের ন'কাকাবাবু সুধীরচন্দ্রের জামাডোবার বাংলোতে তোলা হল।

॥ ৩০ ॥

ত্রিপুরী কংগ্রেস ও তারপর ১৯৩৯-এর মে মাসে কলকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের মধ্যে যে সময়টুকু ছিল সেটা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরের দশকে দেশের ইতিহাসের গতি কী হবে, সেটা সেই সময়ই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বসুবাড়ির সকলকে যেটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা মূলত ছিল রাঙাকাকাবাবুর শারীরিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা। ন'কাকাবাবু সুধীরচন্দ্রের জামাডোবার বাড়িতে বিশ্রাম, সেবা ও চিকিৎসার ফলে তিনি ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

গান্ধীজি জামাডোবায় আসতে রাজি না হওয়ায় রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদ মেটাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপ আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশের ও বিদেশের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের ওইসব চিঠিপত্র নিয়ে আজকাল গবেষণা ও আলোচনা করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্দেশ ছিল, রাষ্ট্রপতিকে মহাত্মা গান্ধীজির মতানুসারে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করতে হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে গান্ধীজি কিছুতেই রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে সহযোগিতায় রাজি হলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল একবার জামাডোবায় এলেন, কথাবার্তাও হল, কিন্তু কাজ বিশেষ এগুল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের দিনকয় আগে গান্ধীজি কলকাতার কাছে সোদপুর আশ্রমে থাকবেন এবং সেই সময় দুজনের মধ্যে মুখোমুখি কথাবার্তা হবে। ওই সময় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাও কলকাতায় আসবেন। তাঁদেরও আলোচনার জন্য পাওয়া যাবে।

রাঙাকাকাবাবু বেশ সুস্থ হয়েই কলকাতায় ফিরলেন। নিজেই তিনি বলতেন, জীবনে কতবার কত রকম অসুখ যে তাঁর হয়েছে—তার হিসেব নেই। কিন্তু তাঁর সেরে ওঠার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। আবার দেখা গেল তাঁর বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল চেহারা।

বাবা তো রাঙাকাকাবাবুকে জামাডোবায় নামিয়ে চলে এসেছিলেন। ত্রিপুরীতে রাজনীতির যে চেহারা তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন সেটা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। গান্ধীজিকেও তিনি এ-বিষয়ে বেশ তীব্র ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। এই সূত্রে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর অন্তরের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলি। বাবার নিজের জীবনেও তো অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অনেক অন্যায়, অবিচার, অসদ্ব্যবহার, ঈর্ষাপ্রসূত শত্রুতা তিনি অবিচলিত চিত্তে সহ্য করেছেন। তা সে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মী, যে-দিক থেকেই আসুক না কেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে যা তিনি শান্তভাবে মুচকি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন, ভাই সুভাষের ক্ষেত্রে তা পারতেন না।

সুভাষের প্রতি কেউ কোনও অবিচার বা অন্যায় করেছে—এটা যদি তাঁর মনে গেঁথে যেত একবার, তিনি আর অবিচল থাকতে পারতেন না। তীব্র ভাষায় এবং জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ ও প্রতি-আক্রমণ করতেন। রাঙাকাকাবাবুর প্রতি তাঁর মনের ভাব সম্বন্ধে আমরা দু-একধরনের কথা শুনতাম।—এক, সুভাষকেই তিনি নিজের বড় ছেলের স্থান দিয়েছিলেন, এবং তাঁর দাবি ছিল অনস্বীকার্য। দুই, নিজের ছেলেদের চেয়েও তিনি সুভাষকে বেশি ভালবাসতেন। আমাদের কিন্তু এতে হিংসা হত না, গৌরবই হত।

পরে, যুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুর বিদেশের কার্যকলাপ নিয়ে অনেকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছিলেন, অনেকে তো কুৎসা রটনা করতেও ইতস্তত করেননি। এদের বাবা মনে-মনে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারেননি। আমার মনে হয়, এর কারণ ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা। শুধু তাই নয়, রাঙাকাকাবাবুর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রতিভা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের তুলনা তিনি সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখেননি। বড় ভাই ছোট ভাইকে বুক ফুলিয়ে নেতা বলে স্বীকার করছেন—এ নজির ইতিহাসে আর আছে কি না সন্দেহ!

১৯৩৯-এর মে মাসে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের দিনকয় আগে গান্ধীজি কলকাতায় এলেন এবং সোদপুরের আশ্রমে উঠলেন। গান্ধীজির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দীর্ঘ আলোচনা চলতে লাগল, কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্য। মনে আছে, রাঙাকাকাবাবু প্রায়ই খুব সকালে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আসতেন। পণ্ডিতজিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের 'ওয়াণ্ডারার' গাড়িতে করে সোদপুর রওনা দিতেন। এই 'ওয়াণ্ডারার' গাড়িটিকে অনেক ঐতিহাসিক কাজে লাগানো হয়েছে। নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের আগে ও পরে। আজ নেতাজী ভবনের মিউজিয়ামে গাড়িটি অন্যতম বড় আকর্ষণ।

গান্ধীজির সঙ্গে অনেক আলোচনা করেও কোনও মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। একদিন দেখি, রাঙাকাকাবাবু ও জওহরলাল একটু বেলায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ফিরে সামনের বারান্দায় গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। যেন গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে রাঙাকাকাবাবুই স্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন, "যাও, খাওয়া-দাওয়া করো, আফটার অল, ম্যান মাস্ট লিভ।"

জওহরলাল উত্তরে শুধু বললেন, "ইয়েস্, ম্যান মাস্ট লিভ।" তার পর দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যখন কংগ্রেসের সভা বসল, তখন সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত। রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, কিন্তু তিনি নিজেই প্রস্তাব

করলেন, সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হোন। কারণ, সভাপতি নিজেই এক বিতর্কের বিষয়। মনে আছে, সরোজিনী নাইডু অতি সুন্দর ইংরেজিতে এক আবেগময়ী বক্তৃতা করেছিলেন রাঙাকাকাবাবুকে সভাপতির পদে বহাল থাকতে অনুরোধ জানিয়ে। তাঁর বক্তৃতার পরে অনেকেরই মনে হয়েছিল, ওই ধরনের মর্মস্পর্শী আবেদনের পরে রাঙাকাকাবাবু কী করবেন!

রাঙাকাকাবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে ধীরে ও শান্তভাবে তাঁর বিবৃতি পড়লেন। যুক্তির ভিত্তিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি যখন ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে চলতে পারছেন না, সভাপতির পদ ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে-সঙ্গে সভায়, বিশেষ করে অভ্যাগতদের মধ্যে, তীব্র আলোড়ন শুরু হল।

নতুন সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করার পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারদিকে বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। নেতাদের সভার বাইরে বের করা ও যাঁর-যাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। রাঙাকাকাবাবু স্বেচ্ছাসেবকদের একটা ব্যূহ রচনা করতে বললেন, এবং উত্তেজিত জনতাকে বারবার বলতে লাগলেন যে, বাংলার আতিথেয়তার ঐতিহ্য যেন কোনও মতে ম্লান না হয়। তিনি নিজে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে এক-এক করে আগলে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আমরা ছোটরা কয়েকজন গোলমালের মধ্যে একটু দলছাড়া হয়ে পড়েছিলাম। পাশের একটা গেট দিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে একটা গাড়ি ধরে বেশ দেরিতে বাড়ি পৌঁছলাম। আমরা গুজব শুনেছিলাম যে, পণ্ডিত জওহরলাল নাকি ধস্তাধস্তির ফলে আঘাত পেয়েছেন। তিনি তো আবার আমাদের বাড়িতেই অতিথি। একটু ভয়ে-ভয়েই আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকতেই পণ্ডিতজির সেক্রেটারি উপাধ্যায়জির সঙ্গে দেখা। তিনি তো একগাল হেসে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলাম যে, পণ্ডিতজির কোনও আঘাত লাগেনি এবং সুস্থ শরীরেই আছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেলাম।

১৯৩৯-এর মে মাসে দেশের জাতীয় নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হল। গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ফিরে পেলেন। রাঙাকাকাবাবু একলা নিজের পথে চলতে আরম্ভ করলেন।

॥ ৩১ ॥

১৯৩৭ সালের কথা।

রাঙাকাকাবাবু জেল থেকে ছাড়া পাবার কিছুদিন পরে এলগিন রোডের বাড়িতে কংগ্রেসের ও আমাদের জনজীবনের নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু লোক একটা সভা করেন। সভায় স্থির হয় যে, সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড বলে একটা তহবিল খোলা হবে, এবং যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ হলে সেটা রাঙাকাকাবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে কলকাতায় একটা কংগ্রেস ভবন গড়ে তোলা। এইভাবেই মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা শুরু। ধীরে-ধীরে টাকা তোলার কাজ এগোতে থাকে। ১৯৩৮ সালে রাঙাকাকাবাবু যখন কংগ্রেসের সভাপতি এবং পৌরসভার অলডারম্যান, তখন কলকাতা

করপোরেশন এক প্রস্তাব পাশ করে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর উপর বেশ খানিকটা জমি রাঙাকাকাবাবুর হাতে তুলে দেন।

জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর রাঙাকাকাবাবু তাঁর মনের মতো একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার কাজে হাত দেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল খুবই বড় ও আধুনিক। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, আমাদের জাতীয় ও জনজীবনের সব দিক দিয়ে বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য নানা ব্যবস্থা ঐ ভবনে থাকবে। এক কথায় মহাজাতি সদন হবে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের পীঠস্থান। মনে আছে, যুদ্ধের সম্ভাবনা মনে রেখে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যে, বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার জন্য ভবনের নীচে বড় ধরনের আধুনিক 'এয়ার রেড সেলটার'ও থাকবে।

যথাসময়ে রাঙাকাকাবাবু তাঁর পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করলেন। তা ছাড়া, ভবনটির একটি নাম দিতে এবং বাড়িটির ভিত্তিস্থাপন করতে কবিকে অনুরোধ করলেন। ১৯৩৯-এর জানুয়ারির প্রথমেই রাঙাকাকাবাবু শান্তিনিকেতন যান এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনা দেন। তখনও ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন হয়নি। তীব্র লড়াইয়ের পর এবং গান্ধীজির অমতে রাঙাকাকাবাবু সভাপতি নির্বাচিত হবার পর অনেকেই ভাবতে লাগলেন ঐ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ কী করবেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিমধ্যেই নিজের মন স্থির করে ফেলেছেন। তিনি রাঙাকাকাবাবুকেই সোজাসুজি চিঠি লিখে জানালেন যে, কলকাতার কোনো এক বড় হলে তিনি রাঙাকাকাবাবুকে সংবর্ধনা দেবেন এবং রাষ্ট্রনায়ক রূপে বরণ করবেন। যে-কোনো কারণেই হোক, কবির সেই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কিন্তু ঐ উপলক্ষে রাঙাকাকাবাবুকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ যে "দেশনায়ক" অভিভাষণটি লিখেছিলেন, সেটি অমর হয়ে আছে।

যাই হোক, শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও অগাস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে তাঁরই নাম দেওয়া মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপন করতে রাজি হলেন। রাঙাকাকাবাবু তখন আর কংগ্রেসের সভাপতি নেই ; তিনি তখন বিরোধী পক্ষের নেতা। তবুও রবীন্দ্রনাথ এলেন।

আমরা বাড়ির প্রায় সকলেই দল বেঁধে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপনের মণ্ডপে পৌঁছলাম। মণ্ডপ ছাপিয়ে বাইরে বিরাট জনতা। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রকে একসঙ্গে দেখবার সুযোগ কে ছাড়তে চায়? ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্যে অনেক কষ্টে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। আমার খুব ইচ্ছা ছবি তোলা। কিন্তু তুলব কি করে? মণ্ডপের ভিতরে আলো কম, ফ্লাশ না হলে তো আমার ক্যামেরায় ছবি উঠবে না। আমাদের বন্ধু আনন্দবাজারের ফোটোগ্রাফার বীরেন সিংহকে বললাম, আপনি ফ্লাস দেবার ঠিক আগে আমাকে ইশারা করবেন, আমি সেই সময় আমার ক্যামেরার শাটার খুলে দেব। বীরেনবাবুর ফ্ল্যাশে আমার ক্যামেরায় এইভাবে কয়েকটি ঐতিহাসিক ছবি উঠে গেল।

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা আমাদের ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত—জাতি হিসাবে আমাদের আদর্শের ধারাবাহিকতা ও লক্ষ্য বোঝবার জন্য।

এর কিছুদিন আগে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক হয়েছিল। রাঙাকাকাবাবুর ডাকে দেশের নানা দিক থেকে বেশ কয়েকজন নেতা উডবার্ন পার্কের ছোটবাড়ির ছাদে মিলিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী একটা বিরোধী পক্ষ গড়ে তোলা। অনেকেই এসেছিলেন। যাঁকে বিশেষ করে মনে আছে তিনি

হলেন মাদ্রাজের বর্ষীয়ান নেতা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। বহুদিন আগে দেশবন্ধুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। এবার এলেন তাঁরই মন্ত্রশিষ্যকে শক্তি যোগাতে। তাঁকে দেখলেই মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগত। এই সভা অনুষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গেল। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতি ও ধারা বদলে গেল। স্বাভাবিক সময়ে বাক্‌বিতণ্ডা করা, দাবিদাওয়া নিয়ে পথে-ঘাটে আন্দোলন করা, বড় বড় প্রস্তাব পাশ করে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করা এক কথা ; আর যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রায় দু'বছর ধরে রাঙাকাকাবাবু ক্রমাগতই বলছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আসছে, সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে হবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তো সোজাসুজি বলে দিলেন যে, মাস ছয়েক পরে ইউরোপে যুদ্ধ বাধবে। হলও তাই। আরও বলেছিলেন যে, পরাধীন জাতির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ খুব একটা অবাঞ্ছিত কিছু নয়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পুরো সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করে দিতে হবে।

সত্যি-সত্যি যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর দেখলাম অনেকেই সুর পালটালেন। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু একই সুরে একই কথা—সংগ্রামের কথা—বলে চললেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর তিনি সারা ভারত পরিক্রমা করেছিলেন, বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিলেন, এবং লক্ষ-লক্ষ লোককে নিজের মনের কথা শুনিয়েছিলেন। ফলে তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, ভারতবর্ষ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে, প্রয়োজন হল যোগ্য নেতৃত্বের, যে-নেতৃত্ব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

১৯৩৯ সালের একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা আমি অনেক পরে, ১৯৬৬ সালে জানতে পারি। শুনতে পেলাম এক চীনা ভদ্রলোক, যিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতায় চীন সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন, কলকাতায় এসেছেন। নাম হুয়াও চাও চিন। নামটা যেন দলিলপত্রে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল। টেলিফোনে যোগাযোগ করে চৌরঙ্গির এক হোটেল থেকে তাঁকে নেতাজী ভবনে ধরে নিয়ে এলাম। নেতাজী ভবনে এসে তিনি খুব খুশি ; বললেন, এই ঘরেই তো ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। রাঙাকাকাবাবু তাঁকে গোপনে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, চীন সরকার তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে কিনা। দেশে থেকে তিনি স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে পারবেন না, কারণ ইংরেজ সরকার যে-কোনো অজুহাতে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তাঁকে বন্দী করে রাখবে। চীনা ভদ্রলোকটি খোঁজখবর করে রাঙাকাকাবাবুকে জানান যে, সৌজন্যমূলক যাত্রায় কোনো বাধা নেই, তিনি চীনে স্বাগত, কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ চীন সরকার তাঁকে দিতে পারবেন না, কারণ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের চুক্তি রয়েছে। ব্যাপারটা থেকে দুটি শিক্ষা পেলাম। এক, রাঙাকাকাবাবু অনেকদিন থেকেই বিদেশে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করবার কথা ভাবছিলেন। দুই, যে-কোনো সরকারের বিদেশনীতি নিজের জাতীয় স্বার্থে চালিত হয় ; রাজনৈতিক আদর্শগত প্রশ্ন সেখানে বড় নয়। ব্রিটিশ সরকারও রাঙাকাকাবাবুকে সেই সময় চীন যাবার জন্য পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করেছিল।

স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে সভা-সমিতিতে যাওয়া সাধারণত বাবা-মা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া উডবার্ন পার্কের বাড়িতে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করত, ছাত্রজীবনে হুজুগে মেতে যাওয়া তার সঙ্গে ঠিক খাপ খেত না। তবে এ-সবই সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার কথা। অনেকগুলো ব্যতিক্রম তো আমার জীবনেই ঘটেছে। স্কুলজীবনেই তো আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাস্তায় বেরিয়েছি। বাবা তখন জেলে, মা তো সব জেনেও কিছু বলেননি বা সোজাসুজি বারণও করেননি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় ১৯৩৭ সালে আমরা একটা বড়রকমের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম—আন্দামান থেকে আমাদের বিপ্লবী বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনবার দাবিতে। বাবা তখন বাঙলার আইনসভায় বিরোধীপক্ষের নেতা। বাবারই নেতৃত্বে টাউন-হলে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হবে। সব স্কুল-কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। কলেজগুলোর মধ্যে রাজভক্তদের দুটো শক্ত ঘাঁটি ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সি। এই দুই কলেজের কর্তৃপক্ষ যেমন ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন, ছাত্রদের বড় একটা অংশও ছিল রাজভক্তদের দলে ও জাতীয় আন্দোলনে অনাগ্রহী। সুতরাং ঐ দুই কলেজে ধর্মঘট সফল করবার জন্য আমরা উঠেপড়ে লাগলাম। সেই সময় একটা বড় সুবিধা ছিল যে ছাত্রদের সংগঠন ছিল একটাই এবং ঐক্যবদ্ধ। অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের মতামত ভিন্ন হলেও, যে-কোনো জাতীয় প্রশ্নে আমরা সকলে মিলে উঠেপড়ে লাগতাম।

সেন্ট জেভিয়ার্সে ধর্মঘট সফল হল এবং আমরা মিছিল করে প্রেসিডেন্সিতে গেলাম। আমাদের হানায় প্রেসিডেন্সির দরজাও খুলে গেল। অন্য কলেজের সব ছাত্র তো ছিলই। ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিল স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে ঘুরে টাউন-হলে যাবার চেষ্টা করল। স্ট্র্যাণ্ড রোডে ঘোড়সওয়ার এক বড় পুলিশের দল ঘোড়া ছুটিয়ে ভীষণ ভাবে বেটন চার্জ করল। আমরা যারা সামনের দিকে ছিলাম, স্ট্র্যাণ্ড রোডের লোহার রেলিং-এ নিজেদের সেঁটে রেখে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচালাম। যাঁরা মাঝামাঝি ছিলেন তাঁদের খুব আঘাত লাগল, আবার অনেককে পুলিশ টেনে টেনে ভ্যানে তুলল। সন্ধ্যার পর পুলিশের চোখ এড়িয়ে টাউনহলে হাজির হলাম। বাবাকে সভায় দূর থেকে দেখলাম। বেশি রাতে হেঁটে বাড়ি ফিরে যা হয়েছিল বাবাকে বললাম। শান্তভাবে শুনে মুচকে হেসে শুতে যেতে বললেন।

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তখন পর্যন্ত বাইরেকার কোনোরকম আন্দোলন থেকে দূরেই থাকত। মেডিকেলে ভর্তি হবার পর দেখলাম যে, সেখানে একটি নতুন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সে-সময়ে বাংলার মুসলিম লীগের রাজত্ব। সরকারের প্ররোচনায় ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন-কী ছাত্র ইউনিয়নের আইনকানুনেও ভাগাভাগির নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া মিলিটারি থেকে মনোনীত কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্র মেডিকেল কলেজে পড়তে আসত—নাম ছিল মিলিটারি মেডিকেলস্। ফলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের বেশ অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হত। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা সুবিধা ছিল। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চরিত্র এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের সুনাম অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের বিশ্বাস ও সমর্থন লাভ করতে আমাকে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া সব

সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আমরাও বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে চেষ্টা করতাম। ফলে, প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ও পরে সভাপতি নির্বাচনে আমি সব দিক থেকেই সমর্থন পেয়েছিলাম।

১৯৩৬ সালে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কার্শিয়ঙ-এ থাকার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করে। সেই সময় অবশ্য অন্য অনেকের মতো সবরকমের রাজনৈতিক বই, কাগজপত্র আমি পড়তাম। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ও দলের কার্যকলাপও আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতাম। মনে আছে, সেই সময় কিছুদিনের জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা আমার উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। সবকিছু দেখেশুনে বিচার করে একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতামত গড়ে তুলতে সময় লাগে। নানারকম লেখা পড়ে ও আলোচনা শুনে অপরিণত বয়সে আমি কখনও কখনও রাঙাকাকাবাবুর মত ও পথ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভীর চিন্তা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পর সব দ্বিধা ও সংশয় কেটে গেছে। আজও তো দেখি অনেকেই—তাদের মধ্যে বাঙালি ছাত্র ও যুবার সংখ্যা কম নয়—রাঙাকাকাবাবুর আদর্শ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি এবং তাঁর কার্যাবলীর যথেষ্ট মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আমি তখন সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাস করেছি। বাড়ির একজন রাঙাকাকাবাবুকে বললেন, আমি অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন নিজের পরিণত বয়সে দেখছি,—অন্য অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু সব ঠিক হয়ে যায়নি।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর একদিন রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন নিয়মিত মস্কো রেডিও থেকে প্রচারিত খবরাখবর শুনি। যদি কখনও আমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁর নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে, তারা কিছু বলে তাহলে আমি যেন নোট করে রাখি। উডবার্ন পার্কে একটা ভাল রেডিও ছিল, তাতে দূরদেশের প্রোগ্রাম ভাল শোনা যেত। আমি তো রাত জেগে ক্রমাগতই শুনতে লাগলাম। বেশি রাতে বাবা যখন কাজ সেরে উপরে উঠতেন, প্রায়ই দেখতেন যে রেডিও বেজে চলেছে আর আমি হয়তো রেডিওতে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে আছি। আমাকে তুলে দিয়ে হেসে বলতেন, এই রে, সুভাষের পাল্লায় পড়েছে! অনেক শুনেও আমি রাঙাকাকাবাবুকে বিশেষ কোনো খবর দিতে পারিনি। কারণ মস্কো রেডিও প্রধানত তাদের নিজেদের খবরই প্রচার করত, আর ক্রমাগতই স্টালিনের মহিমাকীর্তন শুনতে হত। রাঙাকাকাবাবু কেন আমাকে এ-কাজটি দিয়েছিলেন আমি জানি না। তবে আমার দিক থেকে একটা বড় লাভ হল যে নানা দেশের খবরাখবরে আমার বেশ একটা উৎসাহের ভাব জাগল ও বিদেশী রেডিও শোনার অভ্যাসটা স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসের সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দেবার পর থেকে রাঙাকাকাবাবু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনোরকম আপসের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে, ১৯৪০-এর মার্চ মাসে যখন বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হবে সেই সময় পাশেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তিনি আপসবিরোধী সম্মেলন ডাকবেন। বিহারের কৃষকনেতা স্বামী সহজানন্দ ঐ সম্মেলন সংগঠনের ভার নিলেন।

আমার খুব ইচ্ছা হল অন্তত একদিনের জন্য রামগড়ে যাই। মেডিকেল কলেজে তখন খুব কাজ। যাই হোক, মাকে চুপিচুপি বলে রেলভাড়া নিয়ে তো রাত্রের ট্রেনে রওনা দিলাম। সকালে রামগড়ে পৌঁছে দেখলাম ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। বাইরেও জল, প্রতিনিধিদের ক্যাম্পেও। রাঙাকাকাবাবুর ক্যাম্পে গিয়ে দেখি, পরিবেশ কর্দমাক্ত। তারই মধ্যে তিনি একটা চারপাইতে বসে কাগজপত্র দেখছেন। শুনলাম সবেমাত্র সব ক্যাম্প ঘুরে কে কেমন আছে দেখে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের ঘরে ফিরেছেন। আমাকে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, কী, রাতটা থাকা হবে নাকি? আমি আমতা-আমতা করে বললাম, না, রাত্রের ট্রেনে ফিরে যাব, কলেজ চলছে তো। 'হুঁ' বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার যা অবশিষ্ট আছে আমাকে জানালেন। আমার মনে হল, আমি রামগড়ে যে গেছি তাতে তিনি খুশি, কিন্তু কেবল একদিনের যাওয়াটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

পাশেই কংগ্রেসের অধিবেশন। হাতে কিছু সময় আছে দেখে কংগ্রেসের এলাকায় গেলাম। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন যেখানে হবার কথা সেটা ছিল বিরাট গোলাকার নিচু জমি, জল জমে সেটা একটা পুকুরে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং সেখানে সভা হতে পারেনি। খানিকটা দূরে উঁচু জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় মঞ্চ তৈরি করে সভা চলছিল। মৌলানা আজাদ বক্তৃতা করছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন কংগ্রেস তো ঠিকমতো হতেই পারল না। সংক্ষেপ করে সেই দুপুরেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল। বিকেলে যখন আপসবিরোধী সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন বসবে তখন বেশ সূর্যের আলো। বেশ জমজমাট সভা হল। আমি অভ্যাসমতো বেশ কিছু ছবি তুললাম।

আপসবিরোধী সম্মেলনের কর্মসূচী অনুযায়ী এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শুরু হল। সারা দেশে সুভাষ-অনুগামীদের ব্যাপক ধরপাকড় চলতে লাগল। তাঁর নিজের কী হবে আমাদের তখন তাই চিন্তা।

॥ ৩৩ ॥

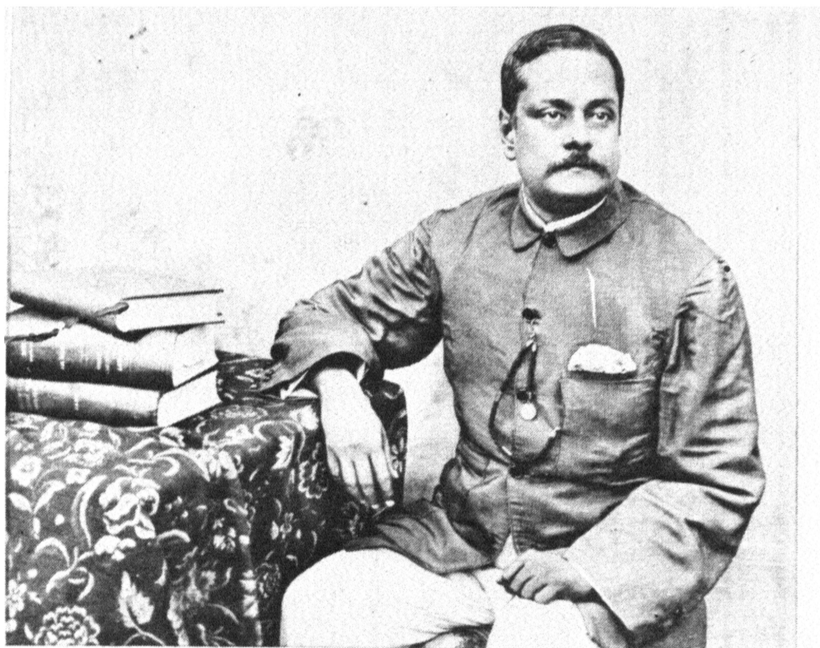
১৯৪০ সালটা ছিল নানা দিক দিয়ে বেশ গোলমেলে বছর। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর রাজনৈতিক জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটল যে, বসুবাড়ির সকলের উপরেই কোনো-না-কোনো ভাবে তার প্রভাব পড়ল। আগের বছরে কংগ্রেসের নেতারা 'শৃঙ্খলা' ভাঙবার দায়ে রাঙাকাকাবাবুকে দল থেকে প্রায় বের করে দিয়েছিলেন। তখন বাবা বাংলার বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা। ক্রমে ক্রমে বাবার সঙ্গেও কংগ্রেসের উপরতলার নেতাদের মতভেদ ও তিক্ততা বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪০-এর শেষের দিকে বাবাকেও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড 'শৃঙ্খলা' ভাঙার অভিযোগে দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু দিলে হবে কী, দলের অধিকাংশ সদস্যই বাবার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেস দল হিসাবেই কাজ চালিয়ে গেলেন। যেমন বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাই হোক, ভাগাভাগির ফলে বাইরে যেমন, বিধানসভাতেও তেমন দুটি কংগ্রেস দল হয়ে গেল। অন্যটির নেতা হলেন কিরণশঙ্কর রায়।

কিরণবাবু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুদিনের হৃদ্যতা। আমরা ছেলেবেলায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তাঁদের অনেক দেখেছি। তিরিশের দশকের প্রথমে যখন রাঙাকাকাবাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, তখন কিরণশঙ্কর ছিলেন সেক্রেটারি। কিরণবাবুর চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল। ওপর থেকে তাঁকে গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও তিনি খুব রসিক ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। শুনেছি তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য অনেকে তাঁকে বোস গ্রুপের চাণক্য বলে অভিহিত করতেন। শেষের দিকে রাজনীতির ডামাডোলে অন্য দলে চলে গেলেও বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক দেখে অনেকে অবাক হতেন। কিরণবাবুর অকালমৃত্যুর কিছুদিন আগেও রোগে শয্যাশায়ী পুরনো বন্ধুকে বাবা নানা কাজের মধ্যেও দেখতে যেতেন এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

বিধানসভায় বাবার দুজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে উডবার্ন পার্কে প্রায়ই দেখতে পেতাম। একজন তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, অন্যজন সন্তোষকুমার বসু। তুলসীবাবুর মতো সুপুরুষ বড় একটা দেখিনি, তবে তাঁর সম্বন্ধে যেটা বেশি মনে পড়ে, সেটা হল তাঁর শিষ্টাচার। তাঁর ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা ও ভদ্রতার যে পরিচয় পাওয়া যেত, তার তুলনা নেই। হয়তো বাবার জরুরি কোনো চিঠি নিয়ে আমি তাঁর বাড়িতে গেছি, তিনি নিজে বেরিয়ে এসে দরজার গোড়ায় পরদা তুলে ধরে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ না আমি ঢুকছি। ভাবটা হল যে, এই যুবকটি তাঁর বাড়িতে পদার্পণ করে তাঁকে কৃতার্থ করেছে। তুলসীবাবু হয়তো আমাদের বাড়িতে এসেছেন, বাবার হয়ে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে নেমেছি এবং তাঁরই কায়দায় পরদা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। তা কিন্তু হবে না, তিনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েই আছেন, আমি এগুলে তিনি এগুবেন। তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতার কথা তো বলাই বাহুল্য। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে তাঁর একটা বক্তৃতা বিধানসভায় শুনেছিলাম, আজও কানে বাজে।

সন্তোষকুমার বসু আমাদের সকলের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও খুব ভাল বক্তা ছিলেন, আর তাঁর গলার জোর ছিল খুব। ১৯৩৭-এ রাঙাকাকাবাবুর অভ্যর্থনাসভায় মাইক খারাপ হয়ে যায়। ডাক পড়ল সন্তোষবাবুর। তিনি শুধু-গলায় সকলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করে গেছেন। তাঁর কাছে লেখা রাঙাকাকাবাবুর অনেকগুলো চিঠি তিনি নেতাজী-ভবনের সংগ্রহশালায় দান করে গেছেন।

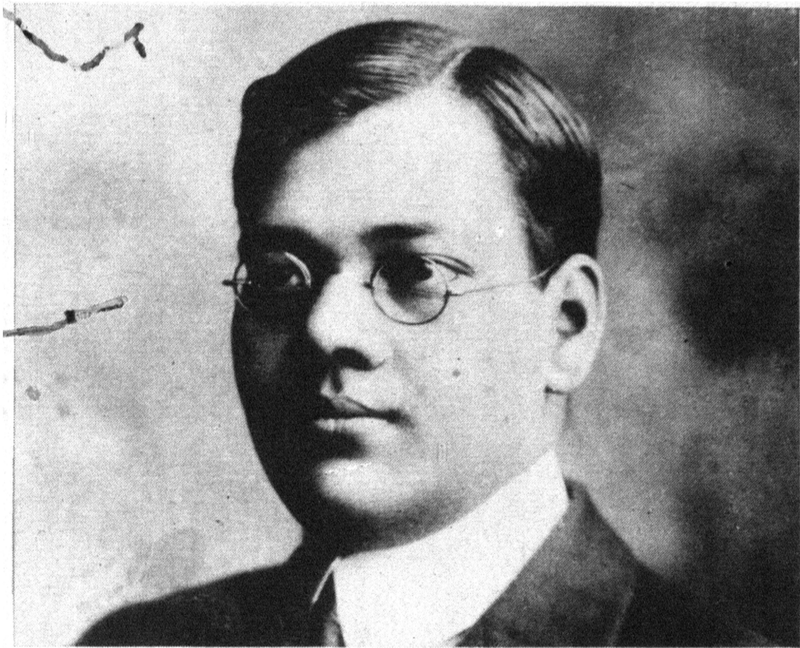
স্কুলজীবনে আমরা আমাদের জ্যাঠাবাবু সতীশচন্দ্র বসুকে দেখতাম কম। কারণ তিনি পাটনায় ব্যারিস্টারি করতেন। তিরিশের দশকের শেষের দিকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানকার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে আমরা তাঁকে প্রায় রোজই দেখতে পেতাম। উডবার্ন পার্কের দক্ষিণের বারান্দায় বাবার টেবিলের পাশে আর-একটি টেবিলে তিনি প্রায়ই এসে বসতেন। তন্ন-তন্ন করে খবরের কাগজ পড়া তাঁর একটা অভ্যাস ছিল, কোথায় কী হচ্ছে, সবকিছু তাঁর নখের ডগায় থাকত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাল জমত। প্রায় প্রত্যেককেই তিনি বেশ মজার-মজার নাম দিতেন আর ক্রমাগতই ছড়া কাটতেন। ছোটখাটো ফুটফুটে একটি মেয়ের নাম দিলেন 'বাঘ', বেশ বড়সড় একটি ছেলের নাম দিলেন 'ইঁদুর', ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে


দাদাভাই


মাজননী



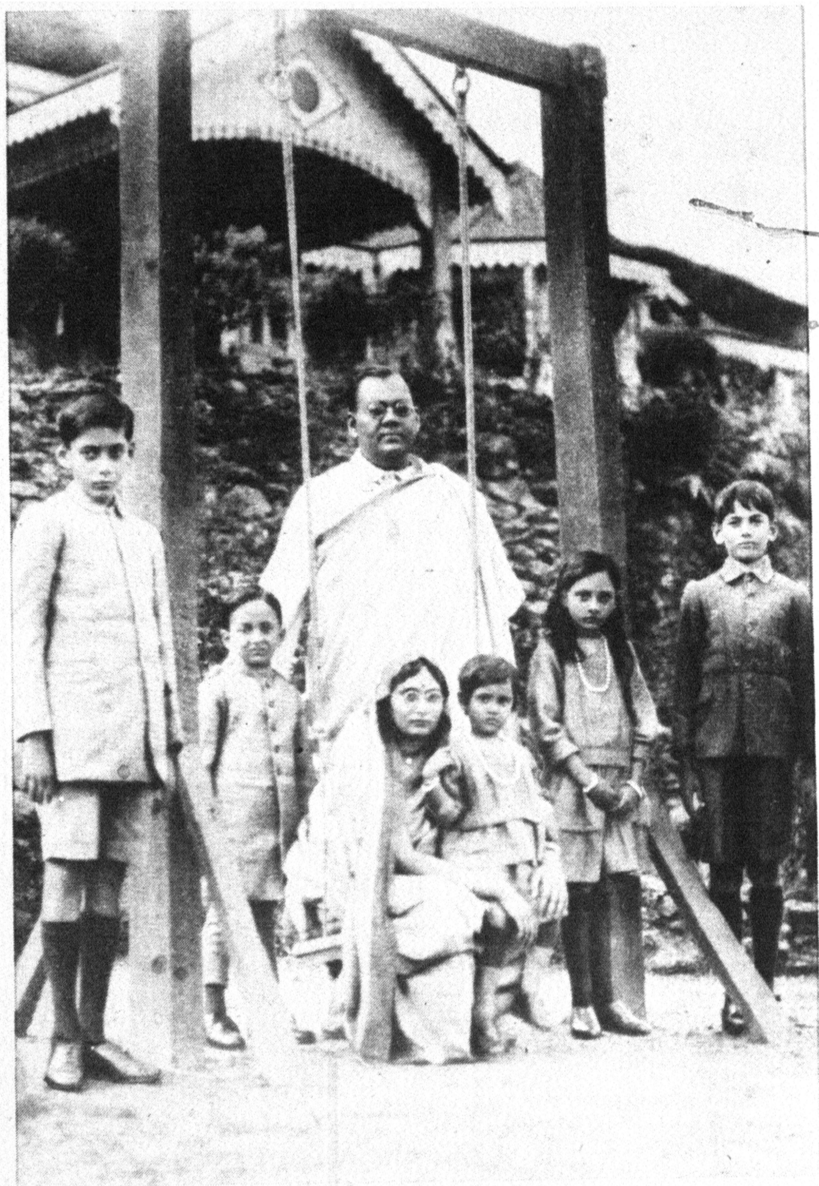
বিবাহের পর শরৎচন্দ্র ও বিভাবতীর সঙ্গে বিভাবতীর বাবা, মা ও দাদা



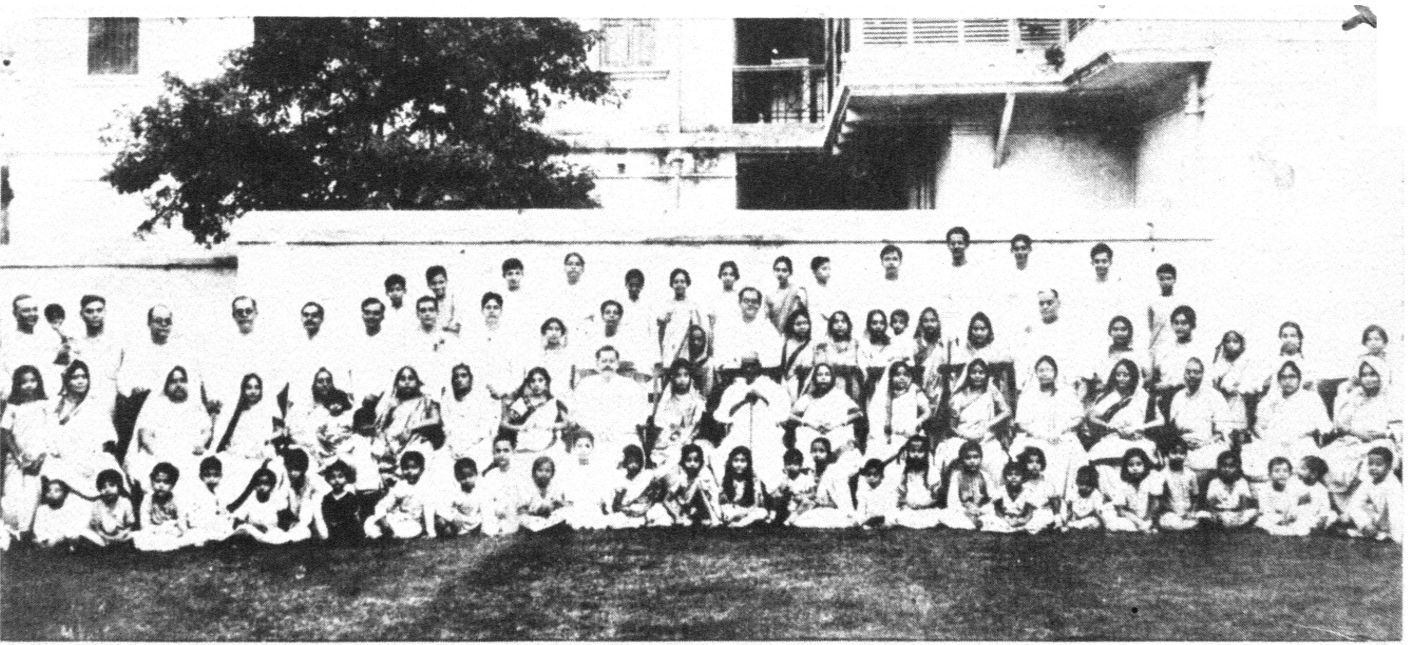
শরৎচন্দ্র



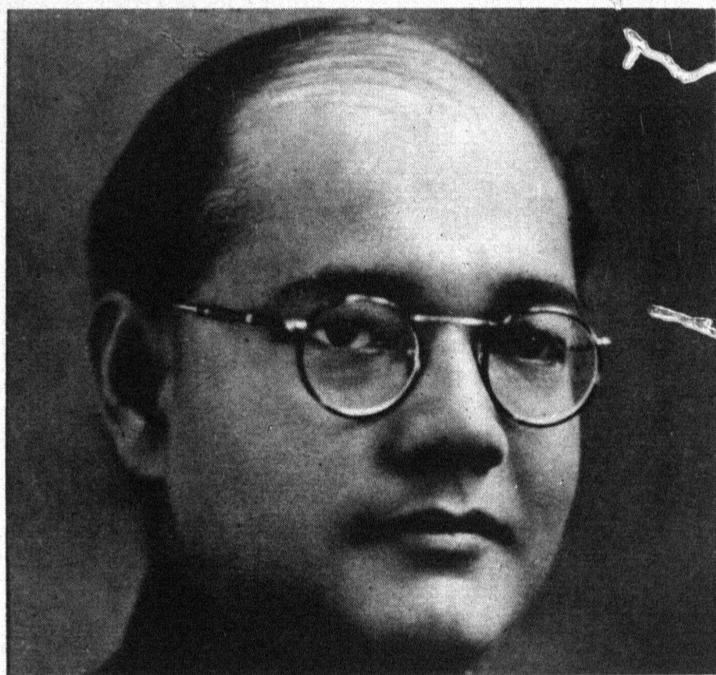
বিভাবতী



কার্সিয়াঙে সপরিবার শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের ডানদিকে লেখক



বসুবাড়ির চারপুরুষ



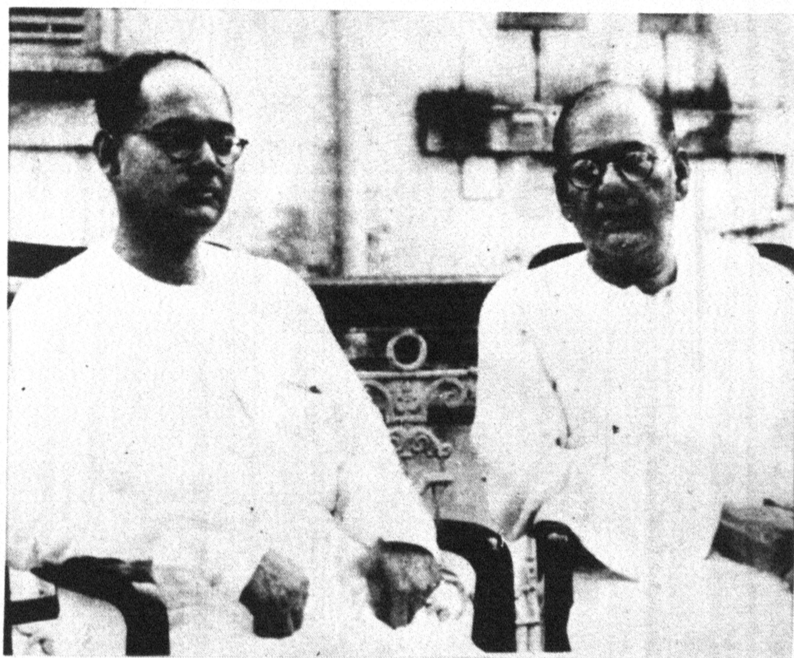
সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪



ভিয়েনাতে অপারেশনের পর সুভাষচন্দ্র



এলগিন রোডের বাড়ি



বসু ভ্রাতৃদ্বয়, শরৎ ও সুভাষ



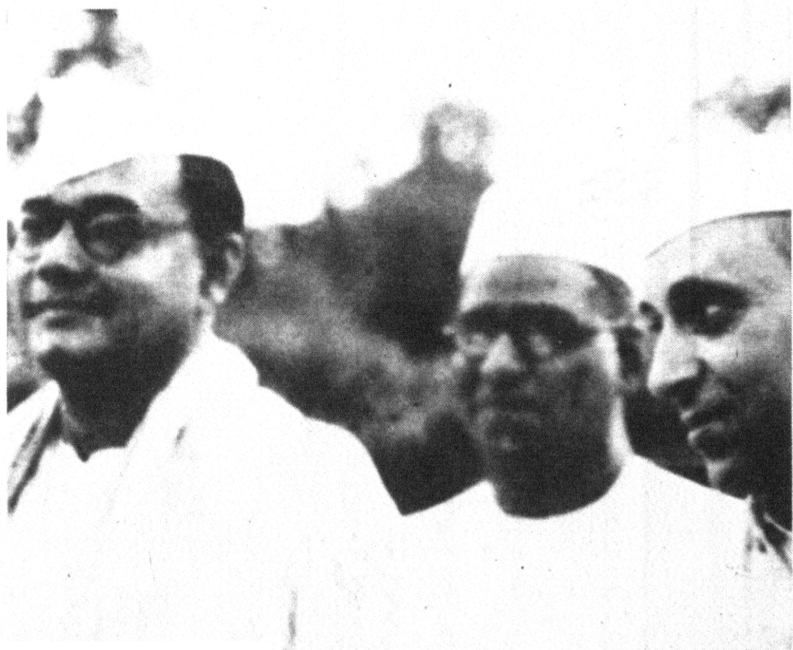
১নং উডবার্ণ পার্ক



উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে শরৎচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী ও মহাদেব দেশাই



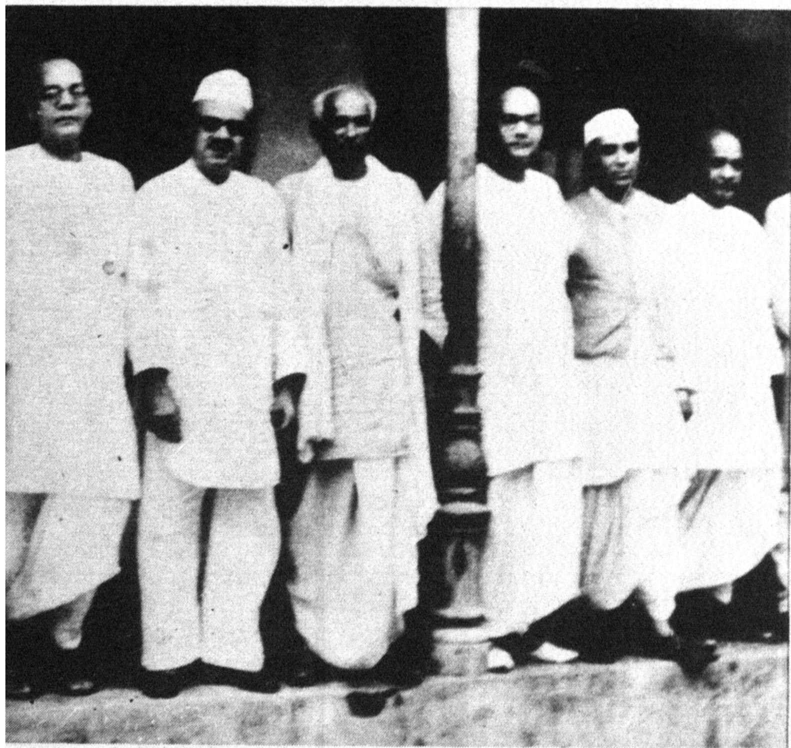
এমিলিয়ে ও সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭



জওহরলাল ও সুভাষ



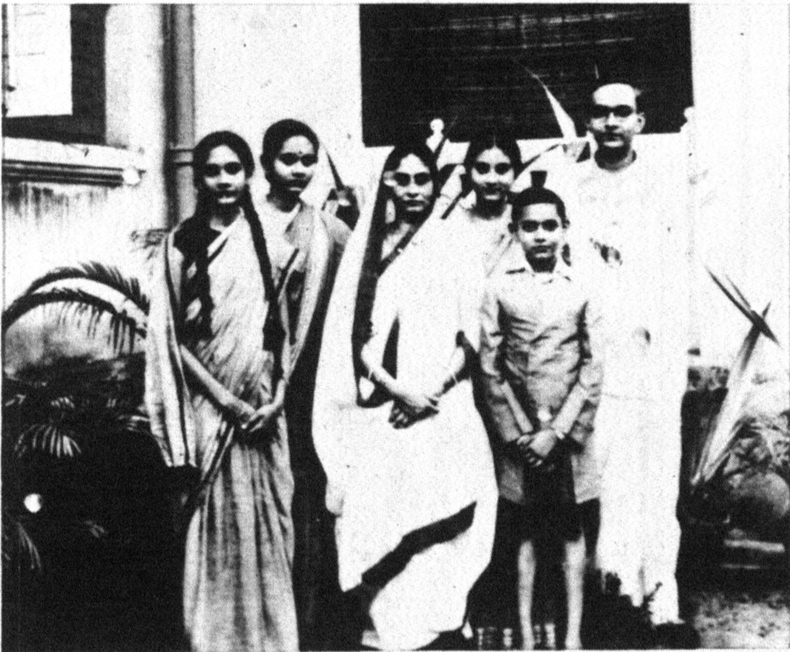
রাঙাকাকাবাবু ও ছেলে বৌদের সঙ্গে মাজননী



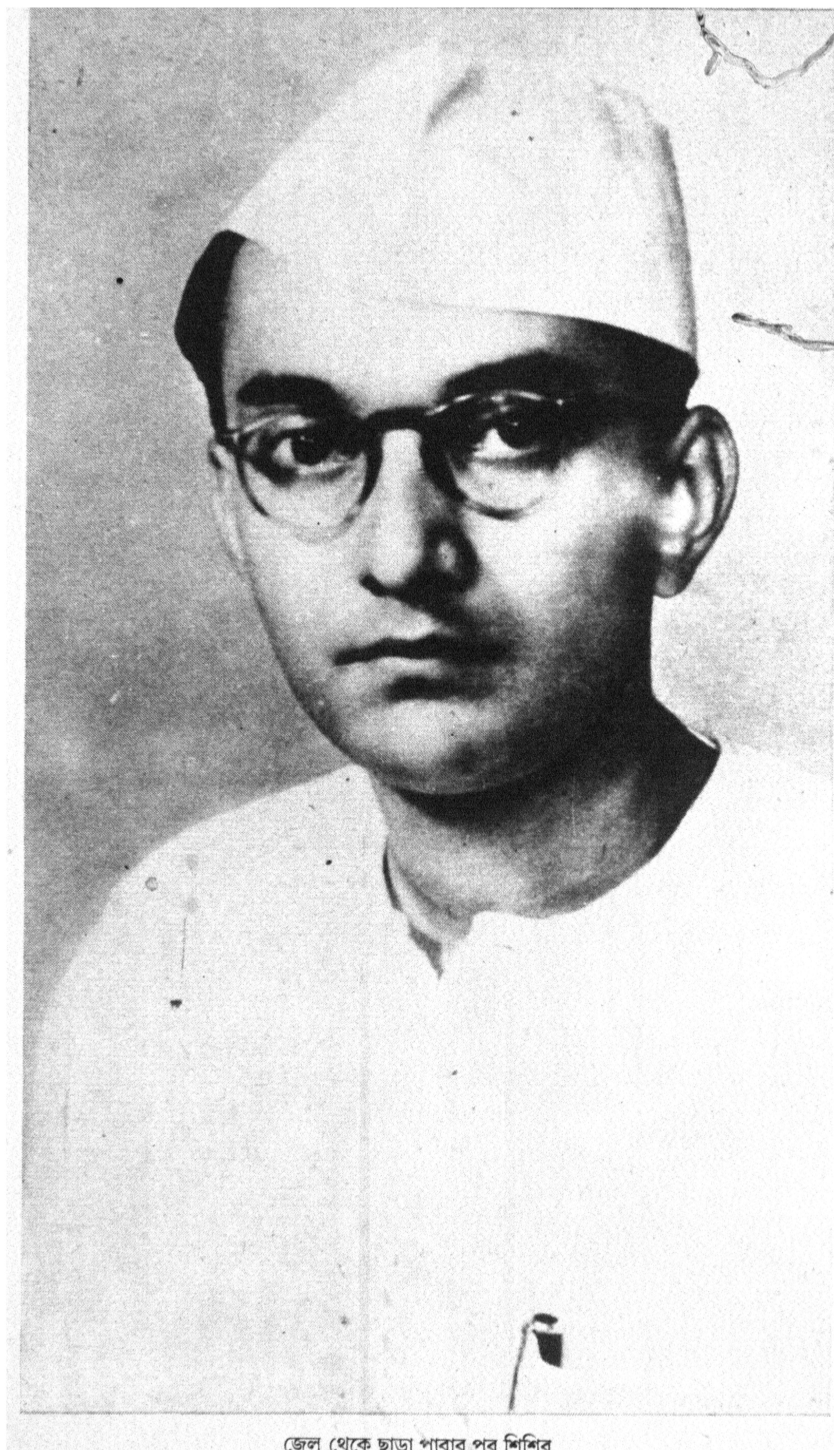
এলগিন রোডের বাড়িতে সমবেত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ১৯৩৮



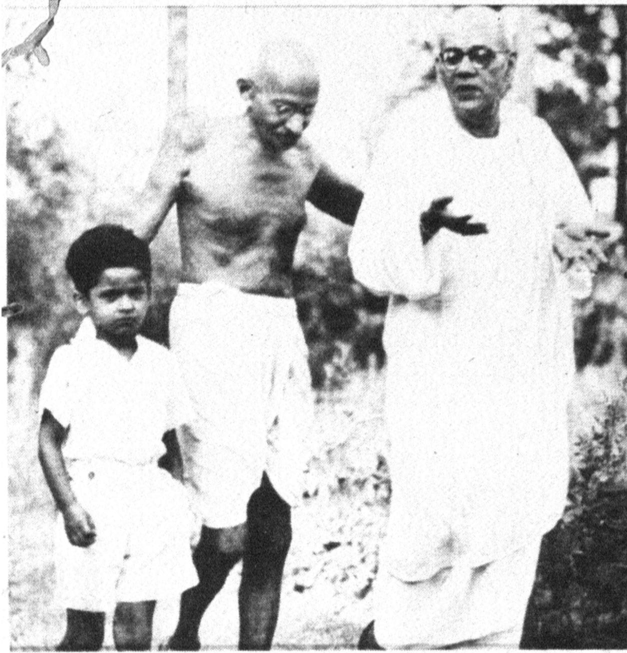
অন্তর্ধানের আগে সুভাষচন্দ্র



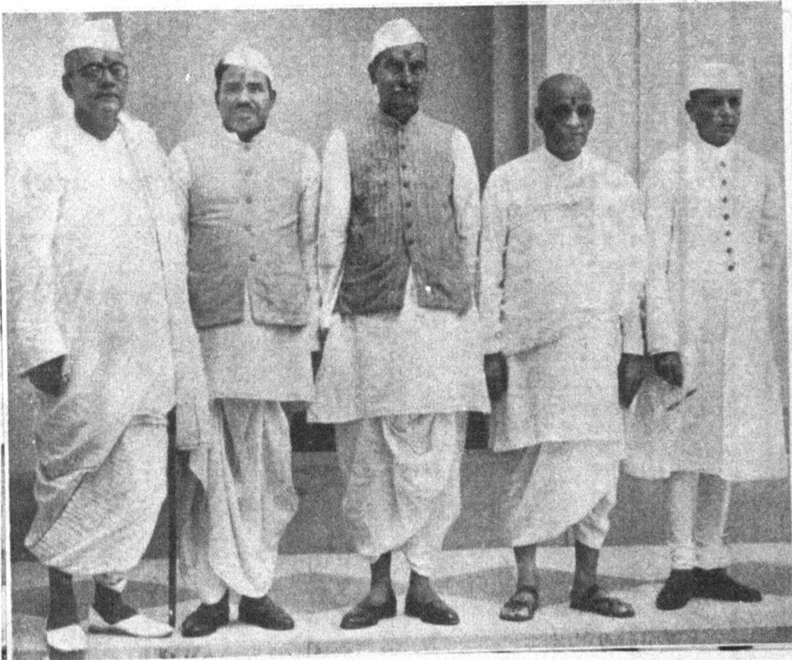
উডবার্ণ পার্কে অন্তরীণ লেখক, সঙ্গে মা ও ভাইবোনেরা



জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শিশির



সোদপুরে গান্ধীজী ও শরৎচন্দ্র



অন্তবর্তী সরকারের সদস্যাবৃন্দ ১৯৪৬ ডানদিকে প্রথম শরৎচন্দ্র বসু



নেপলস্-এ শরৎচন্দ্র ও শিশির ১৯৪৮



ভিয়েনাতে নেতাজী পত্নি এমিলিয়ে ও বিভাবতী



লেখকের তোলা বাবা-মার শেষ ছবি লণ্ডন ১৯৪৯



ভিয়েনাতে শিশির ও নেতাজীকন্যা অনিতা (১৯৫০)

মেয়েদের 'বুড়ি' বা তার কাছাকাছি নাম দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এদের বয়স দুশো, তিনশো না চারশো, এই নিয়ে ছোটদের সঙ্গে সরস ও সরব আলোচনা চালাতেন। বন্ধুবান্ধবরাও বাদ যেতেন না। যেমন, কোনো একজনের নাম ছিল অবনী, তার নাম দিলেন লর্ড অ্যালব্যানি।

১৯২১ সালে রাঙাকাকাবাবু যখন কেমব্রিজে বসে আই· সি· এস থেকে ইস্তফা দিলেন, জ্যাঠাবাবু তখন বিলেতে ছিলেন। জ্যাঠাবাবুকে ইংরেজ কর্তারা ধরেছিলেন রাঙাকাকাবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত বদলাবার চেষ্টা করতে। তিরিশের দশকের শেষে কলকাতায় ফেরবার পর রাঙাকাকাবাবুর ইচ্ছায় জ্যাঠাবাবু করপোরেশনের কাউন্সিলর হয়েছিলেন। পরে বিধানসভারও সভ্য হন।

যুদ্ধের সময় বসুবাড়িতে পর পর কয়েকটি মৃত্যু হয়। বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। জ্যাঠাবাবু এক নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ—যাঁকে সকলেই গণেশ বলে জানতেন—অকালে মারা যান।

১৯৪০ সালটি যতই এগোতে লাগল, দেশের রাজনীতিতে রাঙাকাকাবাবু ততই একঘরে হয়ে পড়তে লাগলেন। দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম, যাঁরা এখন নিজেদের খুব জোরগলায় বামপন্থী বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁরাও কিন্তু সেই সঙ্কটের দিনে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ছিলেন না। সংগ্রাম কিন্তু চলছিল। আপোস-বিরোধী সম্মেলনের পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, তিনি যে-কোনো সময় গ্রেপ্তার হতে পারেন। সারা ভারতে তাঁর সহকর্মীদের জেলে পুরে ইংরেজ সরকার রাঙাকাকাবাবুকে মাস তিনেক ছেড়ে রেখে দিল। ইতিমধ্যে তিনি একটা নতুন ধরনের আন্দোলনের ডাক দিলেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় করবার জন্য তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার নিদর্শন হিসাবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হলওয়েল মনুমেন্ট ছিল। জাতির প্রতি এই অপমানের প্রতিবাদে ও মনুমেন্টটি অপসারণের দাবিতে রাঙাকাকাবাবু সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা ঠিক করলেন। তাঁর এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। রাঙাকাকাবাবু ঘোষণা করলেন যে, প্রথম দিন ৩রা জুলাই তিনি সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেবেন। সেই দিনই দুপুরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

জুলাই থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সময় কয়েকবার বাড়ির অন্যদের সঙ্গে আমি জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাত। জেল-কর্মচারীদের সঙ্গে রসিকতা করে প্রায়ই বলতেন, "কী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কত দিন ?" তার পরেই বলতেন, "না, আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন, আমরা যারা বন্দী আছি বেরিয়ে যাব, অন্য ধরনের বন্দী আসবে।" তখন কেই বা জানত যে, সেই সময় তিনি তাঁর জীবনের কঠিনতম সংকল্প নিতে যাচ্ছেন!

যেমন মান্দালয় জেলে বহুদিন আগে করেছিলেন, এবারও রাঙাকাকাবাবু স্থির করলেন যে, রাজবন্দীরা জেলে দুর্গাপূজা করবেন। গত্যন্তর না দেখে সরকার রাজি হয়ে গেল। পুজোর সব যোগাড় অবশ্য বাড়ি থেকে দেওয়া হল। বিসর্জনের দিন বিকালে আমরা দল বেঁধে জেল গেট-এ উপস্থিত হলাম। লরি করে প্রতিমা জেল থেকে বের করে আনা হল।

লরির পেছন-পেছন রাঙাকাকাবাবু ও অন্য বন্দীরা গেট পর্যন্ত এলেন। প্রতিমা বিসর্জনের ভার বাইরে সমবেত যুবকেরা নিলেন। অভ্যাসমতো আমি ব্যাপারটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম।

গ্রেপ্তারের পর থেকেই তাঁর বিনা বিচারে বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে তিনি আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন, ঢাকা কেন্দ্র থেকে। দুর্গাপূজার পর থেকেই তিনি সরকারকে একটার পর একটা চিঠি লিখতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত কোনো সদুত্তর না পেয়ে তাদের জানালেন যে, যদি সরকার তাঁকে মুক্তি না দেয়, তাহলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। চিঠিগুলি ইতিহাসের পাতায় গেঁথে রাখার মতো। একটি চিঠিকে তো তিনি নিজেই তাঁর জীবনের বাণী বলে চিহ্নিত করে গেছেন।

॥ ৩৪ ॥

কিছু তথ্য আছে যার থেকে মনে হয় যে, ১৯৪০-এর প্রথম দিকে রাঙাকাকাবাবু দেশ ত্যাগ করার উপায় ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেই সময় কীর্‌তি-কিষান পার্টি বলে একটি দল ছিল। সেই দল সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছিল। তাছাড়া, ঐ অঞ্চলে রাঙাকাকাবাবুর নিজের দলের বিশ্বস্ত অনুগামীও বেশ কয়েকজন ছিলেন। এঁদের মধ্যে বেছে-বেছে কয়েকজনকে রাঙাকাকাবাবু তাঁর গোপন বিদেশ-যাত্রার আয়োজনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফল দেখে বোঝাই যায় যে, ঐ প্রাথমিক চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যে কোনো ব্যবস্থাই করা যায়নি সেটা পরের অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্যাপারটার আর একটা দিকও আছে। মার্চ মাসে আপস-বিরোধী সম্মেলনের পর থেকেই রাঙাকাকাবাবুর অনুগামী ও সহকর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। তার ওপর আবার তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ৩ জুলাই তিনি প্রথম সত্যাগ্রহী হবেন বলে ঘোষণাও করলেন। ঐ ঘোষণার পর সরকার আর চুপ করে থাকল না, সেই দিন সকালেই তাঁকে গ্রেপ্তার করল।

এখন কথা হল, রাঙাকাকাবাবু যখন অন্তর্হিত হওয়ার কথা ভাবছেন তখন তিনি কেন হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহের ডাক দিয়ে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিলেন? এর দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত, এটা ছিল হয়তো সরকার পক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার একটা উপায়। যাতে তারা মনে করে যে, তিনি যখন অন্য ধরনের প্রশ্ন নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁর অন্য কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী নেই। দ্বিতীয়ত, রাঙাকাকাবাবু হয়তো ভাবছিলেন যে, সরকার শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করবে না। এরকম চিন্তা করার যুক্তিও ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার গভর্নমেন্ট সভাসমিতি, মিছিল ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাঙাকাকাবাবু তা অমান্য করে নানা জায়গায় সভা করেন ও যুদ্ধবিরোধী প্রচার করেন। সরকার কিন্তু এটা চুপচাপ হজম করে নেয়। তারপর মে ও জুন মাসে ঢাকায় ও নাগপুরে বড় বড় সম্মেলন করে রাঙাকাকাবাবু খোলাখুলি ভাবে দেশবাসীকে সংগ্রামের পথে

আহ্বান করেন। এ-সব দেখেশুনেও সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এগোয়নি। তা ছাড়া হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন এমন একটা ব্যাপার, যাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশ সহানুভূতি ছিল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের কেউ কেউ তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

রাঙাকাকাবাবু যাই ভেবে থাকুন না, তিনি বন্দী হলেন। যুদ্ধের মধ্যে যখন সারা জগতে ভাঙাগড়া চলছে তখন জেলের মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না। তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, অদৃষ্টের বিধানে পৃথিবীর ঐ সংকটকালে দেশের মুক্তির জন্য তাঁকে দুঃসাহসিক কিছু করতে হবে। শত্রুপক্ষ তো একদিকে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে বন্দী করল, অন্যদিকে একটি জনসভায় রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দুটি মামলাও রুজু করল।

মামলার শুনানি আলিপুর কোর্টে হত। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কড়া পুলিস-পাহারায় রাঙাকাকাবাবুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। আমরা দল বেঁধে মামলা শুনতে যেতাম। রাঙাকাকাবাবুর পক্ষের উকিল পুলিসের রিপোর্টারদের জেরা করে বেশ নাস্তানাবুদ করতেন। আমাদের বেশ মজা লাগত। একবার বেশ জোরের সঙ্গে এবং যুক্তির ভিত্তিতে রাঙাকাকাবাবুর পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হল। ম্যাজিস্ট্রেট তো আইনমতো জামিন মঞ্জুর করলেন, কিন্তু তারপরেই বললেন, তিনি জামিন দিচ্ছেন কিন্তু সেটা কার্যকরী হবে কি না তা নিয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, অন্য এক আইনের বলে সরকার রাঙাকাকাবাবুকে বিনা-বিচারে ধরে রেখেছে। এই দু-মুখো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে রাঙাকাকাবাবু লড়াই আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রীয় বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও তিনি মুক্তি দাবি করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। বোঝা গেল, রাঙাকাকাবাবুর প্রতি গভর্নমেন্টের মনোভাব বেশ কঠোর।

বাবার শরীর সে-সময় ভাল যাচ্ছিল না। রাঙাকাকাবাবু জেলে গেলেই অসুস্থ হতেন কিন্তু বেরিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যে আবার বেশ সবল হয়ে উঠতেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকার সময় বাবার শরীর বেশ ভেঙে যায়। কিন্তু পরে অনেক চেষ্টা করেও বাবা আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাননি, যদিও কাজকর্ম তিনি পুরোদমে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন। অল্প বয়স থেকে তাঁর ডায়াবেটিস রোগ থাকায় এবং জেলে অসুখটা বেড়ে যাওয়ায় তিনি হয়তো কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। ছুটির সময় বাবা প্রায়ই স্বাস্থ্যকর কোনো জায়গায় কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। অবশ্য কাজ তাঁর পেছন-পেছন দৌড়ত। পুরোপুরি অবসর তিনি কখনোই পেতেন না। ১৯৪০-এর পুজোর ছুটিতে বাবা-মা দেরাদুন যাওয়া স্থির করলেন। তার আগে বাবা মাঝে মাঝে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মা'র কাছে শুনেছি, সেই সময় রাঙাকাকাবাবু বাবাকে বার বার বলতেন, যখন উত্তর ভারতে যাবেন তিনি যেন সীমান্ত প্রদেশের মিঞা আকবর শাহকে ডেকে পাঠান এবং রাশিয়ায় যেতে বলেন। আকবর শাহ ছিলেন রাঙাকাকাবাবুর বিশ্বস্ত অনুগামী, সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা। এর থেকে বোঝা যায় যে, রাঙাকাকাবাবুর ইচ্ছা ছিল নিজের কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকারীর মাধ্যমে বিদেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করা। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি জেলে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গী ছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর আগেই নরেনবাবুর মুক্তি পাওয়ার একটা

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। নরেনবাবুকে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, মুক্তির পর গোপনে বিদেশে (রাশিয়া ও ইউরোপে) চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে। ইউরোপের কয়েকজন রাষ্ট্রনায়কের নামে তিনি চিঠি দেবেন বলেছিলেন এবং সেগুলি কীভাবে লুকিয়ে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সূত্রে নরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনার সময় রাঙাকাকাবাবু আমার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন।

ঠিক কবে রাঙাকাকাবাবু স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিজেই বিদেশে পাড়ি দেবেন সেটা বলা শক্ত। এই কঠিন সিদ্ধান্তের দিকে যে তিনি কয়েক মাস ধরে এগোচ্ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, যেদিন তিনি মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, সেদিন তিনি চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এত বড় ঝুঁকি আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কেউ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। দেরাদুন থেকে ফেরার পর বাবা আবার রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে জেলে দেখা করতে আরম্ভ করলেন। একদিন তো বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। সরকারপক্ষের বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বার বার বলছেন, সুভাষবাবুকে এই মারাত্মক পথ থেকে নিবৃত্ত করুন। কারণ, গভর্নমেন্টের মনোভাব খুবই কঠোর এবং তারা কিছুতেই তাঁকে মুক্তি দেবে না। এদিকে বাবা জানেন যে, রাঙাকাকাবাবুর আমরণ অনশন মানে আমরণ অনশন। তাঁর দাবি স্বীকৃত না হলে কেউ তাঁকে ফেরাতে পারবে না। যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু কালীপুজোর দিন অনশন আরম্ভ করলেন। বাড়ির সকলেরই মনের যা অবস্থা—সেটা লিখে বোঝানো শক্ত।

দিন-সাতেক অনশন চলার পর হঠাৎ এক বিকেলে খবর এল যে, সরকার রাঙাকাকাবাবুকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়েছে। এ-ব্যাপারে ভারত ও বাংলার সরকারের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল, সেগুলি আমি সম্প্রতি দেখেছি। সেই সময়েই কিন্তু বাবা, রাঙাকাকাবাবু ও বসুবাড়ির এক অকৃত্রিম বন্ধু ভেতরের খবর রাঙাকাকাবাবুকে জানাতেন। তিনি হলেন তখনকার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নৃপেন ঘোষ। নৃপেনবাবু সরকার-ঘেঁষা সংবাদ সংস্থায় কাজ করতেন, কিন্তু কোনো গোপন খবর তাঁর গোচরে এলে তিনি বাবা বা রাঙাকাকাবাবুকে গোপনে জানিয়ে যেতেন। বাংলার গভর্নর ও মন্ত্রিসভা হঠাৎ বেশ ভয় পেয়ে গেল। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের রিপোর্ট বেশ খারাপ ছিল, এবং তাতে ইঙ্গিতও ছিল যে, অনশন চলার সময় জেলে বন্দীর মৃত্যু মোটেই অসম্ভব নয়। এদিকে ভারত সরকার কোনোমতেই তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি নয়। বাংলার সরকার তাঁকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারত সরকার ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে কলকাতা থেকে ইংরেজ গভর্নর লিখেছিলেন, কোনো চিন্তা কোরো না। আমরা সুভাষ বসুর সঙ্গে, বিড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলে, তাই করছি।

জেলের সুপারিনটেনডেন্ট রাঙাকাকাবাবুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বার বার রাঙাকাকাবাবুর কাছে এসে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানাতেন। বলতেন, আপনি বুঝছেন না কেন 'ইভন এ লাইভ ডংকি ইজ বেটার দ্যান এ ডেড লায়ন'! সুপারিনটেনডেন্টের হাতে ফলের রস খেয়েই রাঙাকাকাবাবু অনশন ভঙ্গ করেন।

রাঙাকাকাবাবুকে ছেড়ে দিয়েছে শুনেই আমরা এলগিন রোডের বাড়িতে ছুটলাম।

শুনলাম অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে দেখলাম নিজের ঘরে তিনি শুয়ে রয়েছেন। বেশ ফ্যাকাশে ও দুর্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে, কিন্তু চোখ আগের মতোই উজ্জ্বল। ওঁর গোঁফ জেলে থাকতেই দেখেছিলাম, দেখলাম সেই গোঁফ আরও ঘন হয়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িও গজিয়েছে।

অভ্যাসমতো আমি দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। কাছে যেতেই কোনো কথা না বলে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ।

॥ ৩৫ ॥

১৯৪০-এর ডিসেম্বরে আমার জীবনে যা ঘটল তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। যে-ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, তার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ব, সে-কথা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম ? ইতিহাস নাকি আমাদের না জানিয়েই তার কাজ করে যায়। আমার মতো খড়কুটোও স্রোতের টানে দুর্বার গতিতে ভেসে চলে। পরে মনে হয় কোথায় যেন পৌঁছে গেলাম।

যাঁরা ইতিহাসপুরুষ তাঁরা যে কেবল বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সবকিছু ঠিক করেন তা নয়, ইনটুইশন বা স্বভাবজাত একটা অনুভূতি তাঁদের থাকে। রাঙাকাকাবাবু ঐ স্বভাবজাত অনুভূতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, জগতের ইতিহাসে বড় বড় নেতারা অনেক সময়েই কেবল বুদ্ধির বিচারে নয়, ভিতর থেকে আসা অনুভূতির সাহায্যে অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে ঐসব সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বিচারে ঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আমার মনে হয় রাঙাকাকাবাবুও কেবল বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারাও চালিত হতেন।

অনেকে আজও জিজ্ঞাসা করেন আমাকেই বা তিনি ডেকে নিলেন কেন। এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কতটা সামগ্রিকভাবে বিচার করে বা কতটাই বা কেবল অনুভূতির ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে কাজের জন্য বেছে নিতেন কে জানে! হতে পারে, আমার অজান্তে অনেক দিন ধরে এর জন্য প্রস্তুতি চলছিল এবং সেজন্যই আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলাম। তবে প্রথমেই এটা বলে রাখি যে, একটা বিরাট ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের খুবই ছোট এবং অদৃশ্য যন্ত্র ছিলাম আমি।

বসুবাড়ির ছেলেমেয়েদের জীবন যে গতানুগতিক ছিল তা ঠিক বলা যায় না। দেশে তখন একটা সর্বাত্মক সংগ্রাম চলছে, আদর্শবাদের ঝড় সারা দেশটাকে তোলপাড় করছে। বাড়ির দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই সংগ্রামের অংশীদার। এ সব-কিছুর খানিকটা ছোঁয়া তো আমাদের গায়ে লাগবেই। ১৯৪০-এর আগেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানাভাবে কমবেশি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন বা গণ-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির বাইরেও আমরা দেখতে পেতাম, দেশের হাজার হাজার লোক—নারী পুরুষ কিশোর ছাত্র—দেশের কাজে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছেন। কত ছেলেমেয়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। জেলে গিয়েছেন। চোখের সামনেই তো কতজনকে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দেখলাম। এসবের প্রভাব সামগ্রিকভাবে আমাদের ওপর পড়তে

বাধ্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যে একইরকম হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার সমসাময়িক অনেক ছাত্র ও যুবককে তো দেখেছি, নানা যুক্তি বা অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জাতীয় সংগ্রামের স্রোত থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতেন।

যাই হোক, আমার জীবনের গতি সাধারণ অর্থে গতানুগতিক না হলেও সেই সময় পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যেটা সত্যিই অসাধারণ বলা যায়। অসাধারণ বলতে আমি বলছি এমন একটা কিছু যেটা জীবনটাকে ওলটপালট করে দেয় এবং এক নতুনপথে চালিত করে। রাঙাকাকাবাবু তাঁর বিরাট পরিকল্পনায় একটা ছোট্ট কাজের ভার দিয়ে আমার জীবনে সেই অসাধারণত্ব এনে দিলেন।

ব্যাপারটা শুরু হল খুবই সহজভাবে। রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত পরিচারক করুণা একটা ছুটির দিনে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে বলে গেল 'কাকাবাবু' দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। বাড়ির কাউকে দিয়ে তো বলাতে পারতেন বা টেলিফোনে ডাকতে পারতেন। আমার মা প্রায় রোজই রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। মা আমাকে ইতিমধ্যেই বলেছিলেন যে, রাঙাকাকাবাবু আমার দিনের রুটিন সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমি কখন কলেজে যাই, কখন ফিরি, পড়াশুনার চাপ খুব বেশি কিনা। কলেজের পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি কিনা, সপ্তাহের কোন্ দিনটা হালকা থাকে, ইত্যাদি। মাকে যখন এত কথাই আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন, মাকেই তো বলে দিতে পারতেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

আমি বেলা তিনটে নাগাদ এলগিন রোডের বাড়িতে হাজির হলাম। কেন তিনি আমাকে ডেকেছেন এ-বিষয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। আমাকে তিনি কী আর এমন কথা বলবেন! তবে তাঁর ঘরে ঢুকতেই মনে হল তিনি যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন, ঘরে আর কেউ নেই। স্নান-খাওয়া সেরে তাঁকে বেশ স্নিগ্ধ ও শান্ত দেখাচ্ছিল, যদিও একটু ফ্যাকাসে ও ক্লান্তির ভাবও ছিল। আমি তখনও পর্যন্ত বাবা বা রাঙাকাকাবাবুর সামনে একলা পড়ে গেলে একটু ঘাবড়ে যেতাম, কী জানি যদি কথাবার্তা চালাতে হয়। রাঙাকাকাবাবু যে আমাকে 'সাইলেন্ট বয়' নাম দিয়েছিলেন সেটা খুবই যথার্থ ছিল। দূর থেকে তাঁর সঙ্গে হাসি-বিনিময় এবং দু-একটা হ্যাঁ, না, পারি, পারি না, ভাল, মন্দ নয়, হতে পারে—এই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে, বিশেষ করে রাঙাকাকাবাবু বা বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তার ধরন।

বালিশে ঠেসান দিয়ে তিনি খাটে বসে ছিলেন। পাশেই দাদাভাইয়ের পুরনো জমকালো খাট। অভ্যাসমতো আমি দাদাভাইয়ের খাটে বসলাম। তিনি ইশারা করে আমাকে ঘুরে আসতে বললেন এবং তাঁর খাটে তাঁর ডানদিকে হাত চাপড়ে বললেন, এসো, এখানে বোসো। আহ্বানটা ছিল খুবই সহজ ও অন্তরঙ্গ, হুকুম নয়। কিন্তু আমার নাড়ির গতি তো বেড়ে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কী জানি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি নাকি, বকুনি-টকুনি কপালে নেই তো!

শান্ত ও সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে অল্প কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমিও শান্ত হয়ে গেলাম, নাড়ির গতি স্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁর চোখ ও চাহনি নিয়ে পরে কত কথাই না শুনেছি, ঐ চোখের টানে কত লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কত আমির ফকির হয়েছেন, কত সংসারী সর্বত্যাগী হয়েছেন।

বললেন, আমার একটা কাজ করতে পারবে ?

তখন তো ভেবে দেখার সময় পাইনি। গত চল্লিশ বছর ধরে তো বারবার ঐ পাঁচটি কথা নিজেকে বারবার শুনিয়েছি। কত কথা যেন ঐ কয়টি কথার মধ্যে আছে। তাঁর কাজ আমি করব! তিনি নিশ্চয়ই এমন-কিছু আদেশ করবেন না যেটা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে এ-প্রশ্ন কেন ? কখনও কখনও মনে হয়েছে যেন একটা অনুরোধের সুর ঐ প্রশ্নের মধ্যে ছিল। আসলে কিন্তু তা নয়, আসলে ছিল প্রাণের ডাক। এমন করে তো আগে তিনি কখনও আমাকে কিছু বলেননি। মনে আছে, বহুদিন আগে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে একদিন আমাকে, একটা ছোট কাজ দিয়েছিলেন—কোথায় যেন গাড়ি পাঠাতে হবে। আমি ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত থাকায় কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘরে এসে মুখ ভার করে বেশ জোর গলায় আমাকে বলেছিলেন, একটা কাজ বললাম করতে পারলে না! এই তো কদিন আগেই মুক্তির পরের দিন বিলেতে আমার এক দাদার কাছে একটা টেলিগ্রামের খসড়া করতে বললেন। একে আমার ইংরেজি জ্ঞান কম, তার উপর তাঁর যা বলার ইচ্ছা সেটা যদি আমার খসড়ায় প্রকাশ না পায়—এই ভেবে আমি গড়িমসি করছিলাম। খসড়া তৈরি হচ্ছে না দেখে আমাকে তো বেশ বকুনির সুরে বললেন, একটা টেলিগ্রামের খসড়াও করে উঠতে পারছ না! নিজের অক্ষমতায় আমি বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম।

পরে বুঝেছিলাম যে, সেইদিন যে 'আমার একটা কাজ'-এর কথা তিনি বললেন সেটা সম্পূর্ণ এক নতুন অর্থে। একটা কাজের ভার দিয়ে নিয়তি সুভাষচন্দ্র বসুকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা ছিল একান্তই তাঁর। তবে সেই কর্মযজ্ঞের চূড়ান্ত মুহূর্তে আমাদের মতো কয়েকটি সাধারণ মানুষকে তিনি ডেকে নিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালে লাহোর ফোর্টে ইংরাজ সরকারের দুর্ধর্ষ অ্যাডিশনাল হোম সেক্রেটারি রিচার্ড টটেনহ্যাম আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, দেশত্যাগের প্রাক্কালে তোমার কাকার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠই ছিল, নয় কি ? উত্তরে আমি বলেছিলাম, যে-কোনো ভারতীয় পরিবারে কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই হয়ে থাকে। উত্তরটা ছিল ভুল। কী জানি কেন, ইংরেজ অফিসারটিরও উত্তরটি ঠিক মনঃপূত হয়নি। আসলে রাঙাকাকাবাবু ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে জীবনের জটিল যে-প্রান্তে পৌঁছেছিলেন সেখানে কাকা-ভাইপোর সম্পর্কটা হয়ে গিয়েছিল নিতান্তই গৌণ। শুরু হল এক নতুন সম্পর্ক, আত্মিক সহধর্মিতার সম্পর্ক। অতি সহজভাবে আমাকে যে-পথে তিনি ডাক দিলেন, সে-পথের শেষ যে আমি দেখব এমন কোনো প্রতিশ্রুতি সেদিন ছিল না।

॥ ৩৬ ॥

আমি তাঁর একটা 'কাজ' করতে পারব কিনা এই প্রশ্নের জবাব নানাভাবে দেওয়া যায়। আমি হয়তো বলতে পারতাম, হ্যাঁ, পারব, নিশ্চয়ই পারব। বলুন-না কী করতে হবে ? অথবা আমি বলতে পারতাম, চেষ্টা করে দেখতে পারি। অথবা বলা যেত, আগে কাজটা কী বলুন। না জানলে কী করে বলব ? আমি কিন্তু বিশেষ কিছু না বলে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে একটু আলতো মাথা নাড়লাম। রাঙাকাকাবাবু আমার প্রতিক্রিয়াটা নিশ্চয়ই লক্ষ

PROVINCE OF BENGAL

Act, 1939, First Schedule, Form

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registered number ... BLA 7769

Brief description of vehicle ... Wanderer Saloon Car

Name ... Mr. Sisir Kumar Bose s/o Mr. Sarat Chandra Bose

1, Woodburn Park, Elgin Rd. P.O., Calcutta

Transferred to

Signature of registering authority.

Wanderer গাড়ির মূল রেজিস্ট্রেশন

করলেন। বিচলিত না হয়ে একটু সময় নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে গেলেন।

'তুমি কেমন গাড়ি চালাতে পারো?'

আমি কেমন গাড়ি চালাতে পারি এর উত্তর আমার মতো মুখচোরা লাজুক কিশোরের পক্ষে দেওয়া শক্ত। অনেকেই জানতেন যে, আমি ছোট বয়স থেকেই গাড়ি চড়তে ও চালাতে ভালবাসি, প্রায়ই গাড়ি চালাই এবং ভালই চালাই। মা ও বাড়ির অন্যদের আমি এদিক-ওদিক নিয়ে যাই। গাড়ি-চালানোটা আমার কাছে ছিল একটা শখ ও আর্ট। গাড়ির কলকবজা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অল্প এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বেশি

উৎসাহ ছিল না। গাড়ির প্রতি আমার এই ঝোঁক দেখে কিছুদিন আগেই বাবা আমার নামে একটা গাড়ি কিনেছিলেন। জার্মান গাড়ি, নাম 'ওয়াণ্ডারার'—যোগ্য নাম বটে। ওয়াণ্ডারার গাড়িটাও যেন আমাকে পছন্দ করত। গাড়িটির গিয়ার-টিয়ারের ব্যবস্থা একটু আলাদা রকমের ছিল। ড্রাইভার বা অন্য কেউ চালালে ওয়াণ্ডারার গোলমাল করত। সেজন্য অন্য লোকের চালানো বাবার পছন্দ হত না, আমি হাতের কাছে থাকলে আমাকেই চালাতে বলতেন। আমার ছবি তোলার শখ দেখে বাবা পরে আমাকে একটার পর একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন। আমি আবার স্বভাবের দোষে একটার পর একটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার প্রতি বাবার এ-ধরনের দুর্বলতা দেখে কেউ-কেউ ঠাট্টা করে—হয়ত বা ঈর্ষার রেশও তার মধ্যে ছিল—আমাকে 'ফেভারিট সান অফ্ শরৎচন্দ্র বোস' বলতেন। আসলে কিন্তু বাবার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চাইনি। যা পেতাম, না চাইতেই পেতাম।

বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা যখন বন্দী, মা ওয়াণ্ডারার গাড়িটি বিক্রি করে দেন। কিনেছিলেন আমাদের বেশ পরিচিত এক বন্ধু। মুক্তি পাবার কিছুদিন পরে বাবার আর্থিক অবস্থা খানিকটা ভাল হলে আমি ঐতিহাসিক কারণে বাবাকে ফের গাড়িটি কিনে নিতে বলি। আবার ওয়াণ্ডারার গাড়ি আমার হেফাজতে ফিরে আসে।

ভাগ্যিস একটা গাড়ি ও ক্যামেরা হাতের কাছে থাকত। তা না হলে অনেক অমূল্য অভিজ্ঞতার স্বাদ আমি জীবনে পেতাম না।

আমি কেমন গাড়ি চালাতে পারি, এর জবাব আমি দিলাম বেশ চাপা গলায় একটু সলজ্জভাবে—এই একরকম ভালই পারি। তার পরেই প্রশ্ন এল—আমি কখনও দূরপাল্লায় গাড়ি চালিয়েছি কি না। জবাবে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, সে-রকম কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি যখন বললাম যে, দূরপাল্লায় গাড়ি আমি চালাইনি, রাঙাকাকাবাবু বিচলিত হলেন বলে মনে হল না।

প্রথম প্রশ্নটি যেন ছিল প্রস্তুতিপর্ব। পরে বুঝতে পারি যে ঐ কথাগুলির মধ্যে পরের ঘটনার মূল প্রশ্নগুলি সবই ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে প্রস্তুত করে নিয়েই তিনি আসল কথাটা পেড়ে ফেললেন। বললেন, একদিন রাত্রে তাঁকে গাড়ি করে বেশ কিছুদূর পৌঁছে দিতে হবে, কেউ কিন্তু জানবে না। 'পারবে?'

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, শেষ প্রশ্নটি নিশ্চয়ই আমার মনে তীব্র শিহরণ জাগিয়েছিল কিংবা আমি নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আসলে কিন্তু আমার তেমন কিছু হয়নি। আমার একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা দোষ বলে ধরে নেওয়া যায়, আবার গুণ বলেও। কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বা খবরে—সেটা দুঃখজনক হোক বা আনন্দের হোক—প্রথম পর্যায়ে আমার বাহ্যিক কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। আমি দুঃখে মুষড়ে পড়ি না আনন্দেও আত্মহারা হই না, বা হঠাৎ উত্তেজিত হই না। ব্যাপারটা যেন মনের গভীরে চলে যায়, বেশ কিছুদিন পরে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া আমি অনুভব করতে আরম্ভ করি। রাঙাকাকাবাবুর আকস্মিক প্রশ্নে আমি শান্তই ছিলাম।

আমি তাঁকে লুকিয়ে গাড়ি করে কোথাও নিয়ে চলে যাব, কেউ জানবে না! ব্যাপারটা বোধহয় আমার মস্তিষ্কে ঠিক ধরেনি। তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, যেটা আমি আগে ঠিক পারতাম না। একটু এগোলেন ; বললেন, "এ-বাড়িতে কেবল ইলা জানবে।" আরও বললেন, "ইলাকে আমি টেস্ট করে দেখেছি, সে পারবে।"

কিছুদিন পরে ইলাই আমাকে বলল যে, আমার সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং সে আমাকেই কাজের ভার দেওয়াটা সমর্থন করেছিল। এলগিন রোডের বাড়ির খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে ইলার সঙ্গেই আমার সম্পর্কটা ছিল সবচেয়ে নিকট এবং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা ছিল সহজ। সুতরাং ব্যাপারটা এইভাবে শুরু হওয়াতে আমরা দুজনেই খুশি হয়েছিলাম।

আমাকে সতর্ক করে দিয়ে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, একটা 'ফুল-প্রুফ' প্ল্যান আমাদের তৈরি করতে হবে যাতে কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না পারে। এই সব কথা মাথায় নিয়ে আমি ধীরেসুস্থে বাড়ি ফিরে এলাম। তিনতলায় নিজের ঘরে গিয়ে রাঙাকাকাবাবুর কথাগুলো মনে-মনে নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। বাস্তবিক তিনি কী করতে যাচ্ছেন পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। তবে এটা যে একটা সাধারণ রাজনৈতিক লুকোচুরির নয় সেটা বুঝতে দেরি হল না। আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যেন ব্যাপারটা খুঁটিয়ে ভেবে দেখে একটা প্ল্যান ছকে নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই থেকে শুরু হল রাতের পর রাত গোপনে কথাবার্তা বলা। প্রথম দিনের কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তিনি একটা অসাধ্য সাধন করলেন। আমার মুখচোরা স্বভাব ও আড়ষ্ট ভাব একেবারে দূর করে দিলেন। কী করে করলেন? আমার মনে হয়, তাঁর যে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এটা বুঝিয়ে দিয়ে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুললেন। একই উপায়ে দেশে ও বিদেশে তিনি কত লোকের আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন এবং আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের দিয়ে বড় বড় কাজ করিয়েছেন। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে এমন খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করি যে, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের এই নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গেও আমার আচরণের ধরনটা বদলে গেল। বাবার সঙ্গেও আমি নানা বিষয়ে খুব খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা ও মতবিনিময় আরম্ভ করলাম। যে-কাজে আমি জড়িয়ে পড়লাম, বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হতে না পারলে সে-কাজ করা সম্ভব ছিল না।

লুকিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার প্ল্যান ছাড়াও অন্য কতরকম প্রশ্নও আমার মাথায় ভিড় করে এল। প্রথমত আমি ভাবলাম, আমাকে রাঙাকাকাবাবু ডাকলেন কেন? আমার চেয়ে ভাল গাড়ি চালাতে পারে ও মোটরগাড়ির কলকব্জা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—এমন লোক তো পরিবারের মধ্যে আছে। আবার মনে হল, যদি বাড়ির সকলকে না জানিয়ে কিছু করতে হয়, বাইরের কোনো লোক দিয়ে কাজটা করানো ভাল নয় কি? আরও ভাবলাম, অন্যদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, বাবা-মাকে না বলেই আমাকে কাজটা করতে হবে নাকি? অনেক রাত পর্যন্ত চিন্তা করেও এসব প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব পেলাম না। শেষ পর্যন্ত নিজেকে বললাম, এ-সব নিয়ে আমার অত মাথা ঘামাবার কী আছে, রাঙাকাকাবাবু সামলাবেন। তার পর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কী করে তাঁকে নিয়ে সকলের অজান্তে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায় তার নানারকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা আরম্ভ করলাম। মেডিকেল কলেজের পাঠ্য, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ইত্যাদি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

॥ ৩৭ ॥

বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালাতে হলে কোন্ পথ ও দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে, স্বাভাবিকভাবে সেই চিন্তাই মাথায় আসে প্রথমে। কারণ বাড়ির লোকজনকে অন্ধকারে রাখাটাই সমস্যা। ছদ্মবেশ যত ভালই হোক, আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনও মূল্য নেই। বাড়ির কারও যদি একবার সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলেই মুশকিল্। মনে সন্দেহ জাগলে অনেকেই সেটা চেপে রাখতে পারেন না। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেন। রাঙাকাকাবাবুই আমাকে বলেছিলেন যে, এ-অবস্থায় পড়লে হয় প্ল্যানটা পুরোপুরি বদলাতে হয়, নয় যাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে তাঁকে ব্যাপারটা খানিকটা বলে দলে টেনে নিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করতে হয়। আর একটি উপায় হচ্ছে সন্দিহান ব্যক্তিটিকে কোনও অজুহাতে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া—যাতে আসল ঘটনাটি ঘটার সময় তিনি কাছাকাছি না থাকেন। এই ধরনের অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্ন রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বাড়ির ব্যাপারে ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

এলগিন রোডের বাড়িটা উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা ব্যারাকের মতো। মাঝখানে সারি দিয়ে ঘর, দুপাশে লম্বা খোলা বারান্দা। কোনও ঘর বা ভেতরের দালান বা উঠোন দিয়ে না গিয়ে বাড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। তিনটে সিঁড়ি। বাড়ির মাঝামাঝি একতলা থেকে চারতলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে পুরনো স্টাইলের ভাল কাঠের সিঁড়ি। দ্বিতীয়টি বাড়ির পেছনের দিকে দোতলা রান্নাবাড়ি থেকে নেমে গেছে। তৃতীয়টি এখন আর নেই। বাড়ির একেবারে দক্ষিণে একটি ছোট্ট চার-ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি ছিল। যদিও বাড়িটি একটি ব্রিজ দিয়ে রান্না-বাড়ির সঙ্গে লাগানো ছিল, সেটির একটা আলাদা সিঁড়িও ছিল। ছোট্ট বাড়িটির কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ায় পরে ওটি ভেঙে ফেলা হয়। যা হোক, কোনও ঘরের কাউকে ব্যস্ত না করে পূব বা পশ্চিমের লম্বা বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে তিনটে সিঁড়ির যে-কোনও একটায় পৌঁছনো বেশ সহজ ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার পথও তিনটি ছিল বলা যায়। একটা মেন গেট। বাড়ির সামনের দিকেই কোণ ঘেঁষে রাস্তার ওপরেই একটি ছোট দরজা ছিল—পশ্চিমের লম্বা বারান্দার শেষে। আর একটা পথ দরকার পড়লে করে নেওয়া যেত। বাড়ির পেছনের মাঠে সেজোকাকাবাবু সুরেশচন্দ্রের একটা কারখানা ছিল, তার ভেতর দিয়ে।

এত সুবিধে যখন আছে, পেছনের বারান্দা আছে, পাশের ছোট দরজা আছে, একটু ব্যবস্থা করলে যখন বাড়ির পেছন দিয়েও বেরোনো যায়, গেটের কথা কি কেউ ভাবে? আমিও ভাবিনি। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, রাঙাকাকাবাবুকে বোধহয় পশ্চিমের মানে পেছনের বারান্দা দিয়ে সোজা দক্ষিণে চলে যেতে হবে, তারপর রান্না-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার পেছনের বারান্দা দিয়ে উত্তর দিকে ফিরে এসে ছোট দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে। অথবা যদি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরোনো স্থির হয়, তাহলে পেছনের ছোট বাড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করে মাঠের দিকে যেতে হবে। রাস্তায় হাঁটার জন্য তো ছদ্মবেশ থাকবে। আমি গাড়ি নিয়ে এলগিন রোডেই খানিকটা এগিয়ে পোস্ট অফিসের কাছাকাছি ওঁর জন্য অপেক্ষা করব। কিংবা বাড়ির দক্ষিণদিক দিয়ে এলগিন লেনে এসে তিনি গাড়িতে উঠবেন। এই ধরনের প্ল্যান মাথায় করে আমি রাঙাকাকাবাবুর কাছে হাজির

হলাম। দেখা যাক তিনি কী বলেন।

"কী, ভেবে দেখেছ? কিছু প্ল্যান মাথায় এল?"

আমি যা বললাম, ধৈর্যের সঙ্গে তিনি শুনলেন। আমি যখন থামি, তিনি তাঁর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে কখনও আমার দিকে চেয়ে কখনও দেওয়ালে দৃষ্টি রেখে ভাবতে থাকেন। তারপর বললেন, "ভাবো, আরও ভাবো। একটু তাড়া আছে। বড়দিনের কাছাকাছি যে-কোনও দিন বেরিয়ে পড়তে হতে পারে।"

তিনি অন্য দিক থেকে একটা সঙ্কেত আশা করছেন। সেটা পেলেই যাত্রা শুরু করতে হবে।

রোজ-রোজ দরজা বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলা স্বাভাবিকভাবেই কারও কারও মনে সন্দেহ বা কৌতূহলের উদ্রেক করল। ইলা এবিষয়ে তাঁকে জানায়। রাঙাকাকাবাবু নিয়মিত রেডিও শুনতেন এবং যুদ্ধের গতি খুব মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করতেন। সেই সময় জার্মানরা ইংরেজদের বেশ নাস্তানাবুদ করছে। শুনে রাঙাকাকাবাবু খুব উৎফুল্ল হতেন, আমরাও হতাম। জেলে থাকতেও তিনি রেডিও শুনতেন, তাঁর সেলে রেডিও দিতে সরকারকে তিনি বাধ্য করেছিলেন। রাঙাকাকাবাবুরই প্রেরণায় দেশ-বিদেশের রেডিও শোনা আমারও নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যাঁরা কৌতূহলী, রাঙাকাকাবাবু তাঁদের বলে দিলেন যে, আমি বিদেশী স্টেশন ভাল ধরতে পারি, সেজন্য এ-ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য নেন। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁদের কৌতূহল মিটলেও সন্দেহ যায় না। এমনই একজন ছিলেন আমাদের পালানকাকা। প্রায়ই দেখতাম ঘরের সামনের দরজাটা একটু ঠেলে উঁকি মেরে দেখতেন, রাঙাকাকাবাবু আর আমি কী করছি। দেখে নিয়েই দরজাটা আবার টেনে দিতেন। পালানকাকা খুব সরল প্রকৃতির, কিন্তু বেশ মজার লোক ছিলেন। দাদাভাইয়ের একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে। বাবা-রাঙাকাকাবাবুর একমাত্র পিসিমার বিয়ে হয়েছিল আমাদেরই গ্রামের পাশে রাজপুরের এক ভাল পরিবারে। দাদাভাই কলকাতায় এলে বাবার পিসেমশাই প্রায়ই এলগিন রোডের বাড়িতে দিন কাটিয়ে যেতেন। একতলার বারান্দায় বসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বড় একটা আলবোলা থেকে আরাম করে তামাক খেতেন। চঞ্চলমতি ছেলের গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁর খুব চিন্তা হত, কেবলই 'কোথায় গেল' 'কোথায় গেল' করে হাঁকডাক করতেন। হুঁকোয় টান দিতে-দিতে ঝিমুতে-ঝিমুতে বলতেন, "পালান পালিয়ে গেল, হারান হারিয়ে গেল।" পালানকাকার ভাল নাম ছিল হারানচন্দ্র মিত্র। পালানকাকা কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বসুবাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে কটকে, পরে কলকাতায়। চাকরি-জীবনেও তিনি হয় এলগিন রোড নয় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল।খেলাধুলোয় বেশ পটু ছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব ভাল ম্যাসাজ করতে পারতেন। তিনি প্রায়ই রাঙাকাকাবাবুর গা-হাত-পা টিপে দিতেন। আমাদের মতো ছোটদের মন পেতে হলে বলতেন, "তোমার মাথাটা তো ধরেছে মনে হচ্ছে, এসো না একটু টিপে দিই।"

পালানকাকা ইলাকে বললেন, আমি যে রোজ সন্ধ্যায় ঘর বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলাদা কথা বলি, সেটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে! শুনে রাঙাকাকাবাবু ঠিক করলেন, পালানকাকাকে কোনওমতে কোথাও চালান করে দিতে হবে। সে-সময় পালানকাকা বেকার। একটা চাকরি জোগাড় করে দেবার জন্য রাঙাকাকাবাবুকে খুব পীড়াপীড়ি

করছিলেন। রাঙাকাকাবাবু জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির বড়সাহেবের কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন। সেটা নিয়ে পালানকাকাকে জামশেদপুরে গিয়ে ধর্না দিতে বললেন। তাঁকে বোঝালেন, এতদিন বেকার থাকার মতো লজ্জার আর নেই। "চিঠি দিলাম, তুমি টাটানগরে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বোসো, যতদিন না চাকরি হচ্ছে সেখান থেকে নড়বে না।" পালানকাকা গ্যাঁট হয়ে বসেই রইলেন, ইতিমধ্যে আমাদের কাজ সমাধা হয়ে গেল।

পালানকাকার সরল প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের কিছুদিন পরে শত্রুপক্ষ তাঁকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। ইলাকে পালানকাকা একদিন এসে বললেন, "ওরা বলছে আমাকে বেশ কিছু টাকাপয়সা দেবে, যদি আমি ছোড়দার পালানো সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করে দিতে পারি।" বোধহয় ইলা ব্যাপারটা জানে মনে করেই তিনি সোজাসুজি পুলিশের কারসাজি ফাঁস করে দিলেন।

এলগিন রোডের বাড়িতে লোক অনেক, আত্মীয়-স্বজন ও নানা ধরনের বাইরের লোক ক্রমাগতই আসেন। জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ স্বাভাবিকভাবেই নানারকম। তাছাড়া চাকরবাকরের সংখ্যাও কম নয়, তারা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। নতুনকাকাবাবুর একটা বড় অ্যালসেশিয়ন কুকুরও আছে, সে আবার এর-তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিশেষ করে রাত্রে। আমি যখন ওই বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেরোবার পথ ও উপায় সম্বন্ধে ভাবছি, রাঙাকাকাবাবু তখন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্ল্যানের ভিত্তিতে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বললেন, "এত লোকের মধ্যে এ-বাড়িতে ব্যাপারটা আয়ত্তে রাখা শক্ত। ধরো, এ-বাড়ি থেকে আমি খোলাখুলিভাবেই চলে গেলাম। আমার স্বাস্থ্য যে খারাপ, সে-কথা তো সকলেই জানে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে কোথাও চলে যাই, সেখান থেকে যথাসময়ে উধাও হয়ে যাব।"

আবার নতুন করে চিন্তা আরম্ভ হল।

॥ ৩৮ ॥

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে অন্তর্ধানের পরিকল্পনা দুভাবে করা যেত। রাঙাকাকাবাবুই এই দুই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। প্রথমটা ছিল উডবার্ন পার্কের বাড়িতে চলে যাওয়া। দ্বিতীয়টা ছিল রিষড়ার বাবার বাগানবাড়ি থেকে অন্তর্ধানের ব্যবস্থা করা। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে তিনি অনশন করে মুক্তি পেয়েছেন, সুতরাং ওঁর স্বাস্থ্য যে ভাল নয় সেটা সকলেরই জানা। ডাঃ মণি দে-র ডাক্তারি বুলেটিনও খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তাতেও তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের উল্লেখ আছে। প্রচার করে দেওয়া যাক যে, এলগিন রোডের বাড়িতে তিনি একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছেন, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট আলো-হাওয়া ও বেড়াবার সুযোগ পাচ্ছেন না। সেজন্য তিনি উডবার্ন পার্কের বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে থাকবেন। পাশেই বড় ছাদ, খুব আলো-বাতাস পাবেন, আর বেড়াতেও পারবেন। রিষড়ার বাড়িতে গেলে তো কথাই নেই। সেখানে তো গঙ্গার উপর বাবার একটা সুন্দর বাগানবাড়ি আছে। অসুস্থ লোকের পক্ষে চমৎকার জায়গা।

আমাকে রাঙাকাকাবাবু বললেন, উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে সব ব্যবস্থা করতে তো আমার সুবিধাই হওয়া উচিত। রিষড়ার বাড়িতে সাধারণত একটি লোকই থাকে, তাকে

Éamon de Valéra

আমাকে পাঠানো ডি ভ্যালেরার অটোগ্রাফ

কীভাবে আয়ত্তে আনা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে।

আমি ভাল করে ভেবে দেখলাম। মনে হল রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দিনকতক খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলে আমার বুদ্ধিটা যেন একটু খুলেছে। আমি স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে, প্রথম পর্যায়ে অন্য কোথাও চলে গিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ধানের পরিকল্পনা মোটেই সুবিধার হবে না। আমি সোজাসুজি রাঙাকাকাবাবুকে বললাম, সকলেই জানে যে আপনি বেশ অসুস্থ, এই একটি ঘরে থাকেন, এমনকী বারান্দায়ও বেরোন না। বিশেষ করে যে-সব পুলিশের চর আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরও ঐ একই ধারণা। ওদের আচরণ লক্ষ করে আমারও মনে হয়েছে যে, তাদের মধ্যে একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব এসেছে এবং মনে হয় ওরা কাজে একটু ঢিলে দিয়েছে। এই অবস্থায় রাঙাকাকাবাবু যদি সকলকে জানিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যান তাহলে সবাই আবার সজাগ ও সতর্ক হয়ে যাবে। পুলিশের দিক থেকে আবার নতুন ব্যবস্থা হবে, ফলে আমাদের অসুবিধাই হবে। তাছাড়া উডবার্ন পার্কের বাড়িতে শৃঙ্খলাটা বেশ কড়া, যে-সব লোকজন বাড়িতে থাকে ও কাজ করে, বিশেষ করে নীচের তলার বেয়ারা, গেটের দরওয়ান ও দুই ড্রাইভার, তারা সকলেই খুবই বিশ্বস্ত ও সতর্ক, সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলেই শোরগোল তুলবে। রিষ্‌ড়ার বাড়িতে অবশ্য লোকজন কম, কিন্তু আমার বিশ্বাস কলকাতার বাইরে রাঙাকাকাবাবু কোথাও গেলেই পুলিশ সেখানে নতুন করে অনেক লোক বসাবে। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, উডবার্ন পার্কের বা রিষড়ার বাড়ি ব্যবহার না করাই ভাল। বলেই মনে হল বোধহয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি, এতটা মাস্টারি না করলেও হত। কিন্তু রাঙাকাকাবাবু বলে উঠলেন, ঠিক বলেছ, ও-পথে যাওয়া চলবে না। কিছু অসুবিধা থাকলেও এ-বাড়ি থেকেই যাত্রা করার প্ল্যান করতে হবে।

একদিন একটু বেশি কাছে ডেকে রাঙাকাকাবাবু একটা খুব শক্ত প্রশ্ন করলেন, বাবা-মাকে না জানিয়ে কাজটা করতে পারবে? আমি সোজাসুজি উত্তর দিলাম না। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্টভাবে বললাম, ঠিক আছে।

রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা যখন খুব জোর কদমে চলছে, আমার মনে হল অন্য কয়েকটা ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের কাহিনী খুঁটিয়ে দেখে নিলে হয়, কিছু আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে। শিবাজির ব্যাপারটা বড়ই পুরনো, বর্তমান যুগের গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার তো সেখানে নেই। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের এক প্রধান হোতা ডি ভ্যালেরার

ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কন জেল থেকে পালানোর কাহিনীটা মনে ধরল। যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদ দুই ক্ষেত্রে যথেষ্ট, আমাদের প্রতিপক্ষ তো একই। ভাগ্যিস ডি ভ্যালেরার জেল থেকে অদৃশ্য হবার ব্যাপারটা পড়ে নিয়েছিলাম। ১৭ই জানুয়ারি রাতে গাড়িতে রাঙাকাকাবাবু ডি ভ্যালেরার এস্কেপ সম্বন্ধে জানি কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ১৯১৯ সালে ডি ভ্যালেরা—যাঁকে তাঁর সংগ্রামসঙ্গীরা 'ডেভ্' বলে ডাকতেন—যে-জেলে বন্দী ছিলেন তার পিছনের দিক দিয়ে একটা ছোট দরজা ছিল। জেলের পাদ্রিসাহেব সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং দরজার চাবিটি তিনি প্রায়ই এদিক-ওদিক ফেলে রাখতেন। ডি ভ্যালেরা মোমবাতির মোম গালিয়ে চাবিটির একটি ছাপ নিয়ে নিলেন। ছাপটির সাহায্যে একটি ক্রিসমাস কার্ডে চাবির একটা নকশা এঁকে 'ডেভ'-এর এক সাথী কৌতুকের ছলে কয়েকটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা লিখে বাইরে বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাইরে থেকে চাবি তৈরি করে কেকের মধ্যে লুকিয়ে জেলে পাঠানো হল। বার-দুয়েক তো চাবি ঠিক হল না। তৃতীয় বার বাইরে থেকে পাঠানো চাবিটি জেলের মধ্যে এক বন্দী ঘষে-মেজে ঠিক করলেন। ডি ভ্যালেরাকে নিয়ে যাবার জন্য জেলের পিছনের জঙ্গলে যাঁরা লুকিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের প্রবাদপুরুষ আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির নায়ক মাইকেল কলিনস। সিগন্যাল আদান-প্রদানের পর ডি ভ্যালেরা তো ঠিকমতো ভিতরের দরজাটা খুললেন, এবং বাইরে থেকে তাঁকে দেখা গেল। বাইরের লোহার দরজায় চাবি লাগিয়ে মাইকেল কলিনস চাড় দিতেই কলের ভিতরে চাবিটি গেল ভেঙে। কলিনস মুষড়ে পড়ে বলে উঠলেন, "আই হ্যাভ ব্রোকেন এ কী ইন দি লক, ডেভ।" চমকে উঠে ডি ভ্যালেরা তাঁর হাতের চাবিটি দিয়ে ভিতরের দিক থেকে একটু ঠেলা দিতেই ভাগ্যের জোরে ভাঙা চাবিটি পড়ে গেল। লিঙ্কন শহর পর্যন্ত সকলে হাঁটলেন। পথে কিছু সিপাই-সান্ত্রী ছিল, যেমন আমরাও গাড়ি থেকে পথে কিছু দেখেছিলাম। তাদের সম্ভাষণ করতে করতে তাঁরা এগোলেন। অন্ধকার রাতে মুক্ত বন্দীদের নিয়ে তীরবেগে একটা ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল।

ডি ভ্যালেরার কাহিনী পড়ে আমি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়লাম। তাঁর জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থাদি করেছিলেন অভিজ্ঞ বিপ্লবীরা। তাও কত রকমের অসুবিধা হয়েছিল। আমি ভাবলাম, আমার মতো ছেলে-ছোকরা দিয়ে কি রাঙাকাকাবাবু এত শক্ত কাজ সামাল দিতে পারবেন! কোথায় মাইকেল কলিনস আর কোথায় আমি! দায়িত্বটা যে কত বড় সেটাই বোঝার ক্ষমতা আছে কিনা কে জানে? যাই হোক, নিজেকে বোঝালাম, যথাসাধ্য করতে হবে।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে বাবা-মা ও দুই বোনের সঙ্গে ডাবলিনে গিয়েছি। আমার মনের মধ্যে কৌতূহল ও চাপা উত্তেজনা ছাপিয়ে উঠছে। সেখানে দেখতে পাব সেই ডি ভ্যালেরাকে। হয়তো কিছু কথাবার্তা বলারও সুযোগ হবে। ডাবলিনের 'ডয়েল' বা পার্লামেন্ট ভবনে ডি ভ্যালেরা বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হল। তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ডি ভ্যালেরার কয়েকবারই দেখা হয়েছে। দুই মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে খুবই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাবা সপরিবারে তাঁর কাছে যাতায়াতে বসুবাড়ির সঙ্গে ডি ভ্যালেরার সম্পর্কটা আরও গভীর হল। আমি তাঁকে বললাম,

"১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় আপনি আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে রেড ক্রস মারফত যে-সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাঙাকাকাবাবু আপনাকে উদ্দেশ করে একটা বেতার-ভাষণ দিয়েছিলেন।" শুনে ডি ভ্যালেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, "সুভাষের ঐ ভাষণটি যোগাড় করে অতিঅবশ্য আমাকে পাঠিয়ে দেবে।" সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। আলো কম, তবু বেশ কয়েকটি ছবি তুললাম। পরে লণ্ডন থেকে ছবি তৈরি করে তাঁকে পাঠাই এবং একটি ছবি সই করে আমাকে ফেরত দিতে অনুরোধ করি। ডি ভ্যালেরা কালক্ষেপ না করে সানন্দ সম্ভাষণ জানিয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

১৯৪০-এ বাবার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। রাঙাকাকাবাবু মুক্তি পাবার কিছুদিন পরেই বাবা স্বাস্থ্যের জন্য কালিম্পঙে চলে গেলেন, আইন-ব্যবসায়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুধীরঞ্জন দাসের অতিথি হয়ে। মনে আছে, দু-তিনবার রাঙাকাকাবাবু বাবার কাছে চিঠি লিখে সরাসরি শিয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিঙ মেলে পৌঁছে দিয়েছেন যাতে মাঝপথে কোনো ডাকঘরে পুলিশের লোক সেগুলি খুলে না দেখে। আর কিছুদিন পরে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ির আর-সকলকে নিয়ে মা আমার বড় দাদার কাছে ধানবাদ অঞ্চলে বারারি চলে গেলেন। ফলে যখন আমি রাঙাকাকাবাবুর গোপন-যাত্রার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করলাম তখন উডবার্ন পার্কের বাড়ি খালি।

॥ ৩৯ ॥

সব দিক বিবেচনা করে যখন ঠিক হল যে এলগিন রোডের বাড়ি থেকেই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে, রাঙাকাকাবাবু নতুন করে চিন্তা আরম্ভ করলেন। তবে ঠিক কী উপায়ে বাড়ি থেকে লুকিয়ে যাওয়া হবে সে-বিষয়ে কিছুদিন তিনি পরিষ্কার করে বললেন না। অন্য অনেক ব্যবস্থা করার ছিল, সেগুলি নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রথমত একটা ছদ্মবেশ তো চাই। সেজন্য নিজের কী কাপড়জামা আছে দেখতে চাইলেন। তাঁর গরম কাপড়জামা, বিশেষ করে যেগুলি তিনি আগে ইউরোপে ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে মার কাছে থাকত। তিনি সকলকে বললেন যে, অনেকদিনের জন্য তো তিনি শীঘ্রই জেলে চলে যাবেন, তাঁর কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র কোথায় কী আছে দেখে নিতে চান। আমি মাকে বলে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তাঁর যা-কিছু ছিল, তাঁরই পরিচারক রমণীকে দিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু জামাকাপড় তিনি ফেরতও দিলেন, তার মধ্যে কিছু ছিল যা আমাকে সঙ্গে নিতে হবে। অন্তর্ধানের পর রাঙাকাকাবাবুর কাপড়চোপড় নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করাটা বাড়ির কারুর কারুর মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল।

এরই মধ্যে বেশ একটা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ঘটল। রাঙাকাকাবাবু দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর অনুগামীদের একটা মিটিং ডাকলেন। মিটিংটা উপলক্ষ মাত্র, আসল কাজটা ছিল উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যায় রাঙাকাকাবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি একজন পাঠান ভদ্রলোক রয়েছেন। বাড়ির দু-একজনও ছিলেন—আর ছিলেন রাঙাকাকাবাবুর সেক্রেটারি অমূল্য মুখার্জি। আমাকে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, সেই সন্ধ্যায়ই মিঞাসাহেব ফিরবেন। তাঁর রেলের টিকেট কাটা ও বার্থ রিজার্ভ

করা হয়নি, সেজন্য অমূল্যবাবুকে তিনি আগেই হাওড়া স্টেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমি যেন ওয়াণ্ডারার গাড়িতে করে তাঁকে সময়মতো স্টেশনে পৌঁছে দিই। পথে তিনি হোটেল থেকে তাঁর মালপত্র তুলে নেবেন এবং ধর্মতলায় কিছু কেনাকাটা আছে—তাও সেরে নেবেন। নজর করলাম, রাঙাকাকাবাবুর খাটে একটা মাপবার ফিতে পড়ে ছিল।

গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার, মিঞা আকবর শাহ্ ও আমি বসে ছিলাম পিছনের সীটে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মিঞাসাহেব ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, রাঙাকাকাবাবু তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের ব্যাপারে এদিককার ভার আমার উপর পড়েছে, অন্য প্রান্তের ভার তাঁর নিজের উপর। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে তিনি একটা সিগন্যাল পাঠাবেন। প্রথমে মির্জাপুর স্ট্রীটের এক হোটেল থেকে তাঁর মালপত্র তুলে নিলেন। তারপর বললেন ধর্মতলা স্ট্রীটে ওয়াছেল মোল্লার দোকানে নিয়ে যেতে, সেখান থেকে তিনি রাঙাকাকাবাবুর জন্য দু-একটা জিনিস কিনে দেবেন। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হল, তিনি স্টেশনে নামবার সময় ইচ্ছা করে জিনিসগুলো ভুলে গাড়িতে ফেলে যাবেন। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে আমরা একসঙ্গেই ঢুকলাম, জিনিস কিনবার জায়গাটা তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে আমি দূরে সরে রইলাম। দেখলাম মিঞাসাহেব পায়জামা টুপি নিজের গায়ে লাগিয়ে দেখছেন। যেন নিজের জন্যই কিনছেন। রাঙাকাকাবাবুর জন্য তিনি একজোড়া ঢিলে পায়জামা ও একটি ফেজ ধরনের লোমশ 'আস্ত্রাখান' টুপি কিনলেন। তিনিই প্যাকেটটি হাতে করে গাড়িতে উঠলেন। সীটের পেছনে সেটা ফেলে রাখলেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই দেখলাম, অমূল্যবাবু স্টেশনের গাড়িবারান্দায় অপেক্ষা করছেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন স্টেশনে না নামি। চট করে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে আমি মিঞাসাহেবকে বিদায় জানিয়ে ড্রাইভারকে বললাম বাড়ি চলুন। কিন্তু কী মুশকিল, স্টেশনের চত্বর ছাড়বার আগেই ড্রাইভার বাবুর নজরে পড়ল, মিঞাসাহেব প্যাকেটটি ফেলে গেছেন। আমাকে বলল, "দৌড়ে দিয়ে আসব নাকি?" আমি বিরক্তির ভান করে বললাম, "অত হ্যাঙ্গাম আমার পোষাবে না, ভুলে গেছেন তো আমি কী করব, পরে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তাড়া আছে, বাড়ি চলুন।" বাড়ি ফিরে প্যাকেটটি আমার আলমারিতে বন্ধ করলাম।

মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে কথাবার্তা ও বাজার করবার পর আমি পরিষ্কার বুঝে গেলাম যে, রাঙাকাকাবাবু অসাধারণ বৈপ্লবিক কিছু করতে বিদেশে পাড়ি দেবেন। পরে আমাকে বললেন, আমাকেও বেশ কিছু কেনাকাটা করতে হবে। নিউ মার্কেট থেকে এক জোড়া ফ্যানেলের শার্ট ও 'মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড' মার্কা চিরুনি, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান ইত্যাদি কিনেছিলাম মনে আছে। মজবুত মোটা ধরনের এক জোড়া কাবলি জুতো কিনতে খুব অসুবিধায় পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত মোটামুটি পছন্দসই একজোড়া পেয়েছিলাম। হ্যারিসন রোডের একটা বড় দোকান থেকে একটা মাঝারি মাপের সুটকেশ, একটা অ্যাটাচি কেস ও বিছানার জন্য একটা হোল্ডল কিনলাম। রাঙাকাকাবাবুর কথামতো বাক্সগুলির উপরে কালো কালি দিয়ে M.Z. লিখিয়ে নিয়েছিলাম। ছোট তোশক, বালিশ ইত্যাদি ধর্মতলা স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে যোগাড় করলাম। একটা সুবিধা ছিল যে, যখন আমি বাক্সপ্যাঁটরা বিছানা ইত্যাদি কিনছিলাম, উডবার্ন পার্কের বাড়ি তখন খালি। বাড়ির চাকরবাকরেরা যাতে এসব কিছু না দেখে ফেলে সেজন্য দুপুরবেলা যখন ড্রাইভাররা ছুটি

নেয় আর অন্যেরা বিশ্রাম করে, সেই সময় নিজে গাড়ি চালিয়ে বড়সড় জিনিসগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। নীচের তলার বেয়ারাটি দুপুরে খাওয়ার পরে সামনের বারান্দায় কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা যেত। তাকে পাশ কাটিয়ে চুপিসারে সব জিনিসপত্র আমি তিনতলায় নিজের ঘরে নিয়ে ফেললাম। বেশ কিছু আলমারির ভিতরে গেল। বড় বাক্সটি রইল অন্য বাক্সের সঙ্গে খাটের তলায়।

রাঙাকাকাবাবুর জন্য একটা ভুয়ো ভিজিটিং কার্ড ছাপাতে হবে। এক টুকরো কাগজে পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে যেমন ছাপাতে হবে লিখে দিলেন। বললেন, সম্পূর্ণ অজানা দোকানে যেতে হবে এবং আমার পোশাক চালচলন এমন হওয়া চাই যে, মনে হবে আমি নিজের জন্যই কার্ড ছাপাচ্ছি। নিজের হাতে রাঙাকাকাবাবুর লেখাটা কপি করে নিয়ে এক সন্ধ্যায় স্যুট-টাই ইত্যাদি চাপিয়ে হ্যাট হাতে নিয়ে তো বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। সদর দরজা পেরোতেই ডাঁটিদাদার (রবীন্দ্রকুমার ঘোষ) মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তিনি তো ঐ পোশাকে আমাকে কখনও দেখেননি, বাবা তো পাহাড়ে পরবার জন্য ওগুলি করিয়ে দিয়েছিলেন। কী যে করি! যাই হোক, সরলপ্রাণ ডাঁটিদা নিজেই বলে উঠলেন, "বাইরে ডিনার-টিনার আছে বুঝি?" আমতা-আমতা করে আমি বললাম, "এই, মানে, হ্যাঁ, একটা, মানে ডিনার… !" ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলাম রাইটার্স বিল্ডিং-এর পিছনে রাধাবাজারে। যতটা পারি গম্ভীর মেজাজে টানা টানা ইংরেজিতে কার্ডটা অর্ডার দিলাম:

MOHD. ZIAUDDIN B.A., Ll.B.
Travelling Inspector
The Empire of India Life Insurance CO. Ltd.
Permanent address:
Civil Lines,
Jubbulpore.

পরে কার্ড যখন রাঙাকাকাবাবুর হাতে দিলাম, তাঁর তো পছন্দ হয়েছে বলেই মনে হল।

উডবার্ন পার্কে তো দুটো গাড়ি—একটা বড় স্টুডিবেকার প্রেসিডেন্ট যেটা বাবা ব্যবহার করতেন। আর অন্যটা ওয়াণ্ডারার। একদিন রাঙাকাকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন গাড়িটা আসল কাজের জন্য নেওয়া হবে। স্টুডিবেকার খুব জোরদার গাড়ি। চলে খুব ভাল, চালাতেও আরাম। ওয়াণ্ডারার গাড়িটাও ভাল, সব জার্মান জিনিসই যেমন হয়, তবে লম্বা পাড়িতে গোলমাল করবে না তো? মনে হল রাঙাকাকাবাবু প্রথমটায় স্টুডিবেকারের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম, বড় গাড়িটা বড়ই চেনা, রাস্তায় দেখলে অনেকেই বলে ওঠে, ঐ যে শরৎ বোসের গাড়ি বা ঐ যে শরৎ বোস যাচ্ছেন। সুতরাং ওয়াণ্ডারার নেওয়াই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল।

একদিন রাঙাকাকাবাবু আমার ও গাড়ির একসঙ্গে পরীক্ষা নিলেন। বললেন, "সকাল-সকাল বেরিয়ে ওয়াণ্ডারার গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় কোথাও না থেমে তুমি বর্ধমান চলে যাও। বর্ধমান রেল-স্টেশনে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে আবার সোজা চলে এসো। এসেই আমাকে বলো, গাড়ি কেমন চলল, তোমারই বা কতটা ক্লান্তি হল।" ফিরে আমি ভাল রিপোর্টই দিলাম। আর-একদিন বললেন, "রিষড়ার বাড়ির লোকটিকে একটু প্রস্তুত

করে রাখা যাক, বাড়ির লোকেরাও জানুক যে তুমি কখন কখন রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকো।" এক সন্ধ্যায় রিষড়ায় চলে যেতে বললেন। আমি একটু দেরি করে রিষড়ায় পৌঁছে মালিকে বললাম, "আজ রাত হয়ে গেছে, আমি এখানেই থেকে যাব, বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করে দাও, কিছু খাবার নিয়ে এসো।" রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, তাঁকে আরও দূরের কোনো স্টেশনে তুলে দিয়ে ফেরবার সময় আমাকে রিষড়ায় থেকে যেতে হতে পারে। লোককে বলারও সুবিধে হবে যে আমি রিষড়ার বাগানবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

॥ ৪০ ॥

ডিসেম্বর মাসটা যতই এগোতে লাগল, মনে হল রাঙাকাকাবাবু ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছেন। প্রথমে আমাকে বলেছিলেন যে বড়দিনের ছুটি নাগাদ বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু মিঞা আকবর শাহের দিক থেকে সিগন্যাল পেতে দেরি হচ্ছিল।

এরই মধ্যে বোম্বাই থেকে দুই অতিথি এসে পড়লেন—বসুবাড়ির বিশেষ বন্ধু নাথালাল পারেখ ও তাঁর স্ত্রী। নাথালালের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর তিরিশের দশকে ইউরোপে আলাপ হয়। প্রবাসে পারেখ-পরিবারের আতিথেয়তায় রাঙাকাকাবাবু মুগ্ধ হন। দেশে ফেরার পর নাথালাল আরও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি হবার পর থেকে ১৯৪১-এ দেশত্যাগ করা পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু যতবারই বোম্বাই গিয়েছেন নাথালালের মেরিন ড্রাইভের বাড়িতে থেকেছেন। বাবা-মার সঙ্গে আমরাও নাথালালের বাড়িতে থেকেছি। ১৯৩৯-এর পুজোর ছুটিটা বাবা-মা ও আমরা সকলে নাথালাল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর পাহাড়ে খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম। ত্রিপুরী কংগ্রেসে পারেখ-দম্পতি রাঙাকাকাবাবুর পাশে পাশে ছিলেন এবং যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন।

এবার রাঙাকাকাবাবু নাথালাল ও তাঁর স্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে করতে বললেন। বাড়ি তো তখন খালি, কেবল আমি আছি। সেজন্য তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা এলগিন রোডের বাড়িতেই ছিল। বোম্বাই ফেরবার আগে ডিসেম্বরের শেষে তাঁরা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে তাঁরা নতুন বছরের প্রথমেই বোম্বাই ফিরে যাবেন।

প্রথম প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে, আমাকে রাঙাকাকাবাবু সম্ভবত বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে দিতে বলবেন, কারণ তিনি ফেরবার পথে রিষড়ার বাড়িতে রাত কাটাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরে মনে হল তিনি আরও অনেক লম্বা পাড়ির কথা ভাবছেন। কারণ আমাকে তিনি পরে বললেন যে, তাঁকে আসানসোল বা তার কাছাকাছি কোনো স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। প্ল্যানটা হবে এই রকম—আমি ভোর রাত্তিরে তাঁকে পথের কোনো-একটা ডাকবাংলোয় নামিয়ে দেব। তিনি দিনটা সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবেন। আর আমি চলে যাব ধানবাদের কাছে আমার দাদার বারারির বাড়িতে। পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকবাংলো থেকে তুলে তিনি যে স্টেশনে ট্রেন ধরতে চান আমি পৌঁছে দেব। দাদা-বৌদির কাছে আমার বারারি যাওয়ার একটা অজুহাত বের করা তো খুবই সহজ।

এমনিতেই জানুয়ারির প্রথমে আমার বারারি যাবার কথা ছিল। তার উপর রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ঐ এলাকাটা আমার একবার ভাল করে দেখে এলে ভাল

হয়। মা ও ছোটদের বারারি থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি এই অজুহাত দেখিয়ে আমি নাথালালদের সঙ্গে বোম্বাই মেলে চাপলাম। মাঝরাতে ধানবাদে নেমে গেলাম। সেখান থেকে বারারি বেশি দূর নয়।

ঠিক যেমন রাঙাকাকাবাবু বলে দিয়েছিলেন, বারারি ছাড়বার আগে আমি দাদাকে বললাম, দিনকতক পরে রাঙাকাকাবাবুর কোনো কাজে আমি ঐ অঞ্চলে আসব, সেই সময় আমি আবার বারারিতে আসব।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ধানবাদ যাবার রাস্তা ও ধানবাদ থেকে বারারি পর্যন্ত পথঘাট আমি ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। ধানবাদ থেকে বারারি পথটা একটু গোলমেলে ঠেকেছিল। পথের কতকগুলো বাড়িঘর, ছোটখাটো ব্রিজ, কটা বাঁক আছে, ইত্যাদি মনে ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। তবে দাদার বাড়ির পেছনেই বড় বড় চিমনিওয়ালা কারখানাটা বেশ একটা বড় দিক্‌চিহ্ন ছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর, ধানবাদের দিকে মোড় নেওয়ার আগে গোবিন্দপুর বলে একটা জায়গায় বাঁশের বেড়া নামিয়ে গাড়ি থামিয়ে নম্বরটা লিখে নিল নজর করলাম।

কলকাতা ফেরার পথে স্টুডিবেকার গাড়িটা আসানসোল ও বর্ধমানের মাঝে বেশ একটা গণ্ডগোল করে বসল। এমন একটা যন্ত্র ভেঙে গেল যে সেখানে সারানো সম্ভব হল না। একটা গ্যারাজে গাড়িটা রেখে মামাবাবুর সঙ্গে আমরা একটা নড়বড়ে ট্যাক্সি চেপে কলকাতায় ফিরলাম। ব্যাপারটাতে আমি তো শঙ্কিত হলাম। রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে যদি ওয়াণ্ডারার গাড়ি এ-রকম ব্যবহার করে তাহলে কী উপায় হবে!

কলকাতায় ফিরেই রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে নিয়মমতো জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। বাবাও কালিম্পঙ থেকে ফিরলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে বলেছিলেন, "মাকে বলে রেখো, যেদিনই তোমার বাবা কলকাতায় পৌঁছবেন সেদিনই সন্ধ্যায় যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।" তাই হল। সেদিন সারা সন্ধ্যাটাই বাবা ও রাঙাকাকাবাবু নিভৃতে কথা বললেন। আমি বাইরেই রইলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় মা একটু হেসে আমাকে বললেন, "উনি বলছিলেন, তোমার ছেলে কি আমাদের না জানিয়েই এই সব কাণ্ড করতে যাচ্ছিল নাকি?" যাই হোক, বাবা-মার দিকটা এইভাবে সমাধান হয়ে যাওয়াতে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হলাম। বাবা কিন্তু ১৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যা পর্যন্ত এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। মা কেবলই বলতে লাগলেন, একটু আগে জানতে পারলে আরও বেশি দেখাসাক্ষাৎ করে নিতে পারতাম, অনেক কথাবার্তা হতে পারত।

প্রথমের দিকেই বাবার সম্বন্ধে কথা তুলে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, বাবার সেই সময়কার শরীরের অবস্থা দেখে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁর মনে হয়েছিল, বাবার স্নায়বিক অবস্থা অন্তত সাময়িকভাবে বেশ খারাপ। আরও বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি সঙ্কট-মুহূর্তে তিনি বাবার পরামর্শ ও সমর্থন চেয়েছেন, পেয়েছেনও। তাঁর ভয় হয়েছিল, যদি বাবা মন শক্ত করতে না পারেন এবং রাঙাকাকাবাবুকে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করেন তাহলে তিনি মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন। যাই হোক, পরের দিন রাঙাকাকাবাবুর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে তো মনে হল না যে বাবা কোনোরকম আপত্তি তুলেছেন। বরং মনে হল পুরো পরিকল্পনাটা তাঁরা দুজনে খুঁটিয়ে বিচার করেছেন এবং বাবা বেশ কতকগুলি ব্যাপারে অদলবদল করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন, এলগিন

রোডের বাড়িতে একমাত্র ইলার উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না বলে বাবা মনে করেছিলেন। কারণ সেক্ষেত্রে পুলিশের সব জুলুম বাড়ির ঐ মেয়েটির উপর পড়বে। এই সূত্রে রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে আমার জ্যাঠতুত ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন।

বাড়ি থেকে উধাও হবার পর ব্যাপারটা কী উপায়ে গোপন রাখা যাবে তার পরিকল্পনা ধীরে-সুস্থে রাঙাকাকাবাবু একদিন আমাকে বললেন। আমি তো শুনে অবাক! লোকে বিশ্বাস করবে তো! বললেন, তিনি যথাসময়ে বাড়ির লোকেদের জানিয়ে দেবেন যে, তিনি একটা ব্রত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কিছুদিন সম্পূর্ণ নির্জনবাস করবেন। সকলে জানবে যে তিনি নিজের শোবার ঘর থেকে মোটেই বের হন না, কারুর সঙ্গে দেখা করেন না বা টেলিফোনেও কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। এ-ব্যাপারে বড় রকমের কোনো প্রচার হবে না, খবরের কাগজেও কোনো ঘোষণা করা হবে না। বাইরের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে বা টেলিফোন করলে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, দিনকয়েকের জন্য তিনি নির্জনবাস করছেন। আস্তে আস্তে খবরটা ছড়াবে। মাজননীর ঠাকুর তাঁর খাবার পর্দার আড়াল থেকে রেখে দিয়ে যাবে। যাতে সকলে বিশ্বাস করে যে, সত্যিই তিনি ঘরে আছেন, তার জন্য সব ব্যবস্থা মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন। খাবারগুলো খাওয়া এবং ঘর ব্যবহার করার ভার তো দিয়ে যাবেন। তাছাড়া অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্লিপ নিজের হাতে লিখে দিয়ে যাবেন যেগুলো বুঝেসুঝে আগন্তুকদের দেওয়া হবে। কোনোটায় লেখা থাকবে, এ-ব্যাপারে কংগ্রেস অফিসে আশরাফউদ্দীন-সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, এ-বিষয়ে করপোরেশনের অমুক কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলুন, ইত্যাদি। তাছাড়া কতকগুলো চিঠি লিখে দিয়ে যাবেন যেগুলো তাঁর অন্তর্ধানের পর ভিন্ন-ভিন্ন তারিখে ছাড়া হবে। চিঠি লিখবেন বিশেষ করে জেলে বন্দী তাঁর সহকর্মীদের নামে, যাতে সেগুলি পুলিশ বিভাগের নজরে পড়ে এবং তারা মনে করে যে সুভাষবাবু তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে চিঠি লিখছেন।

ক্রমেই আমার মনে হতে লাগল, যে-কোনোদিন যাত্রার সঙ্কেত এসে পড়তে পারে। শেষের কয়েকদিন দেখা হলেই প্রথমেই রাঙাকাকাবাবু জিজ্ঞাসা করতেন—প্রস্তুত তো? সুতরাং আমি গাড়ির দিকে নজর দিলাম। বাবাকে বলে একটা নতুন টায়ার ও ব্যাটারির ব্যবস্থা করলাম। যাত্রার ঠিক আগেই যাতে গাড়িটা ভাল করে সার্ভিসিং করিয়ে নেওয়া যায় সেজন্যে আমাদের সেই সময়কার বাঁধা গ্যারাজ ইন্টারন্যাশনাল টায়ারস অ্যাণ্ড মোটরস্‌-এ কথাবার্তা বলে এলাম। সমস্যা হল ওয়াণ্ডারার গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে। কিন্তু চট করে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ড্রাইভার বাবুর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল, তার মার খুব অসুখ, তক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। রাঙাকাকাবাবুকে সন্ধ্যায় যখন বললাম ভাল খবর আছে, তিনি প্রথমটায় গম্ভীর হবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেললেন।

॥ ৪১ ॥

যাত্রার কয়েকদিন আগে রাঙাকাকাবাবু আমাকে বললেন, সন্ধ্যায় গাড়ি চালিয়ে ইলাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ নেই। তবে

বুঝলাম, একটা বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের পূর্বে তাঁর নিজের প্রস্তুতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে। রাঙাকাকাবাবুর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে প্রমাণ করেছিলেন যে, সেই বিশ্বাসই সত্য, যা মানুষকে অফুরন্ত শক্তি দেয়, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে, নিরহঙ্কার ও নিঃস্বার্থ করে। কুসংস্কার বা অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক ও সামাজিক সব রকম প্রশ্নেও রাঙাকাকাবাবু ছিলেন উদার ও প্রগতিবাদী। সেজন্য, অন্ধ বা লোক-দেখানো ভক্তি, কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের আতিশয্য, যা বসুবাড়ির অনেকের মধ্যেই দেখেছি, রাঙাকাকাবাবুর মধ্যে দেখিনি। অবশ্য বিশেষ কোনো-কোনো অবস্থায় রাঙাকাকাবাবুকে অন্যদের সঙ্গে কিছু-কিছু আচার-অনুষ্ঠান মানতে দেখেছি। দুটি কারণে তিনি এটা করতেন। প্রথমত, পারিবারিক ব্যাপারে অযথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করা। দ্বিতীয়ত, যে কথাটা তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, নিজের বিশ্বাস যাই হোক না কেন, অন্যের বিশ্বাসে অযথা আঘাত না করা।

যাই হোক, জ্যোৎস্নায় ভরা এক সুন্দর সন্ধ্যায় আমি ওয়াণ্ডারার গাড়িতে করে ইলাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলাম। আমি মন্দিরের সিঁড়িতে অপেক্ষা করলাম, ইলা ছোট একটি তামার পাত্র নিয়ে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিছু ফুল ও পাত্রটি নিয়ে ফিরে এল। রাঙাকাকাবাবু তাকে কী করতে বলেছিলেন—জিজ্ঞেস করলাম না।

এই সূত্রে দুটি কথা মনে পড়ে গেল। প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি অনশন আরম্ভ করেন কালীপুজোর দিন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুর থেকে আমি তাঁর এক গোপন বার্তা পাই। তাঁর নিজের হাতে লেখা বার্তাটির ওপরে লেখা ছিল "শ্রীশ্রী কালীপূজা, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৩"। দেশের দশের কাজে আরাধ্য দেবীর কাছে নীরবে ও নিভৃতে আত্মনিবেদনের নিশ্চয়ই খুব গভীর তাৎপর্য আছে। এর ব্যাখ্যা করবার যোগ্যতা আমার নেই। এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার যুগে আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় যাতে কোনো বাধা না পড়ে সেজন্য নানা দিক দিয়ে আঁটঘাট বেঁধে নিতে হল। আত্মীয়-স্বজনদের কার কীরকম অভ্যাস সে তো জানাই আছে। মোটামুটি বড়রা সকলেই সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েন বা তিনতলায় নিজের-নিজের ঘরে চলে যান। চাকর-বাকরদের ঘুম বেশ গাঢ় লক্ষ করা গেল। বাড়ির প্রধান কাঠের সিঁড়ির একতলার দরজা রাঙাকাকাবাবুর বেয়ারা রমণী বন্ধ করে শোয়। যথাসময়ে দরজা বন্ধ করে তাকে শুতে যেতে বললেই হবে। রাঙাকাকাবাবু আগে থেকেই ঠিক করেছিলেন রান্নাবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে বেরোবেন। ঐ সিঁড়ির নীচের তলায় কোনো দরজাই নেই। বাড়ির সামনের গেটে তালা পড়ে না, ঠিক সময়ে খুলে নিলেই হবে।

নতুনকাকাবাবু ডাঃ সুনীলচন্দ্রের তেজী অ্যালসেশিয়ান কুকুর 'সানি বয়' সমস্যায় ফেলল। রাত্রে লোকের আনাগোনা দেখলে নির্ঘাত ঝাঁপিয়ে পড়বে। একদিন বেশি রাতে সত্যবাবু—সত্যরঞ্জন বক্সী, রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফিরছেন, 'সানি বয়' তো ওই ছোট্ট মানুষটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই ঘটনার সুযোগ নিয়ে রাঙাকাকাবাবু ইলাকে নতুনকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বললেন। তাঁকে বলা হল, যে ক'দিন রাঙাকাকাবাবু

জেলের বাইরে আছেন, অনেকেই তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এবং বেশি রাতে বাড়ি ফিরবেন। 'সানি বয়'কে যদি সন্ধ্যার পর দিনকতক বেঁধে রাখা যায় তো ভাল হয়। নতুনকাকাবাবু রাজি হয়ে গেলেন।

একদিন গিয়ে দেখি রাঙাকাকাবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, যেন ভাল কোনো খবর দেবেন। বললেন, আগের দিন রাত্রে তাঁর পুরো ছদ্মবেশ পরে ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে দেখেছেন, খুব ভাল হয়েছে, কেউ চিনতে পারবে না। আমি সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, "ওই চেহারা ঢেকে রাখা খুবই শক্ত, যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুন না কেন।" আমার মন্তব্য তাঁর পছন্দ হল বলে মনে হল না।

শেষের দিকটায় আমি একটু ঘন ঘন—এ বেলা ওবেলা এলগিন রোডের বাড়িতে যেতে লাগলাম, যদি কোনো খবর থাকে ! ১৪ জানুয়ারি দুপুরে আমাকে রাঙাকাকাবাবু জানালেন, সিগন্যাল এসে গেছে, ১৬ জানুয়ারি রাত্রে যাত্রা করতে হবে। মনে মনে আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দৌড়ে গাড়িটা সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা করতে গেলাম। ষোলো তারিখের আগে বুকিং পেলাম না। তবে গ্যারাজ থেকে আশ্বাস দিল, কাজ সম্পূর্ণ করে সন্ধ্যার আগে গাড়ি ফেরত দেবে।

শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, হোল্‌ড্‌-অল্‌টা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে, শেষ মুহূর্তে জিনিসপত্র নিতে সুবিধা হবে। আবার একবার কাপড়-জামা বাছাবাছি করার অজুহাতে অন্য কাপড়-জামার সঙ্গে চাদরে মুড়ে হোল্‌ড্‌-অল্‌টা রাঙাকাকাবাবুর কাছে রমণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ঘর বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর বাক্স গোছাতে লাগলাম। স্যুটকেসটা গোছাবার সময় হঠাৎ একটা খটকা লাগল। ওয়াণ্ডারার গাড়ির মাল রাখবার জায়গাটায় জিনিস ঢোকাতে হত গাড়ির ভেতর থেকে, সীটের পেছনটা নামিয়ে। ফাঁকটা খুব বড় ছিল না। আমার সন্দেহ হল, স্যুটকেসটা ঢুকবে তো ! ফিতে দিয়ে স্যুটকেসের উচ্চতা মেপে লোকের চোখ এড়িয়ে গ্যারাজে গিয়ে ফাঁকটা মাপলাম। বুঝলাম, স্যুটকেসটা ঢুকবে না। কখন আবার একটা স্যুটকেস কিনব, নাম লেখাব ? রাঙাকাকাবাবুই বা কী মনে করবেন ? আমার ঘরের পাশের বারান্দায় বাড়ির সব বাক্স-প্যাঁটরা জমা করা থাকত। সেখান থেকে S. C. B. মার্কা ঠিক মাপের বাবার একটা স্যুটকেস বের করলাম। বাক্সবদল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দৌড়ে এক বোতল চাইনিজ্ ইঙ্ক, স্পিরিট ইত্যাদি যোগাড় করলাম। বাবার স্যুটকেসের ডালার উপর থেকে S. C. B. অক্ষরগুলো অনেক কষ্টে ঘষে তুলে ফেললাম, আর যতটা পারি বড় অক্ষরে M. Z. লিখলাম। যে স্যুটকেসটা রাঙাকাকাবাবুর জন্য কিনেছিলাম, একই ভাবে তার ওপর থেকে M. Z. তুলে S. C. B. লিখে অন্যান্য স্যুটকেসের সঙ্গে রেখে দিলাম। রাঙাকাকাবাবুর জন্য যে-সব জিনিসপত্র কিনেছিলাম স্যুটকেসে ও অ্যাটাচিকেসে গোছালাম। দু'কপি কোরান অ্যাটাচিকেসে নেবার জন্য দিয়েছিলেন। ইলা দু-রকম কবিরাজি ওষুধ ছোট শিশিতে ভরে লেবেল দিয়ে নিজের হাতে নাম লিখে পাঠিয়েছিল। লেবেলগুলো তুলে ফেললাম।

দেখতে-দেখতে দুটো রাত কেটে গেল। ১৬ জানুয়ারি এসে পড়ল। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কলেজে একবার চেহারাটা দেখানো ভাল হবে মনে করে কিছুক্ষণের জন্য

ঘুরে এলাম। অদ্ভুত রকমের মনের ভাব হয়েছিল আমার। দেখছি সকলেই যার-যার নিত্যনৈমিত্তিক ও গতানুগতিক কাজ করে যাচ্ছে। আমি মনে মনে যেন অন্য জগতে বাস করছি। মনে হল যেন ওই গতানুগতিক জীবনযাত্রা পেছনে ফেলে আমি অনেক দিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। কলেজে একটা লেকচারও শুনলাম, কিন্তু মাথায় ঢুকল না কিছুই। সেই সময় অ্যানাটমি শিখবার জন্য মৃতদেহ কাটাকাটির কাজে নিযুক্ত ছিলাম। দুজন-দুজন করে ছাত্রকে এক সঙ্গে শরীরের এক-একটা ভাগ ডিসেক্‌শন্ করতে দেওয়া হত। আমার পার্টনার প্রভাতকুমার বসু ছিল খুবই সরল প্রাণখোলা লোক, যা বলব তাই মেনে নেবে। আমাদের ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন ডাক্তার সুবোধ সুররায়। শিক্ষক হিসাবে যেমন তাঁর নাম, চারদিকে তেমনই তাঁর চোখ। তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিলাম না। প্রভাতকে কেবল বলে এলাম, বাড়িতে একটু কাজ পড়ে গেছে, দিন দুয়েক নাও আসতে পারি।

বিকেলের দিকে রাঙাকাকাবাবুর ঘরে উঁকি মারলাম। অন্য লোক ছিল, কথাবার্তা বিশেষ হল না। পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। দুজনেই যেন বলতে চাইলাম, সব ঠিক আছে। আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, রাত ন'টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে হাজির হতে, যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হয়ে যেতে চান।

॥ ৪২ ॥

শীতের দিন। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়। সেই সকালে গাড়িটা সার্ভিসিংয়ে দিয়েছি। অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু গাড়ি গ্যারাজ থেকে ফেরত্ দিচ্ছে না। বাবার বড় গাড়ির ড্রাইভার সাম্‌সুদ্দিনকে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি। আমি আমার তিনতলার ঘর থেকে বারে বারে রাস্তার দিকে দেখছি আর ছটফট করছি। যদি গ্যারাজ থেকে বলে, আজ কাজ শেষ হবে না, গাড়ি কাল দেব, তাহলেই তো গেছি। এই সব নানা দুশ্চিন্তা। যাই হোক, সব চিন্তা দূর করে দেরি হলেও গাড়ি ফিরল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ততক্ষণে রাঙাকাকাবাবুর বাক্স গোছানো আমি সেরে ফেলেছি।

মাঝে মাঝে দোতলায় গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলাম। বাবা কোর্ট থেকে ফিরে স্নান সেরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আশেপাশে বাড়ির লোকজন ঘোরাফেরা করছে। বাবার সঙ্গে দেখা করার ও কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সুবিধে না পেয়ে তিনতলায় ফিরে এসে কীভাবে কী করা যায় চিন্তা করতে লাগলাম। খানিকটা পরে বাবার পায়ের আওয়াজ পেলাম। এগিয়ে দেখি বাবা ধীরভাবে ওপরে উঠে আসছেন। ছাদের আলোটা জ্বেলে দিতে বলে আমাকে নিয়ে ছাদে বেরিয়ে গেলেন। বাবার সঙ্গে এত ভাবগম্ভীর পরিবেশে কথাবার্তা এর আগে আমার আর কখনও হয়নি।

বাবাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাহলেও একটু মৃদু হেসে বললেন, "কী, ঠিক পারবে তো?" প্রথমত, এতটা গাড়ি চালাতে আমার কোনও অসুবিধা হবে কী না, গাড়ির কোনও গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে কী না ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, "গাড়ি চালানোর দিক থেকে আমার কোনও অসুবিধা নেই, ওয়াণ্ডারার গাড়িটার ওপরও বেশ ভরসা করা যায়।"

বাবা মনে মনে যেন সারা পথটা একবার দেখে নিলেন, কোথায়-কোথায় বাধা পাবার বা

ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে, চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, রাঙাকাকাবাবু যতটা নিরুদ্বিগ্ন তিনি ততটা নন। যুদ্ধের সময়, পথে অনেক কড়া পাহারা পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। বিশেষ করে চন্দননগর পার হবার সময় আমাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে বলে বাবার আশঙ্কা ছিল। চন্দননগর ছিল বিরাট ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে একটি ফরাসি উপনিবেশ। একটা ছোট্ট মাপের অন্য রাজ্য বলা চলে। সেখানকার ফরাসি পুলিস নানা জিনিসের, বিশেষ করে মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ধরবার জন্য শুনেছি গাড়িঘোড়া আটক করত।

বাবা বললেন, এত রাত্রে একটা প্রাইভেট মোটরগাড়ি চন্দননগর দিয়ে কেন যাচ্ছে প্রহরীদের এ-রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্য তিনি ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় খুব সাবধান হতে বললেন।

বাবা আরও জানালেন যে, আমার হঠাৎ বারারি যাওয়ার একটা অজুহাত তৈরি রাখার ব্যাপারে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। দরকার হলে বলা হবে যে, আমার বৌদিদির অসুখের খবর পেয়ে বাবা আমাকে নিজের চোখে তাঁকে দেখে আসার জন্য পাঠিয়েছেন। আরও ঠিক হয়েছে যে, আমি বারারি পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব। জানাব যে, বৌদিদি আগের চেয়ে ভাল আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। ছাদের আলোয় বাবা আমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। বললেন, এই ধরনের গোপন কথাবার্তা খোলা আলোকিত জায়গায় হওয়াই ভাল, যাকে বলে 'কন্‌স্পিরেসি আণ্ডার দি ল্যাম্পপোস্ট'। তাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না। তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার একটু মৃদু হেসে 'আচ্ছা' বলে ধীরভাবে নীচে নেমে গেলেন। বুঝলাম, বাবাকে খুব চিন্তায় ফেলেছি।

পরে মা আমাকে বলেছিলেন যে, সেদিন বাবা রাত দুটো পর্যন্ত জেগে ছিলেন, এবং সামনে দিয়ে ওয়াণ্ডারার গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে ছিলেন এবং মাঝে মাঝেই ঘরের পশ্চিমের ছোট বারান্দায় আনাগোনা করছিলেন। ভেবেছিলেন যে, উডবার্ন রোড দিয়েই সম্ভবত আমরা উত্তরে যাব।

ঘড়ির কাঁটাটা বেশ দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। গাড়িতে মাল তুলব কী করে ? কেউ যদি দেখে ফেলে কী বলব ? প্রথমে নীচে নেমে গাড়িটা পরীক্ষা করতে লাগলাম, যেন সার্ভিসিং কেমন হয়েছে দেখছি। গাড়িটা সাম্‌সুদ্দিন গ্যারেজে তুলে রেখেছিল। বের করে একতলার খাবার ঘরের সংলগ্ন প্যান্‌ট্রির বা ছোট-রান্নাঘরের দরজার কাছাকাছি রাখলাম। সদর দরজা দিয়ে মাল নেওয়া যাবে না, লোক বসে আছে। তিনতলা থেকে তিন পর্যায়ে বাক্স-দুটি নামালাম। প্রথমত, এদিক-ওদিক দেখে চট করে সেগুলি দোতলার ড্রয়িং-রুম বা বসবার ঘরে এনে রাখলাম।

ঘরটা অন্ধকার ছিল। দোতলায় চাকরবাকর তো আছেই। তাছাড়া, বিশেষ করে আমার বোন গীতার চোখ এড়িয়ে কাজটা করা চাই। পিঠোপিঠি ভাইবোনেদের সম্পর্কে একটা বিশেষত্ব আছে। যত ভাব, তত ঝগড়া। একজন অন্যের কাছে কিছু লুকোলে বা একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন কিছু করলে, অভিমানের পালা শুরু হয়। কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, বাড়ির সব ব্যাপারে গীতার দৃষ্টিও ছিল খুব সতর্ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখে এলাম দোতলা থেকে একতলার পথ ফাঁকা কি না। চট করে বাক্স দুটো একতলার খাবার ঘরে নিয়ে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেখানেও কেউ ছিল না, ঘরটাও ছিল অন্ধকার। শেষ পর্যায়ে

গাড়ি-বারান্দা থেকে গ্যারাজের সামনে পর্যন্ত টহল দিলাম। সুবিধে বুঝে গাড়ির পেছনের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে রাখলাম। সময়মত বাক্স-দুটি সীটের পিছনের জায়গায় ঢুকিয়ে ফেললাম।

কেউ তো কিছু দেখল না, কিন্তু আমার মনে হল, কোণে দাঁড়িয়ে বাবার গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকটা যেন সব দেখল।

খাওয়াদাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। আমাদের বহুদিনের পুরনো ঠাকুর সত্যবাদীর শরণাপন্ন হলাম। বললাম, বড়ই ক্লান্ত লাগছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে চাই। সত্যবাদী পাণ্ডা বহুদিনের লোক, এককালে মাজননীর ঠাকুর ছিল। প্রায়ই সে আমাদের সঙ্গে অভিভাবকের মতো ব্যবহার করত। তখন ছোটরাও কেউ খায়নি, সত্যবাদী বলতে পারত, না এখন হবে না, যাও। যাই হোক। মা কাছাকাছি থাকাতে কিছু বলল না। খাওয়ার সময় মা এসে পাশে বসে রইলেন।

বাবার ড্রাইভার সাম্‌সুদ্দিন ছিল বেশ বুদ্ধিমান ও কেতাদুরস্ত। সে বাড়িতেই থাকত, কিন্তু খেত বাইরে। ওয়াণ্ডারারের ড্রাইভার তো অসুস্থ মাকে দেখতে আগেই দেশে চলে গিয়েছে। কিন্তু সাম্‌সুদ্দিনকে সরানো দরকার। মাকে বললাম সাম্‌সুদ্দিনকে খেয়ে আসতে বলতে। এই ভাবে একটা-একটা করে পথের কাঁটা সরাতে হল।

নিজের খাওয়া সেরে মায়ের ঘরে গেলাম। পথের খরচের জন্য কিছু টাকা চাইলাম। আলমারি খুলে টাকা বের করতে করতে মা বললেন, "জানি না বাবা, তোমরা কী সব করতে যাচ্ছ!"

আমার নিজের পোশাকের কোনওরকম পরিবর্তন করতে রাঙাকাকাবাবু মানা করেছিলেন—আমাকে তো দুই বাড়ির অনেকেই সেই সন্ধ্যায় দেখবে। ধুতি, শার্ট, গরম কোট, কাবলি জুতো। তবে নিজের জামাকাপড়ের ভেতর থেকে বের করে রাঙাকাকাবাবু নিজের একটা কাশ্মীরি টুপি আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দিনের আলোতে গাড়ি চালাবার সময় টুপি পরে নিতে, যাতে চেহারাটা অন্যরকম দেখায়, অবাঙালি মনে হয়। ওই টুপিটা পরে রাঙাকাকাবাবুর ইউরোপে তোলা অনেক ছবি আছে। সঙ্গে নিজের জন্য জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নিইনি। ছোট্ট একটা ব্যাগই যথেষ্ট ছিল।

আটটা বেজে গিয়েছে। প্রস্তুত হয়ে ধীরে-সুস্থে নীচে নামলাম। গাড়িবারান্দায় একতলার বেয়ারা ধনু বসে ছিল। তাকে বললাম, আমি একটু রিষড়ার দিকে যাচ্ছি। যদি দেরি হয়ে যায় রাতটা ওখানেই থেকে যাব। এগারটা পর্যন্ত দেখে তোমরা দরজা বন্ধ করে দিও।

উলটো দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। উডবার্ন পার্ক থেকে বেরিয়ে ডান দিকে চলে গেলাম। লোয়ার সার্কুলার রোড আর লী রোডের মোড়ের পেট্রল পাম্পে ঢুকলাম। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিলাম, টিনে দু গ্যালন পেট্রল আলাদা করে নিলাম। টায়ারের চাপ ঠিক আছে কি না দেখে নিলাম। তারপর চৌরঙ্গি হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এলগিন রোডে ঢুকলাম। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই গাড়ি চালিয়ে ৩৮/২ এলগিন রোডে ঢুকে গেলাম। বাড়ির শেষ প্রান্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে রান্নাবাড়ির সিঁড়ির কাছে রাখলাম।

রাঙাকাকাবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি সিল্কের ধুতি-চাদর পরে উত্তরের জানালার কাছে মেজেতে পাতা আসনে বসতে যাচ্ছেন। সামনে থালায় খাবার দেওয়া রয়েছে। মাজননী, বাড়ির দুই বৌ আর ছেলেমেয়েরা কয়েকজন রয়েছেন। বোঝাই গেল, নির্জনবাস ও

ব্রত-টত করার যে সঙ্কল্প রাঙাকাকাবাবু প্রচার করেছিলেন, এই লোক-দেখানো অনুষ্ঠানটি ছিল তারই শুরু। ব্যাপারটা আমি দাদাভাইয়ের খাটে বসে নিশ্চল হয়ে দেখলাম। মাঝে মাঝে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ও হল।

॥ ৪৩ ॥

রাঙাকাকাবাবুর আনুষ্ঠানিক আহারের পর বাড়ির বড়রা একে একে যে যার ঘরে চলে গেলেন। মাজননীও নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। মাজননী ও রাঙাকাকাবাবুর ঘরের মধ্যের দরজায় সেই যে খিল দেওয়া হল, ২৬শে জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত আর খোলা হয়নি। পাশের যে ঘরে ইলা থাকত আমি সেখানে সরে গেলাম এবং জ্যাঠাবাবুর বড় ছেলে আমাদের মেজদার সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। রাঙাকাকাবাবুর রেডিওটা ঐ ঘরে রাখা হয়েছিল। খবর-টবর শুনতে শুনতে মেজদার সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা চলতে লাগল। মেজদা—ধীরেন্দ্রনাথ—গণেশ বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। খুব প্রাণখোলা হাসিখুশি লোক ছিলেন তিনি। তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমরা সকলেই তাঁকে নানাভাবে খ্যাপাতাম।

বড়রা প্রস্থান করবার পরেই রাঙাকাকাবাবুর ঘর সাজানো শুরু হল। দেখলাম অরবিন্দকেও রাঙাকাকাবাবু দলে টেনে নিয়েছেন। বিছানার বড় বড় চাদর টাঙিয়ে ঘরটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। উত্তর দিকে ঘরের অর্ধেকটা আলাদা রইল। দক্ষিণের বেশির ভাগটাই দাদাভাইয়ের প্রকাণ্ড খাটটা ঘিরে রইল। আর-একটা ছোট এলাকা করা হল বাইরে যাবার দরজাটার কাছে। সকলকে বলা হয়েছিল, ঐ এলাকা পেরিয়ে কেউ যেতে পারবে না। মাজননীর ঠাকুর সর্বেশ্বরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সে ঐ এলাকা থেকে পরদা একটু সরিয়ে খাবারের থালা একটি নিচু ছোট টেবিলে সময়মতো রেখে যাবে। আবার সময়মতো খালি থালা সরিয়ে নিয়ে যাবে।

ইলা ও অরবিন্দ তারপর রাঙাকাকাবাবুর বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ও গেঞ্জি থেকে সেলাই করা '৬' নম্বর চিহ্নগুলি কেটে ফেলে দিল। সেগুলি হোল্ড-অলে ঢুকিয়ে সেটি বেঁধে রাখা হল।

সর্বেশ্বর ঠাকুর নিজের অজান্তে অন্তর্ধানের পরিকল্পনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দশদিন পরে কিছুই না জেনে সে ২৬শে জানুয়ারি 'আবিষ্কার' করল যে, খাবার আগের দিন রাত্রে খাওয়া হয়নি, যেমন দেওয়া হয়েছিল তেমনই পড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই সে সোরগোল তুলল, নিশ্চয়ই রাঙাকাকাবাবুর কিছু হয়েছে, যাই হোক, সে পরের কথা। সর্বেশ্বর রাঁধতও ভাল, লোকও ছিল চমৎকার। সে ছিল এক সুদর্শন পুরুষ, শরীরের গঠন ছিমছাম। সে হাত-পা দুলিয়ে নাচিয়ের ভঙ্গিতে চলাফেরা করত। সেজন্য বাড়ির সকলেই তাকে উদয়শঙ্করের চেলা বলে ঠাট্টা করতেন।

রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে চান। কারণ আলো হবার আগেই ধানবাদ পৌঁছে যাওয়া ভাল। কিন্তু পথ খালি পাবার জন্য আমাদের ঘণ্টা-চারেক অপেক্ষা করতে হল। রাঙাকাকাবাবু তো ক্রমে ক্রমে বেশ অস্থির হয়ে

পড়ছিলেন। মেজদার তাড়াতাড়িই ঘুম পেত। বেশ খানিকক্ষণ রেডিও শোনা ও কথাবার্তার পর তিনি হাই তুলতে লাগলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাই তুলতে লাগলাম। মেজদা শুতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমিও বললাম—বাড়ি ফিরতে চাই। এরই মধ্যে দ্বিজুদা বা দ্বিজেন আমাকে বলে গেল, রাঙাকাকাবাবু আমাকে জানাতে বলেছেন যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যেন ডান দিকে মোড় নিয়ে এলেনবি রোড ধরে দক্ষিণে চলে যাই। মেজদা তো হাই তুলতে তুলতে উপরে চলে গেলেন। কিন্তু মুশকিল হল সেজদাকে নিয়ে—সেজকাকাবাবুর বড় ছেলে রঞ্জিত বা কার্তিক। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অস্বাভাবিক কিছু-একটা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি এটাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত রাত পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে আমি কেন ও-বাড়িতে রয়েছি। সেজদা ক্রমাগতই দোতলার লম্বা বারান্দায় আর গাড়িবারান্দার ছাদে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। একবার তিনি তিনতলার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন দেখে আমিও জোরগলায় 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক' বলে বেশ আওয়াজ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। একটু পরে পা টিপে টিপে উপরে উঠে আসছি। দেখি সেজদাও তিনতলা থেকে নেমে আসছেন। ধরা পড়ে যাওয়াতে কী-একটা যেন ফেলে গেছি এ-রকম কিছু বলে সরে গেলাম। রমণীকে বলে দেওয়া হল, সে নীচের সদর দরজা বন্ধ করে শুতে যেতে পারে। সে তাই করল। দেখে নেওয়া হল যে, বাড়ির অন্য চাকর-বাকররা যে যার আস্তানায় চলে গেছে। কিন্তু সেজদা কিছুতেই ভোলবার নয়।

যখন রাত একটা বেজে গেল, রাঙাকাকাবাবু দ্বিজুদাকে বললেন সেজদাকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনতলায় শুতে যেতে। আর যদি সেজদা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে, তাকে বলতে যে সন্দেহ করলে তো রাঙাকাকাবাবুর মন্দ বই ভাল হবে না। সুতরাং সন্দেহ চেপে রেখে শুয়ে পড়াই ভাল। দ্বিজুদাকে আরও বলে দেওয়া হল যে, উপর থেকে রাস্তার দিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে এবং সেজদাকে ধরে রেখে ঠিক সময়ে বেশ জোরে গলা ঝাড়া দিতে। তার গলার আওয়াজ পেলে আমরা যাত্রা আরম্ভ করব।

চারিদিক নিস্তব্ধ। রাঙাকাকাবাবুর ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা সেকেণ্ড ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেছে। আমিও যেন আমার হার্টের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। সেই সন্ধ্যার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ পনেরো মিনিট যে কীভাবে কাটল ভগবানই জানেন। দেড়টার সময় দ্বিজুদার গলা-খাঁকারি শোনা গেল। রাঙাকাকাবাবু দরজার কাছের ঘেরা এলাকায় বেরিয়ে এলেন। সেই মুহূর্তে ছদ্মবেশে তাঁকে দেখে বেশ চমকেই গিয়েছিলাম। উত্তর ভারতের মুসলমান মৌলভির বেশে সুভাষচন্দ্র বসুর এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ। ঐ প্রকাশ কজনই বা দেখেছে! ইলার কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে 'গড্ ব্লেস ইউ' বলে আমাদের যাত্রা শুরু করতে বললেন। অরবিন্দ হোল্ড-অলটা তুলে নিয়ে আগে আগে চলল, তার পেছনে রাঙাকাকাবাবু, শেষে আমি। ততক্ষণে চাঁদ বেশ উঠেছে। রাঙাকাকাবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন দেওয়াল ঘেঁষে চলতে, যাতে ছায়া না পড়ে। পা টিপে টিপে চলতে হল। আগেই দেখেছিলাম, রাঙাকাকাবাবু কাবলি জুতোটা পরেননি, পরেছিলেন ইউরোপের মজবুত মোটা হীল্-ওয়ালা ব্রাউন রঙের ফিতে-বাঁধা জুতো। শেষকালে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে অনেক হাঁটতে হবে, কাবলি পরা তাঁর অভ্যাস নেই। ওটা পরে অত হাঁটতে পারবেন না। যে চশমা তিনি ব্যবহার করতেন সেটা রেখে গেলেন। সঙ্গে নিলেন বহুকালের পুরনো রোল্ড গোল্ডের ফ্রেমের চশমা, যেটা তিনি ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে ও দেশে ফিরে ত্রিশ দশকের প্রথমে

পরতেন। বললেন, প্রয়োজনমতো হাঁটবার সময় চশমা পরবেন, অন্য সময় খালি চোখেই থাকবেন।

আমরা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে রান্নাবাড়ির মাঝখানের বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছলাম। কেউ কোথাও নেই, কোনো শব্দ নেই, শুরুটা বেশ নির্বিঘ্নে হবে বলে মনে হল।

রাঙাকাকাবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি পেছনে বসবেন। ব্যবস্থাটা ছিল যে, কোথাও যদি কেউ আমাদের চ্যালেঞ্জ করে বা প্রশ্ন করে, আমি চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাকব—যেন মনিব। রাঙাকাকাবাবু আমার 'শোফার'-এর পার্ট করবেন। প্রয়োজন হলে তিনি চট করে বেরিয়ে এসে সেলাম ঠুকে কথাবার্তা শুরু করে দেবেন। আমি অবশ্য তাঁকে বলেছিলাম, চেহারা দেখে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে আমি মনিব আর আপনি আমার 'শোফার'? রাঙাকাকাবাবু উত্তরে আমাকে বলেছিলেন, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। চুপচাপ বসে থাকবে, আমি ঠিক অ্যাকটিং ক'রে যাব!

পা টিপে টিপে তিনজনে রান্নাবাড়ির সিঁড়ির নীচে পৌঁছলাম। গাড়ি তো সামনেই রয়েছে। অরবিন্দ হোল্ড-অলটা সামনের বাঁ দিকের সীটে রেখে দিয়ে গেটের দিকে চলে গেল। আমি নিঃশব্দে গাড়ির পেছনের বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিলাম। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে রাঙাকাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। এক মুহূর্ত পরেই আমি ইচ্ছা করে পায়ের বেশ আওয়াজ করে ড্রাইভারের জায়গায় বসলাম এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করলাম। পেছনের নিমগাছের ঘুমন্ত কাকগুলো চমকে কা-কা করে উঠল। সামনে চেয়ে দেখলাম গেটটা খুলে গেল। স্টার্ট নিতেও বেশ আওয়াজ হল। ওয়াণ্ডারার বেশ তেজের সঙ্গে যাত্রা শুরু করল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। গেট পার হয়ে ডান দিকে ঘুরলাম, খানিকটা এগিয়ে আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে এলেনবি রোডে ঢুকে পড়লাম। ততক্ষণ রাঙাকাকাবাবু তাঁর পাশের দরজাটা ধরে বসে ছিলেন, যাতে দরজা বন্ধ করার দুটো আওয়াজ না হয়। দরজাটা তিনি বন্ধ করলেন, এক দুর্গম যাত্রা শুরু হল।

যাত্রা করার ব্যাপারে এক অদ্ভুত রকমের অনুভূতি আমার মধ্যে অনেকদিন কাজ করত। আমার মনে হত ঐ গোপন যাত্রার দুই নীরব সাক্ষী থেকে গেল—উডবার্ন পার্কের নীচের বারান্দার প্রহরী বাবার গ্র্যাণ্ড ফাদার ঘড়িটা আর এলগিন রোডের বাড়ির নিমগাছটা। দুই সাক্ষী যেন এখনও আমাকে বলে, আমরা কিন্তু জানি।

॥ ৪৪ ॥

এলেনবি রোড থেকে বাঁ দিকে ঘুরে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড ধরে ল্যান্সডাউন রোডে পড়লাম। দক্ষিণে যাবার উদ্দেশ্যটা ছিল বেশ পরিষ্কার—যদি পুলিশের কোনো চর গাড়ি বেরুতে দেখে থাকে, সে মনে করবে, হয়তো বা কাউকে বাড়ি পৌঁছতে গাড়ি দক্ষিণে গেল, পুলিশের দফতরেও রিপোর্ট হবে সেই রকম।

রওনা হবার পর বেশ কিছুক্ষণ আমি বারবার পেছনের দিকে দেখছিলাম। রাঙাকাকাবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি গাড়ি চালাতে চালাতে পেছনে ফিরে ফিরে দেখছি। আমি দেখছিলাম কেউ ফলো করছে কি না। ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের একটু পেছনে

একটা গাড়ির আলো দেখেছিলাম। গাড়িটা অন্য দিকে মোড় নেওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

প্রথমেই যাত্রার শুরুতে দেরি হওয়ার কথা উঠল। আমাদের হিসাবমতো অন্তত তিন ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। রাঙাকাকাবাবু বললেন, শেষ পর্যন্ত পথ পরিষ্কার করতে না পারলে তিনি সে রাত্রে রওনা হবার প্ল্যান 'গিভ আপ' করতেন। আমি তো শুনে আঁতকে উঠলাম। তিনি বললেন, এই ধরনের গোপন কাজে উপায় না থাকলে অনেক সময় সন্দিহান আত্মীয়স্বজন বা নিকট-বন্ধুদের খানিকটা দলে টেনে নিতে হয়। মুখ বন্ধ করার এ একটা উপায়। গোপন বৈপ্লবিক কাজে যত কম লোককে জড়ানো হয় ততই ভাল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয়। যাই হোক, যাত্রা মোটামুটি শুভ হয়েছে বলেই তো আমার মনে হল।

একেবারে শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় চূড়ান্ত কথাবার্তার সময় রাঙাকাকাবাবু একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, আমি যে তাঁকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছি সেটা খুব বেশি দিন গোপন থাকবে না, 'লিক' হয়ে যাবে। কারণ, এলগিন রোডের বাড়ি এত বড় এবং এত রকমের লোকজন সেখানে যাওয়া-আসা করে যে, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে। বললেন, তাতে আর কী হয়েছে, যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন জেলে থাকবে, দেশের কত লোকই তো জেলে রয়েছে। তবে নিজের সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী ছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা যদি দিন-চারেক কোনোরকম করে ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারো, তাহলে আমি 'পগার পার হয়ে যাব।'

১৯৪২ সালের শেষের দিকে আমি যখন বন্দী অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছি তখন বাবা দক্ষিণ ভারতের জেল থেকে এক গোপন বার্তায় জানিয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানে আমার ভূমিকার কথা ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ জানে। অবশ্য খবরটা বেরিয়ে যাবার সূত্রটা তিনি বলেননি।

ল্যান্সডাউন রোড থেকে সার্কুলার রোড ধরে শেয়ালদার দিকে এগোলাম। এখান-সেখানে দু-একটা ঠেলা বা ঘোড়ারগাড়ি চোখে পড়ল। রাস্তায় লোকজন ছিল না বললেই হয়। শেয়ালদার কাছাকাছি রাস্তায় বেশ কিছু ফিটন গাড়ি ঘোরাফেরা করছিল। গাড়ির গতি কমিয়ে নিতে হল। আমার মাথায় দুটি প্রশ্ন ঘুরছে, প্রথম কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কি না, দ্বিতীয়, সময় নষ্ট হচ্ছে কিনা। গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের ঘড়িটায় আলো জ্বলছিল না। সেজন্য আমি বারবার বাঁ হাতে টর্চের আলো ফেলে সময় দেখছিলাম। চারদিকে লোকজন, গাড়িঘোড়া। রাঙাকাকাবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, টর্চের আলো রিফ্লেক্ট করে তাঁর মুখে পড়ছে, আমি যেন টর্চ না জ্বালাই।

হ্যারিসন রোড ধরে যখন বড়বাজার পার হলাম কী রকম যেন অদ্ভুত লাগল। কলকাতার ওই এলাকা যে অত নির্জন হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। হাওড়া ব্রিজের মুখে দু-একটা ট্যাক্সি দেখা গেল। কেবলই মনে হচ্ছিল গাড়ির চাকার আওয়াজটা বড়ই বেশি হচ্ছে, পাথরে বাঁধানো রাস্তা তো। যখন হাওড়া ব্রিজে উঠলাম, আওয়াজটা যেন আরও বেড়ে গেল। কেন যে মোটর গাড়ি পা টিপে টিপে চলতে পারে না! সকলে জেগে যাবে যে! জলের ওপর জাহাজ ও নৌকাগুলো ঘুমিয়েই রইল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই

ব্রিজ দিয়ে হরিপুরা কংগ্রেস থেকে ফেরার সময়, এক বিরাট শোভাযাত্রা করে রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কী অদ্ভুত পট-পরিবর্তন। হাওড়ার সবকিছুই নীরব। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে মনে হল, মুক্তি পেয়েছি। জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া যাবে এবার। ততক্ষণে চাঁদও বেশ উঠেছে, যেন পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

একটু পরেই রাঙাকাকাবাবু ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, যদিও বাবার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে যে, আমি বারারি পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব, তাঁর মনে হয় কাজটা ঠিক হবে না। কেন মিছিমিছি সরকারি দফতরে আমার কলকাতার বাইরে যাওয়ার একটা রেকর্ড থেকে যাবে। রওনা হবার আগেই অবশ্য তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি কোনো ডাকবাংলোয় আশ্রয় না নিয়ে দাদার বাড়িতেই ছদ্মবেশে দিনটা কাটাবেন। নীতিটা হল, অপরিচিত লোকের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে ধরা দেওয়া ভাল। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বারারির জন্য যে অভিনয়ের প্ল্যান করেছিলেন, সেটা বেশ উতরে যাবে।

রিষড়া পার হবার সময় আমাদের বাগানবাড়িটা রাস্তার ধার থেকে রাঙাকাকাবাবুকে দেখিয়ে দিলাম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর শিল্পাঞ্চল পেছনে ফেলে বেশ স্পীডেই বেরিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে বন্দুকধারী পুলিশ দেখা গেল। মনে হল তারা যেন অবাক হয়েই আমাদের দেখছে, কিন্তু কেউই আমাদের পথ আগলাবার চেষ্টা করল না। এ সময়েই রাঙাকাকাবাবু ডি ভ্যালেবার জেল থেকে পালাবার কথা পাড়লেন।

পথের হিসেব রাখার জন্য আমি ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলে রাস্তার মাইলস্টোনগুলি দেখছিলাম। গাড়ির স্পীড মাঝারি কিন্তু সমান রেখেছিলাম। বেশি জোরে চালিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বর্ধমানের কাছাকাছি একটা রেলের লেভেল-ক্রসিংয়ে প্রথম আটকালাম। ইলা সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি দিয়েছিল। ভাবলাম একটু কফি খেয়ে নিই। রাঙাকাকাবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি মাঝে মাঝে তোমাকে কফি ঢেলে দিই, তুমি গাড়ি চালাও আর খাও।" এমনভাবে কথাটা বললেন যে আমিই কোনো বড় কাজে বেরিয়েছি, তিনি আমাকে সাহায্য করবার জন্য রয়েছেন। আর এমন স্নেহের সুরে কথাটা বললেন যে, আমি তো অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তাঁর কথাই রইল।

আমি ফিরে বললাম, "আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন না।"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, গাড়ির একমাত্র যাত্রীর ঘুমোনো উচিত নয়, ড্রাইভারের নিঃসঙ্গতা বাড়ে, ঘুমও পেয়ে যেতে পারে।" তিনি দেশের নানা জায়গায় ট্যুর করবার সময় বহুবার মোটরগাড়িতে রাত জেগেছেন। তাঁর কিছু অসুবিধা হবে না।

ট্রেন তো চলে গেল কিন্তু লেভেল-ক্রসিংয়ের প্রহরীটি ঘুমিয়ে পড়েছে। গেট আর খোলে না। এঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে আমাকে হাঁকাহাকি করতে হল। গেট তো খুলল, কিন্তু গাড়ি আর স্টার্ট নিতে চায় না। দেখে রাঙাকাকাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বুঝলাম, হঠাৎ থামবার জন্য তেল বেশি এসে গিয়েছে। রাঙাকাকাবাবুকে আশ্বস্ত করলাম। একটু পরে ওয়াণ্ডারার সজোরে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। বর্ধমান যখন পার হলাম তখন প্রায় সাড়ে চারটে হবে। ওই সময়টায় সকলে ঘুমোয় বেশি, সুতরাং কোনো সমস্যা ছিল না। আসানসোলের দিকে এগিয়ে চললাম। হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল

আঁকা-বাঁকা। বর্ধমান থেকে আসানসোল, ধানবাদ মোটামুটি সিধে রাস্তা, তবে উঁচু-নিচু। মাঝে পড়বে দুর্গাপুর। দুর্গাপুরের চেহারা ছিল তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। দুর্গাপুরের জঙ্গলে প্রায়ই ডাকাতি-টাকাতি হয় বলে শোনা যেত। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লালমাটির রাস্তা চলে গেছে। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ ওই সময়টাতে পেয়েছিলাম। ডাকাত অবশ্য পড়েনি। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে একপাল মোষ রাস্তার ওপরে এসে পড়ায় বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিলাম। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল, গাড়ি থামিয়ে ফেললাম। তবে মোষগুলো গাড়ির আশেপাশে ধাক্কাধাক্কি করে রাস্তার অন্য পারে চলে গেল। দেখলাম, অত রাতেও দু-চার জন লোক লাঠি চালিয়ে মোষগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আসানসোলের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। এটাই আমরা চাইনি, কিন্তু উপায় কী? আমার আবার মাথায় চাপল যে, পেট্রল নেব। রাঙাকাকাবাবুর মত ছিল না, বললেন, "না নিলে হয় না? দু গ্যালনের টিনটা তো সঙ্গেই ছিল। কিন্তু আমি বললাম, "কোনো চান্স নিতে চাই না।"

আসানসোল শহরে ঢোকার আগেই একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করালাম। যতটা পারি এগিয়ে রাখলাম যাতে পাম্পের লোকটি রাঙাকাকাবাবুকে সোজাসুজি দেখতে না পায়। তাঁরই দেওয়া কাশ্মীরি টুপিটি মাথায় দিয়ে নামলাম। গাড়ির বেশ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে দাম মেটালাম। লোকটি দোকানঘরের দিকে রওনা দেবার পরে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এবার স্পীডও বাড়ালাম। আসানসোল থেকে ধানবাদের পথে দু-চারটে গাড়ির সঙ্গে মোলাকাত হল। যখনই লোকজনের জটলা বা গাড়ি দেখি, গতিটা বাড়িয়ে দিই। সেই চেনা গোবিন্দপুরের কাছাকাছি এসে খানিকটা দূর থেকেই দেখতে পেলাম একটা লম্বা বাঁশের বেড়া রাস্তার ওপর নেমে আসছে। একটি লোক রাস্তার পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির নম্বর টুকে নিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বেড়াটা উঠে গেল। আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ধানবাদের রাস্তা ধরলাম। রাঙাকাকাবাবু বার দুয়েক জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক দেখেছ যে গাড়ির নম্বর নিয়েছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

॥ ৪৫ ॥

বারারির পথে যখন ধানবাদ শহরের এক পাশ দিয়ে বেরোচ্ছি, তখন কেমন যেন আশঙ্কা হল, কেউ যদি দেখে ফেলে! তখন তো বেশ আলো ফুটে গেছে। সেজন্য গাড়ির স্পীডটা যতটা পারি বাড়িয়ে দিলাম। দিনের আলো ছিল বলেই বোধহয় বারারির রাস্তা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে পারতাম! দূর থেকে যখন দাদার বাড়িটা দেখতে পেলাম, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সতেরোই জানুয়ারির সারা দিনের প্ল্যানটা কী রকম হবে এবং আমাকে কীভাবে কী করতে হবে, সব কিছু রাঙাকাকাবাবু আমাকে পাখি পড়াবার মতো করে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে দাদার বাড়িটা কিছু দূর থেকে ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে রাস্তায়

নামিয়ে দেব। আমি একলা গাড়ি চালিয়ে দাদার বাড়িতে উপস্থিত হব। দাদাকে বলব যে, আমি ছদ্মবেশে রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে এসেছি। তিনি কিছুক্ষণ পরে হেঁটে দাদার বাড়িতে হাজির হবেন। এসে বাড়ির বেয়ারাকে বলবেন যে, তিনি দাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। দাদাকে বলবেন, তিনি একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা বলতে চান। দাদা উত্তরে বলবেন যে, তাঁকে তো একটু পরেই কারখানায় চলে যেতে হবে, সুতরাং সকালে কথা বলার সময় হবে না। তাতে রাঙাকাকাবাবু বলবেন যে, তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। সন্ধ্যার আগে ট্রেনও নেই। দাদা যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে বাইরের কোনো ঘরে দিনটা কাটাতে দেন, তাহলে তিনি খুব বাধিত হবেন। কথাবার্তা সবই ইংরেজিতে হবে, আশপাশের লোকজন শুনতে পেলে ভালই।

দাদা তারপর তাঁর লোকজনকে হুকুম দেবেন যে, আগন্তুকের থাকার জন্য বাইরের দিকের ঘরে ব্যবস্থা করে দিতে। তারপর তিনি রাঙাকাকাবাবুকে বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে আসবেন এবং অন্য লোকজনের সামনে ইংরেজিতে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। চা খাবার পরে রাঙাকাকাবাবুকে বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দাদা যখন দুপুরে খেতে আসবেন তখন শলাপরামর্শ করে সন্ধ্যায় আবার যাত্রার প্ল্যানটা পাকা করে ফেলা হবে।

আমি দাদার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম দুটি লোক সামনেই রয়েছে, তার মধ্যে একজন ড্রাইভার, সে দাদার গাড়িটা পরিষ্কার করছিল। আমাকে যে তারা একলা আসতে দেখল, তাতে আমি খুশিই হলাম। কফির ফ্লাস্ক আর আমার হাতে ছোট ব্যাগটা নিয়ে সময় নষ্ট না করে বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। ড্রাইভারকে বললাম, গাড়িটা যেন সে গ্যারাজে তুলে দেয়। রাঙাকাকাবাবুর জিনিসপত্র গাড়ির ভেতরেই রইল। আমি সে-বিষয়ে কিছু বলিনি। বেলায় কিন্তু দাদার ড্রাইভার আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসগুলি নামিয়ে আনবে কি না। ওদিকে তার দৃষ্টি পড়ায় আমি একটু চিন্তিতই হয়েছিলাম।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, দাদার ঘরের দরজা বন্ধ। খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। দাদা দরজা খুলতে দেরি করাতে আমি অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। আশঙ্কা হচ্ছিল, দাদাকে যা বলার আছে, তা বলার আগেই যদি রাঙাকাকাবাবু পৌঁছে যান তাহলে মুশকিল হবে। যাই হোক, দাদা দরজা খুলতেই আমাকে যা পড়ানো ছিল মুখস্থ বলে গেলাম। দাদা যে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তা তাঁর মুখের চেহারা থেকেই বোঝা গেল।

একটু পরেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে, এক মুসলমান ভদ্রলোক দাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। দাদা বারান্দায় বেরিয়ে কথাবার্তা বললেন। অবশ্যই যেমন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি বসবার ঘর থেকে তাঁদের কথাবার্তা শুনলাম।

আগন্তুক দিনের বেলাটার জন্য আশ্রয় চাওয়াতে দাদা তাঁকে বসবার ঘরে এসে বসতে বললেন। বেয়ারাকে ডেকে তাঁকে চা দিতে বললেন এবং আমার সঙ্গে ইংরেজিতে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। হাসি যে পাচ্ছিল না তা নয়, তবে নিজেকে আমি সংযত রাখতে পেরেছিলাম। একটু পরেই আমি বাড়ির ভেতরের দিকে চলে গিয়ে বৌদিদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম।

বেয়ারাকে বলা হল অতিথিকে প্রাতরাশ বাইরের ঘরে দিতে। ঘরটা কিন্তু শোবার ঘরই ছিল। সারা সকালটা রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ হল না। বেয়ারার কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল অন্তত তার ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যান সফল হয়েছে। সে বলল,

তার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক উত্তরপ্রদেশের খানদানি মুসলমান। দাদা দুপুরে খেতে এলেন। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর কথাবার্তা হল।

আসানসোল বা ধানবাদ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরাটা ঠিক হবে না মনে হল। কারণ, স্টেশনগুলি বড়, লোকজন অনেক। ধানবাদের পরের স্টেশন গোমোকেই রাঙাকাকাবাবু বেছে নিলেন। স্টেশনটা ছোট, তা ছাড়া রাতও বেশি হবে, লোকজন থাকবে না। সমস্যা হল বারারি থেকে গোমো যাবার রাস্তা আমার ভাল জানা নেই। আমি চাইলাম, দাদা আমাদের সঙ্গে থাকুন। কিন্তু অন্য এক সমস্যা দেখা দিল। ওই এলাকায় অত রাতে বৌদিদিকে একলা বাড়িতে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু বললেন, বৌদিদিও সঙ্গে যাবেন। বৌদিদিকে প্রস্তুত করবার ভার দাদার ওপর রইল।

আমরা যখন ভেতরে খাওয়া-দাওয়া করছি, রাঙাকাকাবাবু তখন অন্য ঘরে অতিথির মতো রয়েছেন। আমি তো একেবারে দূরে সরে রইলাম, যাতে কেউ না মনে করে যে, আমার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ আছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাঙাকাকাবাবু বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোলেন। তাঁর গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমি গাড়ি বাগিয়ে দুপুরে বেরিয়ে পড়লাম। ঝরিয়ার বাজারে গিয়ে গাড়িতে পেট্রোল ভরলাম, চাকার হাওয়া-টাওয়া চেক্ করলাম, বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

শীতের দিন, দাদার কারখানা থেকে ফিরতে-ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। আবার একবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর পাকাপাকি কথাবার্তা হল।

বাড়ির লোকজনদের বলা হল যে, সন্ধ্যার পরে আমাকে নিয়ে দাদা-বৌদিদি বেড়াতে বেরোবেন, সেজন্য সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হবে। অতিথিকেও তাঁর ঘরে খাবার দিতে বলা হল। খাওয়া সেরে রাঙাকাকাবাবু আবার পুরো ছদ্মবেশ ধারণ করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সেখানে বেশ জোর গলায় ইংরেজিতে দাদাকে ও আমাকে গুডবাই বলে বাড়ি থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই ওয়াণ্ডারার গাড়িতে করে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা এগিয়ে রাস্তার ধারে রাঙাকাকাবাবুকে পেলাম এবং তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলাম। তারপর দাদার নির্দেশমতো গোমোর দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। বেশি দূর নয়, মাইল-তিরিশেক পথ। দিল্লি-কালকা মেল গোমো পৌঁছতে রাত দেড়টা তো হবেই। হাতে সময় অনেক। সকলকে মুখ বন্ধ করে রাখার একান্ত গুরুত্ব সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু বার বার বললেন। আমাকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে যারা ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানে, যেমন ইলা, দ্বিজেন ও অরবিন্দ তাদের বিশেষ করে বলতে বললেন, 'টু কীপ দেয়ার মাউথ শাট্।' পথে আমরা দুবার দাঁড়ালাম, একবার বনেঘেরা রাস্তার মধ্যে, আর একবার জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ধানের খেতের ধারে। প্রথমবার গোরুর গাড়ির এক লম্বা সারি আস্তে আস্তে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। বনের মধ্যে নির্জন রাতে গোরুগুলোর গলায় ঝোলানো ঘণ্টার মৃদু আওয়াজের সঙ্গে গাড়িগুলির নীচে টিমটিমে আলো মিলে যেন একটা স্বপ্নের রাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ধানের খেতের উপর জ্যোৎস্না যেন আছড়ে পড়ছিল। প্রকৃতির ওই স্নিগ্ধ চেহারা আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করে ফেলেছিল। ভাবছিলাম, এখন তো সবই খুব শান্ত, পরে কি ঝড় উঠবে!

গোমো স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন ট্রেন আসতে কিছু দেরি আছে। সেখানেও

সকলে ঘুমন্ত। স্টেশনের বাইরের চত্বরে গাড়ি রেখে রাঙাকাকাবাবুর তিনটি জিনিস নামিয়ে ফেললাম। পাশেই একটা ঢাকা দালান। অনেক ডাকাডাকি করে একটি কুলি পাওয়া গেল। সে জিনিসগুলি তুলে নিল। কয়েক মুহূর্ত আমরা নিষ্পলকে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। শেষে রাঙাকাকাবাবু বললেন, "আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও।" তারপর ধীর পদক্ষেপে ওভারব্রিজের দিকে এগোলেন।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর স্বাভাবিক দৃপ্ত ভঙ্গিতে ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। পরে মনে হল, বসুবাড়ির রীতি-মতো প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছি।

স্টেশনের বাইরে এসে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হুশ্-হাশ্ শব্দ করে ট্রেন ছাড়ল। দেখতে পেলাম, দিল্লি-কালকা মেল একটি আলোর মালার মতো চাকার আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে নাচতে নাচতে দৃশ্যের বাইরে চলে গেল।

বারারিতে যখন ফিরলাম তখন রাত তিনটে হবে। ঘুমিয়ে পড়লাম। দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল নটা নাগাদ কলকাতার দিকে রওনা দিলাম। মনটা তখন একেবারে হালকা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ভার যেন নেমে গেছে। নিজের মনে এত গান আমি কখনও গাইনি। কেউ তো আর শুনতে পাচ্ছে না, সুতরাং গলা ছেড়েই গাইলাম। মাঝে মাঝে থেমে বাংলার মাঠ, ঘাট, গ্রাম ও ধানের খেত দেখলাম। চুঁচুড়ার কাছাকাছি পুলিশের একটা সমাবেশ দেখে হঠাৎ মনে হল, ওরা হয়তো আমাকে ধরার জন্যই অপেক্ষা করছে! পুলিশেরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না। ওয়াণ্ডারার গাড়িটা কোনোরকম অসুবিধা না ঘটিয়ে বেলা চারটে নাগাদ আমাকে ১ নম্বর উডবার্ন পার্কে ফিরিয়ে আনল। বাড়িতে ঢুকতেই বাবার ড্রাইভার সাম্‌সুদ্দিন এগিয়ে এল। তার হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি দোতলায় ওঠে গেলাম।

॥৪৬॥

বাড়িতে ফিরেই আমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। দোতলার দালান থেকে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলাম, বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। সেদিনটা ছিল শনিবার, কোর্ট নেই, সুতরাং অবসর থাকার কথা। মাঝের বড় ঘরে মা ছিলেন, চোখাচোখি হয়ে গেল। তাতেই কাজ হল, বাবা খবর পেয়ে গেলেন। আমি সরে এসে ড্রয়িং-রুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই বাবা এসে পড়লেন। বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন সব-কিছু ঠিকমতো হয়েছে কি না। আমি বাবাকে মোটামুটি সবটাই সংক্ষেপে বললাম এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে, আমাদের পুরো পরিকল্পনাটাই খুব ভালভাবে কার্যকর করা গেছে। কিন্তু বাবা যখন বললেন যে, তিনি আমার কাছ থেকে কোনো টেলিগ্রাম আশা করেননি, তখন আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। তিনি বললেন, আমরা চলে যাবার পর তাঁরও মনে হয়েছিল যে, কাজটা ঠিক হবে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কতটা ক্লান্ত। এতক্ষণ আমার কিছুই মনে হয়নি, কিন্তু বাবা কথাটা তোলার পরেই যেন বুঝতে পারলাম, পা দুটো বেশ ধরে গিয়েছে আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। সেদিনই দেশবন্ধুর নাতনি মিনুর বিয়ে। বাবা বললেন যে, আমাকে কিন্তু

বিয়েবাড়ি যেতেই হবে। আমি অনুপস্থিত থাকলে নানা লোকে নানা প্রশ্ন তুলবে। বাড়ির অন্যেরা আগে চলে যাক। বাবার কিছু কাজ আছে, তিনি খানিকটা পরে যাবেন। তাঁর সঙ্গে আমি যাব। উপরে নিজের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। রাঙাকাকাবাবুর কথা বারে বারে মনে হচ্ছিল, সেজন্য ঘুম হল না। পরে স্নান-টান সেরে বিয়েবাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

বাবা কাজ সেরে আমাকে ডাক দিলেন। তাঁর সঙ্গে বড় স্টুডিবেকার গাড়িতে চড়ে বিয়েতে গেলাম। মনে হল যেন অন্য জগতে ছিলাম। আবার মর্তে ফিরে এসেছি। আমার এক সমবয়সী বন্ধু সেখানে আমাকেই রাঙাকাকাবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে বসলেন। বললাম, তাঁর শরীরটা তো মোটেই ভাল নেই, বেরোচ্ছেন না, জেলে ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছেন। ভাল খেয়ে-দেয়ে বাড়িতে ফিরেই শুয়ে পড়লাম। পরের দিন রবিবার মা'র কাছ থেকে দুদিনের রিপোর্ট নিতে হবে।

পরে বাবার ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসের ডায়েরির পাতা উলটে-পালটে দেখছিলাম। দেখলাম ১৫ই থেকে ১৭ই জানুয়ারি পাতাগুলি একেবারে ফাঁকা, কিছুই লেখেননি। ১৮ই জানুয়ারির পাতায় সকালে আইন-ব্যবসায় সংক্রান্ত একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং নীচের দিকে মিনুর বিয়ের কথা লেখা আছে।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার হঠাৎ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলেছে কি না। গীতাকে নিয়েই সমস্যা। সে সবদিকে নজর রাখে, বিশেষ করে আমার গতিবিধির উপর। মা বললেন যে, সেদিন রাত্রে বা পরের দিন সারাদিন সে কিছু লক্ষ করেনি। সে ভেবেছিল আমি হয়তো ১৭ই জানুয়ারি খুব সকাল-সকাল মেডিকেল কলেজে চলে গিয়েছি। কিন্তু ১৭ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় গীতা ক্রমাগতই জিজ্ঞাসা করতে থাকে, লালদা (মানে আমি) কেন বাড়ি ফিরছে না। মা তো জানেন যে, আমি প্রায় আরও চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ি ফিরব না। গীতাকে মা বললেন যে, রাঙাকাকাবাবুর কোনো কাজে আমি কলকাতার বাইরে গেছি। আমি মাকে বললাম, কেন তিনি রাঙাকাকাবাবুর নাম করতে গেলেন। তিনি উত্তরে কিছু বললেন না। আমি পরে কারণটা বুঝলাম, রাঙাকাকাবাবুর নাম করে বললে গীতা আর কোনো প্রশ্ন তুলবে না।

আর দুজন সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল, ডাঁটিদাদা (রবীন্দ্রকুমার ঘোষ) ও মেজদা (গণেশ বা ধীরেন্দ্রনাথ)। এই দুজন প্রায় রোজই সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আসতেন। আমরা একসঙ্গে রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনতাম। জার্মানরা তখন তাদের ডুবোজাহাজ থেকে টর্পেডো চালিয়ে ইংরেজদের একটার পর একটা জাহাজ ডোবাচ্ছে। আকাশ থেকেও ইংল্যাণ্ডের উপর বোমা-টোমা ফেলছে। ইংরেজদের নাস্তানাবুদ হতে দেখে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই খুব আনন্দ হত। ইংরেজদের কটা জাহাজ ডুবল, জার্মানরা ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে রেডিওতে তা ঘোষণা করত। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে ডাঁটিদা আর মেজদা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতেন। জার্মানদের কোনো বিপর্যয় হলে দুজনেই গম্ভীর মুখ করে বাড়ি ফিরে যেতেন, মোহনবাগান হেরে গেলে যেমন অনেকের হত। যা-ই হোক, আমি মার কাছে শুনে আশ্বস্ত হলাম যে, দুদিন সন্ধ্যায় দুজনের মধ্যে কেউই আসেননি।

বাবা আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আগের মতো আমি যেন রোজই এলগিন রোডের বাড়িতে যাতায়াত করি। বাড়িতে ফেরার পরের দিন সন্ধ্যায় এলগিন রোডের বাড়িতে

প্রথমেই ইলার সঙ্গে দেখা করলাম। পরে তিনতলার ছাদে দ্বিজেন, অরবিন্দ ও ইলার সঙ্গে কথাবার্তা হল। ওদের জানালাম যে, সবই প্ল্যানমতো হয়েছে এবং রাঙাকাকাবাবু সকলকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন 'টু কীপ দেয়ার মাউথস্ শাট্'। পর পর কয়েকদিন গল্পগুজবের পর ইলা এদিক-ওদিক দেখে আমাকে রাঙাকাকাবাবুর পর্দা-টাঙানো ঘরে ঢুকিয়ে দিত। আমি ভিতরে গিয়ে বেশ একথালা মিষ্টি, ফল ইত্যাদি খেয়ে বেরিয়ে আসতাম। একদিন আমরা ক'জন গাড়িবারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। রাঙাকাকাবাবুর খালি ঘরে নিয়মমতো আলো জ্বলছে। মেজদা হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কী করে যে মানুষ ঐরকমভাবে একটা ঘরে নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারে, তিনি বুঝতে পারেন না। শুনে চমকে উঠলাম। ভাবলাম তিনি কি কিছু সন্দেহ করে কথাটা বললেন, না বিশ্বাস করেই নিজের মনের কথা প্রকাশ করলেন।

সোমবার ২০শে জানুয়ারি আলিপুর কোর্টে রাঙাকাকাবাবুর মামলা উঠবে। সেদিন তাঁর কোর্টে হাজির হবার কথা। রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, আমরা যদি দিন তিন-চার ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারি, তাহলে তিনি ঠিক 'পগার পার' হয়ে যাবেন। কিন্তু সোমবারের মামলাটা অন্তত সপ্তাহখানেক মুলতবি রাখবার চেষ্টা করতে তিনি বলে গিয়েছিলেন।

হাতে নতুন ডাক্তারি সার্টিফিকেট নেই। এমনিতেই সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধা হচ্ছিল। নতুনকাকাবাবু ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে শেষের দিকে বলছিলেন যে, জেলে যাওয়া তো সুভাষের ডালভাত। সে জেলে যাওয়া এড়াবার জন্য বারবার ডাক্তারি সার্টিফিকেট চাইছে কেন, এটা ভাল দেখায় না। ডাক্তার মণি দে যখনই আসেন, নতুনকাকাবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে আসেন। নতুনকাকাবাবু যদি বেঁকে বসেন, তাহলে ডাক্তার দে'র কাছ থেকে সার্টিফিকেট বের করা যাবে না। সুতরাং শেষবার রাঙাকাকাবাবু বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জিকে ডাকবেন। ডাক্তার চ্যাটার্জির সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। রাঙাকাকাবাবু ব্যবস্থা করলেন যাতে নতুনকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা না করিয়ে পঞ্চাননবাবুকে সোজা তাঁর ঘরে নিয়ে আসা হয়। রাঙাকাকাবাবুর তো অনেকদিনের সায়াটিকার ব্যথা ছিল। সার্জেনকে আলাদা করে দেখানোতে কোনো অপরাধ নেই। ডাক্তার চ্যাটার্জি রাঙাকাকাবাবুকে পরীক্ষা করে ঠিকমতো সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই সার্টিফিকেট তো একবার ব্যবহার করা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, পঞ্চাননবাবুর কাছে গিয়ে শেষবারের মতো 'রুগি না দেখে' আর একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করব। আমি যদিও তখন মেডিকেল কলেজে জুনিয়র ছাত্র, পঞ্চাননবাবু আমাকে চিনতেন। সোমবার সকালে ওয়াণ্ডারার গাড়ি চড়ে মেজদা, গণেশ, দ্বিজেন ও আমি বিডন স্ট্রীটে পঞ্চাননবাবুর বাড়ি ছুটলাম। কিন্তু তার আগেই ডাক্তার বেরিয়ে পড়েছেন। তখন আমরা তাঁর খোঁজে মেডিকেল কলেজে এলাম। হাসপাতালে পঞ্চাননবাবুর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি তিনি সেখানেও নেই। এদিকে কোর্টের সময় তো এগিয়ে আসছে। তখন আমরা ঠিক করলাম যে, দেরি না করে আমরা রাঙাকাকাবাবুর কৌসুলি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাব। কালীঘাটে তাঁর বাড়ির সামনে আমি কিন্তু গাড়িতেই বসে রইলাম, যেমন মেডিকেল কলেজে অন্যেরা গাড়িতে বসে ছিলেন। দেবব্রতবাবু নাই বা

Saturday 18 JANUARY 1941

Beng.—5 Magh 1347—Panchami 10-45 A.M.

١٩ ذى الحجه شنبه ١٣٥٩

বাবার ডায়েরীর এক পাতা—১৮ই জানুয়ারী ১৯৪১

জানলেন যে, ব্যাপারটার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ আছে। যাই হোক, দ্বিজেন ও মেজদা দেবব্রতবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। দেবব্রতবাবু আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা সপ্তাহ মামলাটা আটকে রাখতে। দেবব্রতবাবুকে বলা হয়েছিল যে, রাঙাকাকাবাবু শেষবারের মতো এক সপ্তাহ সময় চাইছেন, পরের সোমবার তিনি অতি অবশ্য কোর্টে হাজির হবেন। দুপুরেই খবর পাওয়া গেল যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাঙাকাকাবাবুর উকিলের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাগ্যিস সময়টা পাওয়া গিয়েছিল। কারণ, পরে জানতে পেরেছিলাম যে, পেশোয়ার থেকে আফগান সীমান্তের দিকে রওনা হতে রাঙাকাকাবাবুর বেশ কয়েকদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন-দুয়েক খুব সাবধানে কাটাতে হল। প্রথমত রাঙাকাকাবাবুর নির্জনবাসের ধোঁকাটা ঠিকমতো চালু থাকা চাই। পরের বড় সমস্যা হল, কীভাবে তাঁর অন্তর্ধানের খবরটা ফাঁস করা হবে। আমাদের বরাত ভাল যে, বাইরের কেউ নির্জনবাসের ব্যাপারে অস্বাভাবিক কৌতূহল বা সন্দেহ প্রকাশ করেননি। পুলিশের দিক থেকে তো বিশেষ কোনো ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়নি।

বাবা চিন্তা করে মনে মনে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিলেন। এ-বিষয়ে সব ঠিকঠাক করার জন্য একদিন দুপুরে বাবা উডবার্ন পার্কের তাঁর শোবার ঘরে দ্বিজেন, অরবিন্দ আর আমাকে ডাকলেন। ঠিক হল, শনিবারের খাবারটা না-খেয়ে ফেলে রাখা হবে। রাঙাকাকাবাবু কেন খাবার খাননি, সর্বেশ্বর ঠাকুর নিশ্চয়ই এই নিয়ে শোরগোল তুলবে। তখন অরবিন্দ, দ্বিজেন ও অন্যেরা প্রথমে পর্দার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করবে। সাড়া না-পেয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে 'আবিষ্কার' করবে যে, রাঙাকাকাবাবু ঘরে নেই। তারপর শুরু হবে দৌড়দৌড়ি ও খোঁজাখুঁজি। বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে অভ্যাসমতো

উইক-এনড্-এর ছুটি কাটাতে রিষড়ার বাগানবাড়িতে থাকবেন। 'আবিষ্কার'-এর পর একদল গাড়ি নিয়ে ছুটবে বাবাকে খবর দিতে। অতঃপর বাবা যা করণীয় করবেন।

॥ ৪৭ ॥

রবিবার, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১। বাবা-মা'র সঙ্গে আমরা সকলে রিষড়ার বাগানবাড়িতে রয়েছি। সেইদিন সকালে রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের খবর পরিকল্পনামতো প্রচার করে দেওয়া হবে। সকাল থেকে বাবা মা ও আমার উৎকণ্ঠা। বাড়ির অন্য কেউ তো কিছু জানে না। সকলকেই বলা হয়েছে, রবিবারটা রিষড়ায় কাটিয়ে আমরা সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরব।

বেলা যত বাড়ছে, আমাদের উৎকণ্ঠাও তত বাড়ছে। বাবা তো উপরের বারান্দায় পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে গঙ্গার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করছেন, আবার ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'বড্ড দেরি হচ্ছে যে, সবকিছু ঠিকমতো হল তো ?' আমি কিছুই মন্তব্য করছি না। আমার চিন্তা, রাঙাকাকাবাবু ইতিমধ্যে ঠিকমতো সীমান্ত পেরোলেন কি না

আমাদের দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেল। তখনও কোনো খবর নেই। আমরা খেয়ে নিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম। বাবা কিন্তু মাঝে মাঝে বারান্দায় বেরিয়ে কান পাতছেন। আমিও উঁকিঝুঁকি মারছি। শেষ পর্যন্ত—তখন প্রায় দুটো বাজে—একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখা গেল গাড়ি থেকে নেমে অরবিন্দ ও মেজদা গণেশ হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকে আসছে। আমি তাদের দূর থেকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। অরবিন্দ এসেই মেজোজ্যাঠাবাবুর খোঁজ করল, খুব জরুরি কাজ ! বাবা তাদের নিজের শোবার ঘরে ডেকে নিলেন। সেখানে পরিকল্পনামতো কথাবার্তা হল।

মেজদা আমার ঘরে এসে আমাকে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করল। বলতে লাগল, "ওঠ্, ওঠ্, ভয়ানক খবর। রাঙাকাকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি বললাম, "অসময়ে এসে কী-সব যা-তা বলছ, পাওয়া যাচ্ছে না মানে আবার কী !" বলে পাশ ফিরে শুলাম।

সে তখন বলল, "সত্যি বলছি, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমরা মেজোকাকাবাবুকে বলতে এসেছি।"

আমি চোখ রগড়াতে-রগড়াতে অবিশ্বাসের ভান করে পড়ে রইলাম।

বাবা সব শুনে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। আর বললেন, সব গোছগাছ করে নিয়ে তিনি শিগগিরই কলকাতায় আসছেন। সকলকে বলা হল, একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে, সকলকে সেদিনই বাড়ি ফিরতে হবে। ঠিক হল, বাবাকে নিয়ে আমি প্রথমে চলে যাব। সঙ্গে সত্যবাদী ঠাকুরকে নিয়ে যাব, কলকাতায় গিয়ে সকলের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো ! মা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে পরে আসবেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই ওয়াণ্ডারার গাড়ি চালিয়ে বাবাকে পাশে ও সত্যবাদী ঠাকুরকে পেছনে বসিয়ে আমি কলকাতা রওনা হলাম। সত্যবাদীকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাবাকে নিয়ে আমি এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে তখন খুবই

উত্তেজনা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একে-একে এসে পড়ছেন। সকলকেই এককথা বলা হচ্ছে। সকালে খাবারটা পড়ে থাকতে দেখে সর্বেশ্বর ঠাকুর শোরগোল তোলে। তারপর বাড়ির অন্যেরা জড়ো হয়ে পর্দার বাইরে থেকে রাঙাকাকাবাবুকে ডাকাডাকি করে। কোনো সাড়া না পেয়ে তারা ভিতরে ঢুকে দেখে যে, ঘর ফাঁকা। তখন দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়, প্রথমেই বাড়ির আনাচেকানাচে, এমন-কী চিলের ছাদ পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলে। কোথাও কোনো হদিস না পেয়ে বাবাকে রিষড়ায় খবর দিতে একটা গাড়ি ছোটে। অন্য একটা গাড়ি যায় দক্ষিণেশ্বরে।

এলগিন রোডে পৌঁছে বাবা আর-একবার সকলের সামনে ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে বসে শুনলেন। ক্রমেই ভিড় বাড়তে লাগল। যে-কেউ আসেন, কিছু-না-কিছু পরামর্শ দেন। দেখলাম ভিন্ন ভিন্ন লোকের নানারকম ধ্যানধারণা। বাবা চুপ করে বসে যতটা সম্ভব সকলেরই মন রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আত্মীয়স্বজন ছাড়া বসুবাড়ির বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এসে পড়লেন, যেমন, আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নৃপেন ঘোষ প্রভৃতি।

বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বাবা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে গিয়ে আলোচনা চালাবেন ঠিক করলেন এবং দলবল নিয়ে এ-বাড়িতে চলে এলেন। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিজের অফিসঘরে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে-বলতে একটার পর একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন। একটা গেল পণ্ডিচেরীতে, একটা গেল আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে ইত্যাদি। একজন বললেন, সুভাষকে হয়তো হাজারিবাগের কিছু দূরে ছিন্নমস্তার মন্দিরে পাওয়া যাবে। আর একজন বললেন, উত্তরভারতের তীর্থস্থানগুলিতে খোঁজ করা হোক। কিন্তু এ-সব জায়গায় খোঁজ করা হবে কী করে?

আমি ইচ্ছা করেই একটু দূর থেকে ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করছিলাম। বাবা একবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "এঁরা বলছেন কেওড়াতলার শ্মশান ও কালীঘাটের মন্দিরে একটু খুঁজে এলে ভাল হয়, তুমি আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে চলে যাও না।" আমি তথাস্তু বলে মেজদা, গণেশ ও তাঁর গোপালমামাকে সঙ্গে নিয়ে রাঙাকাকাবাবুকে খুঁজতে বেরোলাম। কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর সমাধিমন্দিরের চারদিকে ঘুরলাম। দেখলাম, বেশ কয়েকটি লোক নেশা করে ঝিমুচ্ছে। কেওড়াতলায় সুবিধা না হওয়ায় কালীঘাটে চলে গেলাম। মন্দিরের চত্বরে কি আর সন্ধ্যায় কারুর হদিস পাওয়া যায়। এদিক-ওদিক দেখে আমিই একটু অধৈর্য হয়ে পড়লাম, বাড়ি ফিরতে চাইলাম।

গোপালমামা বললেন, কাছেই বড় একজন সাধক আছেন। তাঁর কাছে তিনি মাঝে মাঝে আসেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়, কিছু যদি বলতে পারেন। আমরা তিনজনে সরু অন্ধকার একটা গলি দিয়ে সেই সাধুর ডেরায় পৌঁছলাম। দেখলাম সেখানেও একটি কালীমূর্তি রয়েছে। খবর দিতে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ব্যাপারটা কী জিজ্ঞাসা করলেন। গোপালমামা কাঁপা-কাঁপা গলায় ব্যাপারটা বললেন। শুনেই তিনি খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "তোকে কি আমি আগেই বলিনি যে, সুভাষকে তোরা সংসারে আর রাজনীতিতে আটকে রাখতে পারবিনি! হল তো! সে তোদের মায়া কাটিয়েছে।"

গোপালমামার বিনীত অনুরোধে তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে কলকাতার কিছু উত্তরে, এই

খবর, চন্দননগরের কাছাকাছি কোনো মন্দিরে সে আছে। রাতে মা'র পূজার পর আরও জানতে পারব।"

আমি মনে মনে রাঙাকাকাবাবুরই ভাষায় বললাম, 'আপনি কচু জানেন!' যাই হোক, আমরা বাড়ি ফিরে রিপোর্ট দিলাম।

রাত বাড়তে লাগল। একে-একে সকলে বাড়ি ফিরলেন। সকলে চলে যাবার পর বাবা সুরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় বসলেন। খবরের কাগজে পরের দিন সকালে কী লেখা হবে তার আলোচনা করলেন এবং আমার বিশ্বাস একটি খসড়াও তৈরি করলেন। আনন্দবাজার অফিসে একটা টেলিফোন করার পর সুরেশবাবু চলে গেলেন।

দোতলায় আমি বাবার অপেক্ষায় ছিলাম। বাবা যেন একটু ক্লান্ত হয়েই উপরে উঠে এলেন। পরীক্ষার প্রথম দিনটা ভালভাবেই কেটেছে বলে আমাদের মনে হল। তবে পরের দিন সকালে খবরটা প্রচার হয়ে গেলে পুলিশ কীরকম আচরণ করবে, এই চিন্তা নিয়ে আমরা শুতে গেলাম।

পরের দিন কেবল হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজারে খবরটা বেরোল। কারণ উপর-পড়া হয়ে আমরা কারুকেই খবর দিতে যাইনি। যাঁদের আমাদের বাড়িতে দৈনন্দিন যাতায়াত ছিল, তাঁদেরই খবর দেওয়া হয়েছিল।

২৭শে জানুয়ারি সারাদিন কেবলই টেলিফোন বাজতে লাগল, সন্ধ্যার পর দুই বসুবাড়িতে খুব ভিড়। আমি সকালে মেডিকেল কলেজে গেলাম। দু-একজন সহপাঠী আমার দুইদিনের অনুপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন। তাঁদের প্রশ্নের আমি ভাল-ভাল উত্তর দিলাম। অ্যানাটমি বিভাগে ডিসেক্‌শন্ করার সময় আমার ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার সুবোধ সুররায় কাজ দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন দু-দিন আমি আসিনি কেন। উত্তরে বললাম, বাড়ির কাজে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। শুনে তিনি বললেন, "পুলিশ রেকর্ড নেই তো!" বলেই তিনি আমার কার্ডে দু-দিনই 'present' লিখে দিয়ে চলে গেলেন। আমার শরীরটা ছম্ করে উঠল। আমার এক সহপাঠী কল্যাণীপ্রসাদ গুপ্ত আমাকে বলল, "খবরটা পড়ে মনে হচ্ছে যে, সুভাষবাবুর গোঁফসুদ্ধু ঐ ছবিটা কাগজে ছাপানো তো ভাল হয়নি!" আমি শুনে মনে মনে আঁতকে উঠলেও ভাব দেখালাম যেন আমি কিছুই বুঝিনি।

বাড়ি ফিরে এলগিন রোডের বাড়িতে গেলাম। বিকালের দিকে পুলিশের টনক নড়ল। একদল অফিসার এসে প্রথমে অন্তর্ধানের বৃত্তান্ত শুনলেন, পরে বাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি গাড়িবারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। দেখলাম তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি বাড়ির পিছনের দিকে বা পাশের গলির ছোট খিড়কির দিকে, সামনের বড় গেটটা তাঁরা যেন পরীক্ষাই করলেন না।

বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও সন্ধ্যার খবরে বলেছে যে, সুভাষচন্দ্রকে ঝরিয়ার কাছাকাছি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুনেই বাবা অস্থির হয়ে পড়লেন। দাদাকে বারারিতে টেলিফোন করে ধানবাদে গিয়ে পুলিশের দপ্তরে খোঁজ নিতে বললেন। দাদা খোঁজ নিয়ে জানালেন, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার হ্যাঁ-ও বলবেন না, না-ও বলবেন না। কিছুক্ষণ পরে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নৃপেনবাবু খবর দিলেন যে, খবরটা ভুল বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বাবা আমাকেই বললেন, মাজননীকে গিয়ে বলে আসতে যে, খবরটা ভুল। আমি আবার

এলগিন রোডে গিয়ে মাজননীকে বলে এলাম। মাজননী শুনলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না। দেখলাম গ্রেপ্তারের খবর শুনে ইলা খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। আমি অনেক করে তাকে বোঝালাম যে, খবরটা সত্যি নয়। যখন ইলার সঙ্গে কথা বলছি, তখন রাঙাকাকাবাবুরই রেডিওতে শুনলাম, বার্লিন রেডিও বলছে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু কাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

॥ ৪৮ ॥

আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের খবরটা ঠিক সেভাবেই প্রচার হয়ে গেল। পুলিশকে বিভ্রান্ত করাটাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেটা আমরা বেশ ভালভাবেই করতে পেরেছিলাম বলে আমার বিশ্বাস। শত্রুপক্ষ বেশ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। ১৯শে জানুয়ারি নাকি একটা জাপানি জাহাজ কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিল। পরে শুনেছি ইংরেজ পুলিশ সেই জাহাজটিকে ধাওয়া করে চীনের এক বন্দরে নিয়ে এসে খুব খোঁজাখুঁজি করেছিল। তবে এটাও শুনেছি যে, দিল্লির সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোরা এক বড় কর্তা সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার গল্পটা মোটেই হজম করেননি। সব সীমান্ত, বন্দর, ইত্যাদিতে তৎক্ষণাৎ সাবধানবাণী পাঠিয়েছিলেন এবং যে-কোনও উপায়ে সুভাষ বসুকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছিলেন। তবে ততদিনে রাঙাকাকাবাবু 'পগার পার' হয়ে গেছেন। আর-একটা কথা দিনকতক পরে সুরেশ মজুমদার মহাশয় বাবাকে বলেছিলেন। তিনি দিল্লির কোনও-এক সূত্র থেকে শুনেছিলেন যে, চাঞ্চল্যকর খবরটা কাগজে বের হবার পর মধ্যভারতের ট্রেনের এক টিকেট-চেকারের হঠাৎ মনে হয়, সে যেন সুভাষবাবুকে দেখেছে। সে কথাটা প্রকাশ করায় পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে রাঙাকাকাবাবুর পোশাক-পরিচ্ছদের যে বর্ণনা দেয়, তার সঙ্গে তাঁর ছদ্মবেশটা বেশ মিলে যায়। বাবা একদিন রাতে আমাকে ডেকে বললেন যে, বর্ণনাটা যে বেশ মিলে যাচ্ছে, রিপোর্টটা তা হলে সত্যি হলেও হতে পারে। আমারও তাই মনে হল এবং উদ্বিগ্নও হলাম।

ঘরে-বাইরে অন্তর্ধান নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। বাড়ির অনেকেই চুপচাপ ছিলেন, বিশেষ করে যাঁরা মনে-মনে বিশ্বাস করতেন যে, রাঙাকাকাবাবু নিশ্চয়ই দেশের মুক্তির সন্ধানে অজানার পথে পাড়ি দিয়েছেন। সুতরাং চুপচাপ থাকাই সমীচীন। মাজননীর মনের কথা ঠিক কখনও ধরতে পারিনি। তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না, কিন্তু স্থির ও অবিচল ছিলেন। নতুনকাকাবাবু তো ডাক্তার, তিনি অন্যভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, সুভাষ রাজনীতিতে একঘরে হয়ে হতাশার বশবর্তী হয়ে হয়তো বা ভয়ানক কিছু করে বসেছে। সুভাষ লুকিয়ে থাকবে কী করে, তাকে তো দেশের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও চেনে, দোকানে মুড়ি খেতে গেলেও তো যে-কেউ তাকে চিনে ফেলবে। কেউ-কেউ আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবার গল্পটাই গ্রহণ করলেন। আমার দিদিমা খুব ধর্মপ্রাণা ছিলেন, তিনি আমাদের সকলকে একদিন জোর গলায় বললেন, তোমাদের তো ধর্মে-টর্মে বিশ্বাসই নেই, কিন্তু বলে দিলাম, তোমাদের রাঙাকাকাবাবু সাধুবাবা হয়েই ফিরবেন। সেই কবে রাঙাকাকাবাবু একবার গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তার উপর অন্তর্ধানের সময় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবার গল্প ফেঁদে আমরা রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে এমন একটি ধারণার

সৃষ্টি করলাম যে, আজও তার মূল্য দিতে হচ্ছে। এখনও অনেকে মনে করেন, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।

মজার মজার গল্পও বেশ চলছিল। বসুবাড়ির বিশেষ বন্ধু নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র একদিন বললেন যে, তিনি শুনেছেন একদিন সন্ধ্যায় দুজন শিখ ভদ্রলোক রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পরে তিনজন শিখ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ব্যাপারটা নাকি পরে কোনো চরের মনে পড়ে! মেজদা গণেশ আরও মজার একটা গল্প শুনিয়েছিলেন? একদিন মাঝরাতে নাকি এক দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ গঙ্গার ঘাটে এক ঘুমন্ত মাঝিকে উঠিয়ে বলেন তাঁকে মাঁঝদরিয়ায় নিয়ে যেতে। মোটা টাকার লোভে সে রাজি হয়। গঙ্গায় তখন জোয়ার, নদীর মাঝামাঝি পৌঁছতেই মাঝিটি দেখে এক ডুবোজাহাজ গুমগুম আওয়াজ করে জলের উপর ভেসে উঠল। ভদ্রলোকটি মাঝির হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে লাফিয়ে জাহাজে চলে গেলেন। জাহাজটি আবার গুমগুম শব্দ করে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন থেকেই রাঙাকাকাবাবু এক প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন। আজও কত রকমের রূপকথা তাঁকে নিয়ে শোনা যায়।

বাবা খুবই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কবে রাঙাকাকাবাবুর খবর পাবেন এই আশায় ছিলেন। প্রায়ই কোনো-না-কোনো সূত্রে কিছু শুনতেন। আমাকে কাজের শেষে তাঁর শোবার ঘরে ডাকতেন। মশারির মধ্যে তাঁর খাটে মুখোমুখি বসে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম। দুজনেরই এতে খানিকটা শান্তি হত। একদিন হাইকোর্টে শুনে এলেন যে, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আড্ডা ক্যালকাটা ক্লাবে রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে খুব আলোচনা হচ্ছে। একটা আলোচনায় নাকি কলকাতার পুলিশ কমিশনার যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশসাহেব নাকি জোর গলায় বলেছেন, "উই নো দ্যাট শরৎ বোস নোস।" মুসলিম লীগ দলের নেতা ও বাবা-রাঙাকাকাবাবুর বন্ধু ইসপাহানি সাহেব নাকি সেখানে বলেছেন, 'ইট ইস্ বিলিভড্ দ্যাট সুভাষ ইস্ উইথ দি ফকির অব ইপি", ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিন বাবার এক জ্যোতিষী বন্ধু বাবাকে বললেন যে, রাঙাকাকাবাবু এক বিরাট জলাধারের পাশ দিয়ে চলেছেন। আমি তো একটা বিরাট ম্যাপ নিয়ে বাবার সঙ্গে মশারির ভিতরে ঢুকলাম। সোভিয়েট রাশিয়ার বৈকাল লেক হতে পারে বলে আমাদের মনে হল। জ্যোতিষী বন্ধুটি বাবাকে আরও বলেছিলেন যে, বাড়ির একটি ছেলে ব্যাপারটা জানে, তবে সে পর্দার আড়ালে আছে। শুনে বাবা খুব চিন্তিত হয়েছিলেন।

বাবা-মার সঙ্গে বেশি রাত পর্যন্ত তাঁদের ঘরে বসে আমার কথাবার্তা বলা আমার বোন গীতার খুব পছন্দ হত না। সে বোধহয় ভাবত তাকে কেন বাদ দিয়ে আমরা গোপনে কথাবার্তা চালাচ্ছি। যাই হোক, বাবা আমার সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানতা বজায় রাখতে চাইতেন। যাতে রাস্তার টিকটিকিরা কোনোরকম সন্দেহ না করে, তিনতলায় রাস্তার দিকের আমার শোবার ঘরে গিয়ে আলো না জ্বালিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে বলতেন, যাতে তারা মনে না করে যে বেশি রাত পর্যন্ত আমি কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি।

আড়াই মাস অপেক্ষা করার পর খবর এল। ১৯৪১-এর ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি মা ও গীতার সঙ্গে উডবার্ন পার্কের দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্পসল্প করছি। নীচের তলার বেয়ারা ধনু এসে আমার হাতে একটা স্লিপ দিল। আমি চিন্তা না করে জোর গলায়

পড়ে ফেললাম—'ভগত রাম, আই কাম ফ্রম ফ্রন্টিয়ার'। পড়েই আমার চৈতন্য হল। গীতা তো শুনেইছে, সে হয়তো আমাকে জেরা করবে। মার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। কথাটা ঘোরাবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে বললাম, আবার সেই কাশ্মীরি কার্পেটওয়ালাটা জ্বালাতে এসেছে। যাই বিদায় করে আসি। নীচে নেমে দেখলাম উত্তর ভারতীয় এক যুবক এবং এক পাঞ্জাবি মোটাসোটা ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। দুজনেই প্যান্টকোট পরা, যুবকটির টাই নেই, ভদ্রলোকটির আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী এবং কাকে চান। যুবকটি বললেন, তাঁরা সুভাষবাবুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সম্বন্ধে তিনি কী জানেন। তিনি বললেন, সুভাষবাবু আপনাকে এই নামে ডাকেন এবং আপনি মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ছাত্র। সুভাষবাবু বলে দিয়েছেন যে, যদি তাঁরা সোজাসুজি বাবাকে ধরতে না পারেন তাহলে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁদের পশ্চিমের অফিসঘরে নিয়ে গেলাম। ভগত রাম আমাকে বললেন যে, স্লিপে তাঁর আসল নামটাই তিনি লিখেছেন, আমি যেন সেটা ছিঁড়ে ফেলি। তারপর তিনি আমাকে জানালেন যে, সেইদিনই রাঙাকাকাবাবুর মস্কো পৌঁছবার কথা। ১৭ই মার্চ কাবুলের জার্মান কনস্যুলেট থেকে তিনি রাঙাকাকাবাবুকে মোটরে করে রুশ সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে যেতে দেখেছেন। রাঙাকাকাবাবুর কাছ থেকে বাংলায় লেখা বাবার নামে একখানা চিঠি ও ইংরেজিতে লেখা একটি বাণী এবং একটি প্রবন্ধ নিয়ে এসেছেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি লেখাগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাবাকে খবর দিতে গেলাম। তখনই বাবা স্নান-টান সেরে নীচে নেমে আসছেন। বাবাকে ফিসফিস করে বললাম, রাঙাকাকাবাবুর খবর এসেছে, আপনি আগে একবার ও-ঘরে আসুন। বাবার কাছে ভগত রাম আবার রাঙাকাকাবাবুর কুশল-সংবাদ দিলেন। বাবা আমাকে লেখাগুলির ভার নিতে বললেন এবং নিজের ঘরে গিয়ে ভাল করে পড়ে দেখতে বললেন। ভগত রাম পরের দিন ভোরে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন, এই ব্যবস্থা হল।

ভগত রামের কথাবার্তা শুনে ও রাঙাকাকাবাবুর হাতের লেখা দেখে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হল, সেটা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি লেখাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। চিঠিটি ছিল পেনসিলে লেখা। ইংরেজিতে 'মেসেজ টু মাই কান্ট্রিমেন'—কালিতে সাধারণ কলম দিয়ে লেখা। প্রবন্ধটি—'ফরওয়ার্ড ব্লক—ইট্স জাস্টিফিকেশন'—ছিল পেনসিলে লেখা এবং ছোট মাপের কাগজে পঞ্চাশ পাতার উপর। বাবা বেশি রাতে আমাকে ডাকলেন। কাগজগুলি দেখলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন লেখাগুলি রাঙাকাকাবাবুর এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত কি না। আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

চিঠিতে রাঙাকাকাবাবু জানিয়েছিলেন যে, আর-একটি যাত্রা আরম্ভ করার আগে তিনি লিখছেন, তবে 'অনেক দেরি হয়ে গেল এই যা দুঃখ'। আরও লিখেছিলেন যে, পত্রবাহক তাঁর অনেক সেবা করেছেন, তাঁকে যেন বাবা প্রয়োজনমতো সাহায্য করেন। মূল চিঠির নীচে তিনি তাঁর 'কন্যার জন্য' দু'লাইন লিখেছিলেন। কয়েক মাস পরে ইলা কলকাতায় এলে আমি তাকে গোপনে চিঠিটা দেখিয়েছিলাম।

'মেসেজ টু মাই কান্ট্রিমেন' লেখাটি বাবা সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের হাতে দিয়েছিলেন। গোপনে সেটা ছাপিয়ে নানা জায়গায় বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই সেটা পড়ে বাবার কাছে এসে লেখাটা রাঙাকাকাবাবুর বলে তাঁর মনে হয় কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

বাণীটিতে রাঙাকাকাবাবুর সই ছিল এবং ঠিকানা ছিল 'সামহোয়্যার ইন ইউরোপ, ১৭ই মার্চ ১৯৪১'। কেন তিনি যুদ্ধের মধ্যে দেশত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দিলেন সেটা তিনি দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। ইংরেজ গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করবার ব্যাপারে তিনি বর্মার ও চীনের বন্ধুদের তাঁর গোপনযাত্রায় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। মূল বাণীটি এখনও কোথাও আছে কি না জানি না। প্রবন্ধটি অবশ্য নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় আছে। ১৯৪২ সালে মা চিঠিটি বিসর্জন দিতে বাধ্য হন, সে পরের কথা।

॥ ৪৯ ॥

ভগত রামের মারফত রাঙাকাকাবাবুর খবর পাবার কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় বাবা আমাকে নীচে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম কালো টুপি পরা এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরে জেনেছিলাম যে, ওঁর নাম অসিত মুখার্জি, কলকাতার জাপানি কনসুলেটে কাজ করতেন। বাবা বললেন, কলকাতার জাপানি কনসাল-জেনারেল তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চান। রিষড়ায় দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই ভদ্রলোক কনসাল-জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারে আসবেন। আমি সেখান থেকে তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে রিষড়ায় চলে যাব। বাবা প্রথমে বলেছিলেন, ড্রাইভার গাড়ি চালাবে। এ ধরনের কাজে ড্রাইভারকে সঙ্গে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিনি। আমি বললাম, "আমি একলাই ওয়াণ্ডারার গাড়ি চালিয়ে যাব।"

যথাসময়ে আমি গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম। একটি বড় গাড়ি থেকে এক মধ্যবয়সী জাপানি ভদ্রলোক নেমে এগিয়ে এলেন। অসিতবাবু খানিকটা দূর থেকে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি জাপানি ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে সোজা রিষড়ার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। অমায়িক জাপানি ভদ্রলোকটি হাসিমুখে আমার সঙ্গে নানারকম ব্যক্তিগত কথাবার্তা চালালেন।

রিষড়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছে নীচের তলায় বাবার ছোট্ট অফিস-ঘরে অতিথিকে বসিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে বাবাকে খবর দিলাম। বাবা তখনই নীচে নেমে এলেন এবং তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। জাপানি ভদ্রলোকের নাম ছিল কাত্‌সুয়ো ওকাজাকি। রাঙাকাকাবাবু বার্লিন থেকে টোকিও মারফত যে প্রথম বেতার-বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সেই সঙ্গে জাপানিরা কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা শুরু হল।

ওকাজাকির সঙ্গে এই আলোচনার পরে সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ও যোগ দিয়েছিলেন। আলোচনার জন্য বাবা বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভাল ম্যাপ সংগ্রহ করেছিলেন। মা'র কাছে শুনেছি যথাসময়ে গোপন পথে বর্মা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের উপায় নিয়ে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছিল। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রতিষ্ঠার কিছু পরে ১৯৫৯ সালে আমেরিকা থেকে ওকাজাকি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি তখন জাপান সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি পদে ছিলেন।

কিছুদিন পরে ওকাজাকি কলকাতা ছেড়ে চলে যান। তাঁর জায়গায় ওতা বলে এক জাপানি ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে বার্তা

বিনিময়ে সাহায্য করতেন। ওতা শাড়ি পরিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন যাতে আপাতদৃষ্টিতে ওই সব যাতায়াত সামাজিক বলে মনে হয়। বাবা আগেই আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ওকাজাকি মারফত একটি বার্তায় তিনি রাঙাকাকাবাবুকে বলেছেন যে, 'দি মেডিকেল স্টুডেন্ট ইজ অল রাইট।'

এই সময় বাবা পাঞ্জাবের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সর্দার শার্দূল সিংয়ের কাছ থেকে একটা বার্তা পান। সর্দারজি জানিয়েছিলেন যে, বাবুজি মানে রাঙাকাকাবাবু ভবিষ্যতে বাবার কাছে সব গুরুত্বপূর্ণ বার্তাই বাংলায় লিখে পাঠাবেন। এ কথাটা আমারও জেনে রাখার প্রয়োজন ছিল, সে কথা পরে বলব।

আমি এ পর্যন্ত এমন সব কথা লিখেছি যার থেকে মনে হতে পারে যে, রিষড়ার বাগানবাড়িটা যেন গোপন কাজকর্মের জন্যই ছিল। তা কিন্তু নয়। বাবা সপ্তাহের শেষে কলকাতা থেকে সরে গিয়ে আমাদের সকলকে নিয়ে রিষড়ায় দু-এক রাত কাটিয়ে খুব আনন্দ ও শান্তি পেতেন। পেশাগত কাজকর্ম ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনাও অবশ্য সেখানে চলত। যাঁরাই যেতেন গঙ্গার টাটকা ইলিশমাছ ভাজা ও রিষড়ার বিখ্যাত গজা পেট ভরে না খেয়ে ফিরতেন না। খেতে বসে অতিথিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে বাবা নিজেই অনেক সময় পুরো একটা ইলিশমাছ খেয়ে ফেলতেন। রাঙাকাকাবাবু বার্লিনে পৌঁছবার খবর পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাবাকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন বাবাকে বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিতে। রাজশেখর বসুকেও একই কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বলে শুনেছি। বাবা ও মা শান্তিনিকেতনে কয়েকটা দিন খুবই আদরযত্নের মধ্যে কাটিয়ে আসেন। বাবাকে সেই সময় কবিগুরু রাঙাকাকাবাবুর খবর জিজ্ঞেস করে বলেন, "আমাকে তুমি বলতে পারো।" উত্তরে বাবা তাঁকে জানান যে, রাঙাকাকাবাবু জার্মানিতে আছেন ও ভাল আছেন।

আমি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে গিয়ে স্বর্গত অনিল চন্দের স্ত্রী রানী চন্দকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। শ্রীমতী চন্দ আমাকে জানান যে, একদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে গোপনে কথা বলবেন বলে আশপাশ থেকে সকলকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং অনিলবাবু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাবা আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এতই আন্তরিকতা, ভালবাসা ও উৎকণ্ঠার সুরে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাঁকে সত্যি খবরটা না দিয়ে তিনি পারেননি।

রাঙাকাকাবাবু দেশত্যাগ করার পরে বাংলার রাজনীতিতে বাবার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। কংগ্রেস ইতিমধ্যে দুভাগ হয়ে গিয়েছে, একটি হাই কমাণ্ডের অ্যাড হক কংগ্রেস, অন্যটি বাবার নেতৃত্বে কংগ্রেস দল। প্রভাব ও লোকপ্রিয়তার দিক থেকে রাঙাকাকাবাবু ও বাবার নেতৃত্বে আস্থাবান কংগ্রেস দলটি ছিল অনেক এগিয়ে। প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল বাংলার আসল কংগ্রেস। সেই সময় বাংলায় রাজত্ব করছেন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা নাজিমুদ্দীন সাহেব। সরকারের বিভেদধর্মী নীতির ফলে এখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্ভাব ক্রমেই বাড়ছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশের প্রগতির জন্য বাবা ও রাঙাকাকাবাবু কয়েক বছর ধরেই নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দু'বছর আগেই রাঙাকাকাবাবু কলকাতা কর্পোরেশনের মুসলিম লীগের কয়েকজন প্রগতিবাদী নেতার সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য একটা রফা

করতে সমর্থ হন, যেটাকে বলা হত 'বোস-লীগ প্যাক্ট'। পরে বাবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনার কাজে লেগে যান। ফজলুল হক সাহেব মনে মনে উদারপন্থী ও জনদরদী হলেও ঘটনাচক্রে নাজিমুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁদের মধ্যে সংঘাত বাড়তে থাকে। ফজলুল হক সাহেবের নিজের দল ছিল কৃষক-প্রজা পার্টি। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে বাবা ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে সমর্থ হন। হক সাহেবের দল বেরিয়ে আসায় নাজিমুদ্দীন সাহেবের দল বিধানসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়ে ও মন্ত্রিসভার পতন হয়। সেই সময় কলকাতার ইংরেজ সম্প্রদায়ের একটি দল সরকারের মনোনীত সদস্য হিসাবে অ্যাসেমব্লিতে বসতেন। ইংরেজ গভর্নরের সাহায্যে রাজত্ব চালাবার সব ব্যাপারে তাঁরা কলকাঠি নাড়তেন। বাবা ও হক সাহেবের নেতৃত্বে বিধানসভায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গড়ে ওঠায় ইংরেজরা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুবই শঙ্কিত হলেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উডবার্ন পার্কের বাড়ি বাংলার রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল। কত লোকের যে আনাগোনা তার হিসেব নেই। ফজলুল হক সাহেব যে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেটা বাবা শুরু থেকেই বলে দিয়েছিলেন। সকলেই বলতে লাগলেন যে, বাবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন। ফলে, শত্রু-শিবিরে, বিশেষ করে ইংরেজ ও পুলিশ মহলে ত্রাসের সঞ্চার হল। বাবা খবর পেলেন যে, তাঁকে গ্রেফতার করবার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ইংরেজ গভর্নরের কাছে নতুন মন্ত্রিসভার নাম দেওয়ার সময় হয়ে আসছে। ফজলুল হক সাহেব ও অন্য অনেকে চাইলেন যে, মন্ত্রিসভার প্রথম তালিকায় বাবার নাম থাকে। কিন্তু বাবা আসন্ন গ্রেফতারের খবর পাওয়ায় নিজের নাম প্রথমেই দিতে চাইলেন না। বললেন, "আমার নাম থাকলে গভর্নর খুব সম্ভব টালবাহানা করবে, ফলে নতুন মন্ত্রিসভার গঠনে বিঘ্ন হবে। হয়তো বা পুরো পরিকল্পনাটাই নষ্ট হবে।"

বাবা চাইলেন যে, তাঁর গ্রেফতারের আগেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ফজলুল হক সাহেব আর দুজন মন্ত্রীর নাম দিয়ে শপথ নিয়ে ফেলুন। তাই হল। প্রায় একই সঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিল আর বাবা জেলে গেলেন। বাবার কংগ্রেস দল থেকে শেষ পর্যন্ত দুজন মন্ত্রী হলেন।

বাবা মন্ত্রী হবার কথা ওঠাতে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মন্ত্রী তো হবে, ওই মাইনেতে সংসার চলবে কী করে? বাবা কিন্তু এসব ব্যাপারে নির্বিকার ছিলেন। কেউ প্রশ্ন তুললে হেসে আকাশের দিকে হাত তুলে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে দিতেন। যেন বলতে চাইতেন, ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন। মাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে কথার সোজা জবাব দিতেন না। কেবল মৃদু ও করুণ হাসি মুখে দেখা দিত। বাবা পরে জেল থেকে ব্রিটিশ সরকারকে লিখেছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে সেটাই বড় কথা, যদিও সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাতে গিয়ে তাঁর নিজের হাত পুড়েছে।

এগারো ডিসেম্বর বিকেলে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার জ্যানভ্রিন বাবাকে জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর গ্রেফতারের আদেশ এসেছে। মা তো তখনই জানতে পারলেন। বড় দুই ছেলের মধ্যে একজন কলকাতার বাইরে,অন্য জন বিলেতে। সুতরাং আমাকে ও গীতাকে বলা হল। আমার দিদি মীরা তখন সন্তানসম্ভবা। বাবা ডাক্তার মণি সরকারকে ডেকে ব্যাপারটা বললেন এবং দিদিকে দেখাশুনোর সব ভার তাঁকে নিতে অনুরোধ করে গেলেন।

সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের নীচের তলা লোকে ঠাসা। বিধানসভার অনেক সদস্য নতুন মন্ত্রিসভার তালিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বাবার গ্রেফতারের খবর জানিয়ে দেওয়ামাত্র সকলের মুখে একই সঙ্গে চাপা ক্রোধ ও বিষাদের ছবি ফুটে উঠল। মনে আছে, বাবা হাসিমুখে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন, কিন্তু আর কেউ হাসতে পারলেন না। অতিথিরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একে একে বিদায় নিলেন। সেই রাতটা বাবা নিজের বাড়িতেই বন্দী হয়ে কাটালেন। পরের দিন সকালে বাবাকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গেল। 'বসুবাড়ির ইতিহাসে এক ঘোর দুঃসময়ের সূচনা হল।

॥ ৫০ ॥

আমার মনে হয় বাবা গোপন ও বৈপ্লবিক কাজকর্মে নিজের সম্বন্ধে বড়ই বেপরোয়া ছিলেন এবং নিজের উপরে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতেন। অথচ রাঙাকাকাবাবুর যাতে কোনো বিপদ না হয়, আমার সম্বন্ধে পুলিশ যাতে কোনোরকম সন্দেহ না করে, তার জন্য তিনি খুবই ব্যস্ত হতেন এবং সবরকম সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন। ভগত রামের অভিজ্ঞতা থেকে এর কিছু আঁচ পাওয়া যায়। ভগত রাম কাবুল থেকে রাঙাকাকাবাবুর খবর নিয়ে কলকাতা আসবার পথে রাঙাকাকাবাবুরই নির্দেশে লাহোরে সর্দার শার্দূল সিং কবিশেরের সঙ্গে দেখা করেন। সর্দারজি রাঙাকাকাবাবুর লেখা দেখেও এমন ভাব দেখান যেন তিনি কিছুই বুঝছেন না বা বিশ্বাস করছেন না এবং ভগত রামকে বিদায় করে দেন। ভগত রাম এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। হতে পারে, শার্দূল সিং ইচ্ছা করেই ঐ রকম ব্যবহার করেছিলেন। অচেনা এক লোকের কাছে হয়তো বা কিছুই কবুল করতে চাননি। বাবার কাছে এসে ভগত রাম কিন্তু অন্য ধরনের অভ্যর্থনা পেলেন এবং সবরকম সাহায্য পেলেন। খোলা জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও আলোচনা করতে বাবা মোটেই ইতস্তত করলেন না। যদি পুলিশ কোনো আঁচ পেত, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে সেই সকালে বাবা ও ভগত রামকে একসঙ্গেই ধরে ফেলতে পারত। জাপানিদের সঙ্গে দেখাশুনোর ব্যাপারেও বাবা বেশ বেপরোয়া ভাব দেখাতেন। নিজের বাড়িতে বারবার তাদের সঙ্গে দেখা না করে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় তো করতে পারতেন। গোয়েন্দা দপ্তর নিশ্চয়ই রিষড়ার বাড়ির উপর নজর রাখত, যেমন উডবার্ন পার্ক ও এলগিন রোডের বাড়ির উপর রাখত। বাবা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, গোপন কথাবার্তা বা কাজকর্ম স্বাভাবিক পরিবেশে করলেই সন্দেহ কম হয়। পরে নানা সূত্র থেকে যা জেনেছি, তার থেকে মনে হয়, বাবার সম্বন্ধে খবরাখবর পুলিশ দপ্তর সোজাসুজি আমাদের তরফ থেকে পায়নি। ঐ সব কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যদের অসাবধানতা বা গাফিলতির ফলেই কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ অতি গোপনীয় খবর গোয়েন্দাদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। বাবার গ্রেপ্তারের কিছু দিন পরে উডবার্ন পার্কে বসে গল্প করতে-করতে আমার খুড়তুতো দাদা রঞ্জিত আমাকে বললেন, 'মেজোজ্যাঠাবাবু' সম্বন্ধে একটা খুব গোপন কথা ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে গেছে। শীলভদ্র যাজীর কাছে তিনি শুনেছেন যে, ভগত রাম নামে এক ভদ্রলোক রাঙাকাকাবাবুর চিঠি নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন একথা সরকার জানে। সেজদার কথা শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম, যদিও সে-রকম কোনো ভাব আমি প্রকাশ করিনি। সেজদা বা শীলভদ্রজির তো ভগত রামের নাম

জানার কথা নয়! বুঝলাম যে, একটা গুরুতর খবর ফাঁস হয়ে গেছে, খুব সম্ভব আমার নামও পুলিশের খাতায় উঠেছে। যুদ্ধের পরে সত্যরঞ্জন বক্সি মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, দিল্লির রেড ফোর্টে বন্দী অবস্থায় গোয়েন্দারা তাঁকে একটা চিরকুট দেখিয়েছিল, যেটাতে বাবার সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে জাপানিদের একটি বার্তা ইংরেজিতে বড়-বড় অক্ষরে লেখা ছিল। সত্যবাবুর বিশ্বাস, কোনো জাপানি অফিসে হঠাৎ হানা দিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ঐ বার্তাটা পায়।

বার্লিন থেকে রাঙাকাকাবাবু বাবাকে জাপানিদের মারফত জানিয়েছিলেন যে,, জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরকে ভারত ও এশিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাটাই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ নাকি নিজেই রাঙাকাকাবাবুকে বলেছিলেন, "আপনি আমাদের এসব বিষয়ে 'এডুকেট' করুন।" রাঙাকাকাবাবুর একমাত্র কাম্য ছিল যুদ্ধ এমনভাবে চলুক যাতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সুবিধা হয় এবং স্বাধীনতার জন্য শেষ সশস্ত্র আঘাত হানবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫, বাবার কারাবাসের পুরো সময়টা বসুবাড়ির পক্ষে অতি কঠিন পরীক্ষার সময় হয়ে দাঁড়াল। দুঃসময় যখন আসে, জাঁকিয়ে আসে। প্রথমত, আমরা তো দারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়ে গেলাম। প্রায় একই রকম অবস্থা ত্রিশের দশকে বাবার প্রথম কারাবাসের সময় হয়েছিল। মা ও ছেলেমেয়েদের নামে বাবা যেসব ইনস্যুরেন্স পলিসি করেছিলেন, একে-একে সেগুলি জলাঞ্জলি দিতে হল। আমার চোখের সামনে আমার অতি প্রিয় ওয়াণ্ডারার গাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল। মা যথাসাধ্য সংসারের খরচ নামিয়ে আনলেন। তবে যুদ্ধের সময় তো, সবকিছুরই দাম ক্রমাগতই বাড়ছে, সামলানোই দায়। আমার এক দাদা তখন বিলেতে। তাঁর খরচ কে জোগাবে? ত্রিশের দশকে একই অবস্থায় যেমন আর-এক বন্ধু এগিয়ে এসেছিলেন, এবার এগিয়ে এলেন বাবার প্রাক্তন শিষ্য ব্যারিস্টার সুধীরঞ্জন দাস। তিনি মাসে-মাসে কোর্ট-ফেরত উডবার্ন পার্কে এসে বিলেতের খরচের জন্য একখানা খাম ধরিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমিই তো বড়, মাকে না পেলে 'মাকে এটা দিও' বলে আমার হাতেই খামটি তুলে দিতেন।

তখন সমগ্র বসুবাড়ির উপর সরকারের শ্যেনদৃষ্টি। দিনরাত টিকটিকিরা বাড়ি ঘিরে রেখেছে। যখনই আমরা কোথাও যাই, পেছনে গোয়েন্দা। বাড়ির ছেলেদের মধ্যেও তিনজনকে যুদ্ধের সময় জেলে যেতে হল। এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশির ভাগই দূরে সরে গেলেন। দোষ তো দেওয়া যায় না, কে আর অযথা বিপদ ডেকে আনতে চায়। শুনেছি জেল থেকে বাবার চিঠি পেলে কেউ-কেউ এই ভেবে আতঙ্কিত হতেন যে, তাঁরা হয়তো পুলিশের কুনজরে পড়ে গেলেন। গাড়িতে আমাদের বাড়িতে এসে পরে কারও-কারও ভয় হত, এই বুঝি ফটকের গোয়েন্দারা গাড়ির নম্বর নিল।

বাবাকে নিয়েও আমাদের চিন্তার অন্ত নেই। কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেলে রাখবার পর হঠাৎ একদিন তাঁকে সুদূর দক্ষিণ ভারতে সরিয়ে নিয়ে গেল। মজার কথা এই যে, শত্রুশিবিরেও অনেক সময় বন্ধু থাকে। একজন লুকিয়ে খবর দিয়ে দিল যে, বাবাকে মাদ্রাজ মেলে চড়িয়ে স্থানান্তরিত করা হবে। উডবার্ন পার্ক থেকে আমরা সকলে মামাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ছুটলাম। মুখ্যমন্ত্রী (তখন বলা হত বাংলার প্রধানমন্ত্রী) ফজলুল হক

সাহেবও খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত। কড়া পুলিশ-পাহারায় বাবাকে স্টেশনে নিয়ে এল, সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে বাবাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের কামরায় তুলে সব দরজা-জানালা এঁটে দিল। ফজলুল হক সহ আমরা কেবল চেয়েই রইলাম। প্রথমে বাবাকে নিয়ে গেল ত্রিচিনোপল্লী জেলে। একেবারে নির্জন কারাবাস, সেখানে বাবাকে নিজে রেঁধে খেতে হত। তারপর কিছুদিন রাখল দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাছে কুর্গ প্রদেশের মারকারায়। শেষে নিয়ে গেল নীলগিরি পাহাড়ের কুনুরে। চার বছরের এই কঠিন বন্দী-জীবনের ফলে বাবার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ল, এবং, আমাদের বিশ্বাস, এটাই তাঁর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ।

সেই সময়ে বাড়িতে অসুখ-বিসুখেরও শেষ ছিল না। মা তো অন্তত দুবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হলেন। একবার তো ডাক্তাররা হালই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে সেই সময় কলকাতায় নিয়ে আসবার সব আবেদন সরকার অগ্রাহ্য করলেন। ১৯৪২-৪৩এ আমি নিজেও বন্দী অবস্থায় টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়েছিলাম। যুদ্ধের মধ্যে বসুবাড়িতে বেশ কয়েকটি মৃত্যুও হল। মেজদা গণেশ, বোন ইলা ও শেষ পর্যন্ত মাজননী একে একে চলে গেলেন। মাজননীর শেষ সময়েও বাবাকে কলকাতায় আনাবার অনেক চেষ্টা হল, সরকার কিন্তু অনড়। প্রথম কারাবাসের সময় বাবা দাদাভাইকে হারিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার হারালেন মাজননীকে।

১৯৪২-এর প্রথম থেকেই দেশের আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। একদিকে রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ থেকে বেতারে প্রচার আরম্ভ করলেন, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ধীরে-ধীরে সংগ্রামের পথে এগোলেন। যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশাও বাড়তে লাগল। ঘরে ও বাইরে যখন এই অবস্থা, তখন আমি মেডিকেল কলেজে খানিকটা উঁচু স্তরে উঠেছি, স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছি। ছোট-ছোট দলে ছাত্রদের ভাগ করে নিয়ে মাস্টারমশাইরা রুগির পাশে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে-কলমে পড়াতেন। বেশ একটা নতুন অভিজ্ঞতা। বিপদ-বিপর্যয়ের মধ্যেও কিন্তু ডাক্তারি পড়ানোটা বেশ ভালই হত। আমাদের মাস্টারমশাইরা কোনো অজুহাতেই কাজে আলগা দিতেন না, শৃঙ্খলা ছিল শক্ত, ছাত্রদেরও যথাসম্ভব পাল্লা দিয়ে চলতে হত। তবে নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, মনটা যেন সবসময়েই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। চলতে ফিরতে, ট্রামে বাসে, ক্লাসে বা হাসপাতালে, কত রকমের চিন্তা যে মাথার মধ্যে তোলপাড় করত, সে আর কী বলব! মাস্টারমশাইদের ও ছাত্রবন্ধুদের মধ্যেও কেউ-কেউ যুদ্ধের গতি নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি শুনতাম আর ভাবতাম, এঁদের আলোচনাটা তো শখের, আমার কাছে সবটাই কঠোর বাস্তব সত্য।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে জাপানিরা সিঙ্গাপুর দখল করবার পর থেকে রেডিওতে নিয়মিত রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা শোনা যেতে লাগল। রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধেও অনেকে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। অনেকের কাছেই আমি বিষয়টা কাটিয়ে যেতাম। জনকতক বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুর সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করতাম এবং আসন্ন ভীষণ সংগ্রামের কথা বলতাম। এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে দু'চারজনকে পেলাম যাঁরা সত্যি-সত্যি ভবিষ্যতের লড়াইয়ে শামিল হতে চান। এঁদেরই মাধ্যমে কলেজের বাইরের জনকয়েক ছাত্র ও যুবকের সান্নিধ্যে এলাম, যাঁরা একই পথের পথিক।

যদিও প্রস্তুতিপর্ব এইভাবে চলছিল, ১৯৪২-এর প্রথমের দিকে বুঝতে পারিনি যে, বছরের শেষের দিকে আমি এক ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়ে যাব।

॥ ৫১ ॥

১৯৪২-এর মার্চ মাসের শেষাশেষি মেডিকেল কলেজ থেকে নাইট ডিউটি সেরে সকালে বাসে বাড়ি ফিরছি, দেখি এক সহযাত্রীর হাতের খবরের কাগজে রাঙাকাকাবাবুর ছবি। কাছ ঘেঁষে খবরটা পড়ে নিলাম। খবরে বলছে রাঙাকাকাবাবু নাকি জাপানের উপকূলে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। যদিও খবরটা পড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম, একটু চিন্তা করেই বুঝলাম, খবরটা বাজে। সেই সময় রাঙাকাকাবাবু আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে প্রায় রোজই বক্তৃতা করছিলেন। আমি জানি, আজাদ হিন্দ্ রেডিও ইউরোপে, খুব সম্ভব জার্মানিতেই। আর ভূগোলের জ্ঞান এবং তখনকার যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই সময় ইউরোপ থেকে হঠাৎ এরোপ্লেনে করে জাপানে পৌঁছনো সম্ভব নয়। বাস থেকে নেমে এলগিন রোডের বাড়ির সামনে দিয়ে না গিয়ে উডবার্ন পার্কে পৌঁছলাম। মা যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দেখলাম নিজের ঘরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে জল। আমি তো খুব জোরের সঙ্গে মাকে বুঝিয়ে বললাম, খবরটা কোনোমতেই সত্যি হতে পারে না।

মাজননীকে কী করে বোঝানো যায় সে-বিষয়ে আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। অনেকেই বললেন, আপাতত খবরটা চেপে রাখা যাক, ভুল বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে বললেই হবে। কিন্তু এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে শুনি সর্বেশ্বর ঠাকুর খবরটা বাজারে শুনে এসে বাড়ি ফিরেই মাজননীকে বলে দিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, মাজননী শুনেই বলেছেন যে, তিনি খবরটা বিশ্বাস করেন না। তবু আমার মনে হল যে, তাঁর মনে যাতে কোনো দ্বিধা না থাকে, রাঙাকাকাবাবুর বেতার-বক্তৃতা সন্ধ্যায় তাঁকে শোনালে হয়। সন্ধ্যায় মাজননীকে আর ছোটপিসিমা কনকলতাকে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে এলাম। মা ও তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে আজাদ হিন্দ্ রেডিও ধরলাম। গলা খুব ভাল শোনা যাচ্ছিল না, আওয়াজ হচ্ছিল। যাই হোক, সকলকার মন শান্ত হল। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কোনো কোনো নেতা মাজননীর কাছে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। পরে গান্ধীজি মাজননীকে অভিনন্দন জানিয়ে আর একটা তার পাঠালেন।

শুনেছিলাম, ১৯৪১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকেই নাকি আজাদ হিন্দ্ রেডিও চালু হয়েছিল। তবে আমি অনেকদিন ওই রেডিও ধরতে পারিনি। ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ এশিয়ার ইংরেজদের তথাকথিত অজেয় দুর্গ সিঙ্গাপুরের পতন হল। তার পরেই রাঙাকাকাবাবু নিয়মিত বেতার-বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তবে আজাদ হিন্দ্ রেডিও খুব শক্তিশালী ছিল না, সব সময়, বিশেষ করে আবহাওয়া খারাপ থাকলে, ভাল শোনা যেত না।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর রাঙাকাকাবাবুর প্রথম ঐতিহাসিক বক্তৃতা সারা জগৎকে শোনাবার জন্য বার্লিন রেডিও ভাল ব্যবস্থা করল। বার্লিন থেকে প্রচার করা হল যে, এক অজানা রেডিও স্টেশন থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শোনা গেছে। বার্লিন রেডিও সেটি

রেকর্ড করে নিয়েছে। রেকর্ড-করা বক্তৃতাটি বার্লিন থেকে পুনঃপ্রচার করবে। ফলে, আমরা সকলে জোরদার বার্লিন রেডিও মারফত রাঙাকাকাবাবুর সেই বক্তৃতা বেশ ভালভাবে শুনতে পেলাম।

সেকালে ঘরে-ঘরে বিদেশী স্টেশন ধরবার মতো রেডিও ছিল না। রাঙাকাকাবাবুর কণ্ঠস্বর বেতারে শোনা যাচ্ছে জানাজানি হবার পরে অনেকেই রেডিও শোনার জন্য নানা জায়গায় জড় হতেন। কিন্তু পাছে পুলিশ জেনে ফেলে এই ভেবে অনেকেই ব্যাপারটা নিয়ে অতিরিক্ত লুকোচুরি করতেন। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে কিন্তু আমরা দরজা-জানলা খুলে রেখেই তাঁর বক্তৃতা শুনতাম। আমরা তো আগে থেকেই ইংরেজ সরকারের কুনজরে পড়ে আছি, বেশি আর কী হবে!

জাপানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পরে স্থানীয় মিলিটারি কর্তৃপক্ষ উডবার্ন পার্কের বাড়ির উপর নজর দিলেন। নোটিসে জারি হল যে, তাঁরা বাড়িটা মিলিটারি হাসপাতাল করবার জন্য নিয়ে নেবেন। মা তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বাড়ি-ছাড়া করবে নাকি! বাংলার মন্ত্রিসভায় তখন সন্তোষকুমার বসু বাবারই মনোনীত সদস্য। সন্তোষবাবু ফোর্ট উইলিয়ামে হাঁটাহাঁটি করে কোনোরকমে বাড়ি-দখলটা ঠেকালেন।

এদিকে যতই দিন যাচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক সংকট ততই বাড়ছে! আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২ সালটি খুবই স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। ওই বছরে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ সরকারের কপটতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আপসের নীতি ছেড়ে দিয়ে সংগ্রামের পথে এলেন। অনেকের বিশ্বাস রাঙাকাকাবাবুর দুঃসাহসিক দেশত্যাগ ও বেতারপ্রচার গান্ধীজিকে বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছিল। এপ্রিল মাসে তিনি কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কমিটির কাছে একটা প্রস্তাবের খসড়া পেশ করেছিলেন। যেটা পড়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ১৯৪২-এর গান্ধীজি ও রাঙাকাকাবাবু নীতিগতভাবে খুবই কাছাকাছি এসেছিলেন। গান্ধীজি যে ওই বছরের মধ্যেই চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেবেন তার আভাস আমরা নানা দিক থেকেই পাচ্ছিলাম। মেডিকেল কলেজের জনাকয়েক ছাত্র মিলে আমরা আসন্ন লড়াইয়ে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করি। আমাদের আশা ছিল যে, ভিতরের সংগ্রামের সঙ্গে যথাসময়ে রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে বাইরের সংগ্রাম যুক্ত হবে। আমাদের গোপন জল্পনা-কল্পনায় ছিলেন কালিদাস বসু, শচীন চৌধুরী প্রমুখ। মেডিকেল কলেজের বাইরের জনাকয়েক বিপ্লবী যুবকও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। 'লীগ অব রেভল্যুশনারি ইয়ুথ' নাম দিয়ে ১৯৪২-৪৩ সালে সাইক্লোস্টাইল-করা এক ইস্তাহার গোপনে বের করা হত। ভিতরের ও বাইরের সংগ্রামকে যুক্ত করার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমি ওই ইস্তাহারে কয়েকটি লেখা লিখেছিলাম। মেডিকেল কলেজের পিছনের দিকে এজরা হাসপাতালে আমাদের গোপন বৈঠক হত।

১৯৪২-এর ৮ আগস্ট গান্ধীজি বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে তাঁর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। খবর পেয়েই রাঙাকাকাবাবু ৯ আগস্ট সন্ধ্যায় আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশবাসীকে মহাত্মাজির ডাকে সাড়া দিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন। এই ভাষণটি আমি লিখে নিয়েছিলাম, পরে গোপনে প্রচার করার উদ্দেশ্যে। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ হওয়া মাত্র ব্রিটিশ সরকার সারা দেশ

জুড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলেন। জেলে যাবার আগে গান্ধীজি ডাক দিয়ে গেলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'! দেশের প্রায় সব জাতীয়তাবাদী নেতাই কারারুদ্ধ হলেন, অনেকেই আবার গা-ঢাকা দিলেন। সংগ্রামী দলগুলি বেআইনি ঘোষিত হল। যে বিদ্রোহের আগুন বোম্বাইয়ে প্রজ্বলিত হল, ধীরে ধীরে তা দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহের ঢেউ কলকাতায় পৌঁছতে তিন-চার দিন লাগল।

১৩ অগাস্ট সকালে মেডিকেল কলেজে পৌঁছেই চারদিকে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস পেলাম। মামাবাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেয়ে কলেজে ফিরে দেখি, কলেজ-প্রাঙ্গণে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে—বিশেষ করে বিহারের সরকারি তাণ্ডব নিয়ে। খবর এল যে, কলকাতার ছাত্রসমাজ সেইদিনই বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আইন অমান্য করে প্রতিবাদ-সভা করবে। ঠিক হল যে, মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও এক মিছিল বের করবে, তবে আমাদের পরিক্রমাটা হবে ছোট। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড দিয়ে ঘুরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের গেট দিয়ে আমরা আবার কলেজে ফিরে আসব। মিছিলটা বেশ বড়ই ছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের উপর কলেজের গেটের সামনে এসে একটা প্রশ্ন উঠল। আমরা কি কলেজে ফিরে যাব, না সকলের লক্ষ্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করব? আমরা যারা মিছিলের সামনের দিকে ছিলাম, বললাম, পথেই যখন নেমেছি, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে যাবার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। মিশন রো'র মাঝামাঝি পৌঁছে দেখি একদল লাঠিধারী ও সশস্ত্র পুলিশ আমাদের পথ আগলে আছে। দূরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে বন্দুকধারী অনেক সৈন্য। মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসছে। এক পুলিশ অফিসার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমাদের মিছিল বেআইনি, তিন মিনিটের মধ্যে আমরা যদি সরে না যাই, ওরা যা করার তা করবে। আমরা তো ইচ্ছা করেই নানা কথা বলে কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিলাম। এখন স্বীকার করতে পারি, আমরা কেউ-কেউ চাইছিলাম যে, পুলিশ আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেন মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আমার সঙ্গে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রবি রায়, সমীর সেন, ইসমাইল ইব্রাহিম, অতুলেন্দু সেন, কুলভূষণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। অফিসারের 'চার্জ' অর্ডার শোনামাত্র প্রচণ্ড লাঠি-চার্জ আরম্ভ হল। লালটুপি-পরা বিহারি পুলিশ তাদের লম্বা-লম্বা লাঠি মাটিতে ঠুকে ঠুকে সহানুভূতির সুরে বলতে লাগল : বাবুজি, আপলোগ কিঁউ নহি চলে যাতে, চলা যাইয়ে, চলা যাইয়ে। অন্যদিকে হেলমেট-পরা সার্জেন্টরা মোটা-মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে মারধর শুরু করে দিল।

মিছিল ছত্রভঙ্গ হবার পরে আমরা দু'একজন পাশের গলিতে দাঁড়িয়ে কার কোথায় কতটা লেগেছে দেখছিলাম, যাকে বলে 'লিকিং আওয়ার উণ্ডস্'। হঠাৎ একটি লোক আমার পাশ থেকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ তিনজন সার্জেন্ট দৌড়ে এসে আমাকে ঘিরে ফেলে দ্বিতীয় দফায় প্রহার আরম্ভ করল। শেষ মারটা পড়ল মাথায়, চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। যখন একটু সংবিৎ ফিরে পেলাম, দেখি আমার সহপাঠী নারায়ণকুমার চন্দ্র আমাকে ধরে আছে। তার কাঁধে ভর দিয়ে কলেজে ফিরে এলাম। ইমারজেন্সিতে ডিউটি অফিসার ডাক্তার ইব্রাহিম আমাকে পরীক্ষা করেই ভেতরের ঘরে শুইয়ে দিলেন। আমার বমি হতে আরম্ভ করল। একটু পরেই পুলিশ এসে ইমারজেন্সিতে কোনো আহত

বিক্ষোভকারী এসেছে কি না খোঁজ নিতে এল। খবরটা শুনেই ডাক্তার ইব্রাহিম আমাকে আরও ভেতরে তাঁর নিজের ঘরে সরিয়ে ফেললেন।

রাত প্রায় ন'টা হবে, শহরের পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হবার পরে বসুবাড়ির বিশেষ বন্ধু প্রভাসচন্দ্র বসুর গাড়িতে করে আমি বাড়ি ফিরলাম। মা ও বাড়ির অন্য সবাই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর আমি অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওপরে উঠছি। এই দৃশ্যটি বেশ মনে আছে আমার।

॥ ৫২ ॥

পুলিশের হাতে মারধর খেয়ে আমি তো আহত সৈনিকের মতো দিনকতক বাড়িতে শয্যাশায়ী। খবরটা যে কেবল তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল তাই নয়, গুজব রটে গেল যে, আমি মারা গেছি। ব্যাপারটা ঘটবার পরের দিন আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে টেলিফোন করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খবর নিতে লাগলেন কথাটা সত্যি কি না। পরে বর্ধমানের এক বন্ধু জানালেন যে, সেখানে আমার জন্য শোকসভাও হয়ে গেছে। যাঁরা আমাকে বাড়িতে দেখতে আসছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমি খবরাখবর নিচ্ছিলাম। বাংলার ও বাংলার বাইরে নানা জায়গায় জনসাধারণ কী বীরত্বের সঙ্গে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সে-সব শুনে আমরা খুবই গর্বিত হচ্ছিলাম।

পরে, ১৯৪৩ সালে, যখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন বাবা বললেন যে, মাদ্রাজের এক খবরের কাগজে তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলার বিষয় পড়েছিলেন। পড়েই তাঁর মনে হয়েছিল এবং তিনি তাঁর জেলের সাথী, লালা শঙ্করলালকে বলেছিলেন যে, তাঁর ধারণা আমি নিশ্চয়ই ঐ সংঘর্ষের মধ্যে ছিলাম। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর ছেলে এরকম কোনো ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না বা নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। বাবার কথা শুনে আমি মনে খুব বল পেয়েছিলাম।

অন্য দিকে রাঙাকাকাবাবু বোম্বাই কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ হওয়ার ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত দৃপ্ত বেতারভাষণে তাঁর দেশবাসীকে গান্ধীজির ডাকে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। পরে গান্ধীজির উদ্দেশে এক বেতার-ভাষণে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন, তিনি যখন শুনলেন, মহাত্মাজি স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত গণ-সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তখনই তাঁর মনে হল যে, জগতের কাছে, সমগ্র মানবসমাজের কাছে ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আগেই সিঙ্গাপুর পতনের পর তাঁর প্রথম বেতার-ভাষণে রাঙাকাকাবাবু সেই সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আমাদের জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তাঁর মূল কথা ছিল যে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বহুদিনের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতি হিসাবে জগৎসভায় আসন নেবার এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। ঐ সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মিত্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্ররা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শত্রু। ঐ সঙ্কট-মুহূর্তে কেউ কেউ নিজেদের সুবিধাবাদী-নীতি ও ভীরুতা ঢাকবার জন্য চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষের যথার্থ প্রতিনিধি নন। দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে চান এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। তিনি ডাক দিয়ে বলেছিলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার লগ্ন আসন্ন। ভারতের মুক্তি সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তির পথ সুগম করবে।

সেই বিপদের দিনে রাঙাকাকাবাবুর কণ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান আমাদের মনে বল দিত ও আশার সঞ্চার করত। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা কান পেতে থাকতাম। কীভাবে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, কী কী উপায়ে শত্রুপক্ষকে বিপদে ফেলা যায় ইত্যাদি নিয়ে তিনি নিয়মিত আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে বক্তৃতা করতেন। অন্য দিকে জাপানে ও পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ, ইন্দো-চীন, মালয়, শ্যাম, বর্মা থেকে প্রবাসী মুক্তিসংগ্রামী ভারতীয়রাও রেডিও মারফত প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। বেশ কয়েকবার জাপন ও সিঙ্গাপুর থেকে রাসবিহারী বসুর বক্তৃতা শুনেছি মনে আছে। বাইরের রেডিও শুনে বেশ বোঝা যেত যে, প্রবাসী ভারতীয়রা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন।

দিন-দশেক বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে আগস্ট মাসের শেষাশেষি আমি আবার মেডিকেল কলেজে যাওয়া-আসা শুরু করলাম। চারিদিকে তখন খুব উত্তেজনা। দেখলাম ছাত্রমহলে বিদ্রোহ জাগিয়ে রাখবার নানা রকম পরিকল্পনা চলছে। মেডিকেল কলেজের ইংরাজ সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে ছাত্রদের মাঝে-মাঝে সংঘর্ষ হত। ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের বড় থামওয়ালা বাড়ির ছাদে জোর করে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর চেষ্টা করায় সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের সঙ্গে বড় রকমের ঝগড়া হয়। গোয়েন্দাদের কার্যকলাপও সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে যেতে থাকে এবং কলেজের মধ্যে টিকটিকিদের আনাগোনা খুবই নজরে পড়তে থাকে।

আমাদের মধ্যে যারা গোপন প্রস্তুতির কাজে বিশ্বাসী ছিলাম, ক্লাসের পরে সন্ধ্যায় বৈঠক করতাম। আমি রেডিও মারফত যে-সব খবর পেতাম, অন্যদের জানাতাম। সরকারি যোগাযোগ-ব্যবস্থা যথাসময়ে কী উপায়ে নষ্ট করে দেওয়া যায়, এ-সব নিয়ে আলোচনা হত। বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও কেউ-কেউ করেছিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে এখানে-সেখানে সেগুলি ব্যবহারও করা হয়েছিল। আমরা বড় স্বপ্ন দেখতাম। যেমন, উপযুক্ত সময়ে রাইটার্স বিল্ডিংটা ডাইনামাইট দিয়ে আমরা উড়িয়ে দেব, এই ধরনের প্রায় অসম্ভব প্ল্যান নিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হত।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। নিজের শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। ক'দিন থেকেই গায়ে জ্বর-জ্বর লাগছে। একদিন ভোররাতে শুয়ে শুয়ে মনে হল বাড়ির চারিদিকে যেন হাঁটাচলার আওয়াজ পাচ্ছি। একটু ফর্সা হতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি লালপাগড়িতে ছেয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি মাকে খবর দিলাম। বোঝাই গেল বাড়ি সার্চ হবে। কাবুল থেকে বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠিটা তখনও মা'র কাছে আছে। আরও কিছু কাগজপত্র ছিল যেগুলি পুলিশের হাতে না পড়াই ভাল। মা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে রাঙাকাকাবাবুর চিঠি ও অন্য কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে বিসর্জন দিলেন। একটু পরেই নীচের তলা থেকে খবর এল যে, পুলিশ এসেছে, ডাকাডাকি করছে। ১৯৩২-এ বাবাকে যখন প্রথমবার গ্রেপ্তার করে সেই সময় খানাতল্লাশিটা মূলত নীচের তলায় হয়েছিল। এবার দেখা গেল

"I have no doubt that Sisir will be able to bear his unmerited incarceration with calmness and fortitude. I say so, not because he is my son but because I know his frame of mind. In prison there are occasions when one's temper is put to severe test. I am sure, however, that he will not allow his temper to get the better of him, however grave the provocation may be. He is bound to feel that a great wrong has been done to him by the order of detention. But we all know our position in our own country! Even the best among us have to live under a cloud of suspicion. But the cloud will lift some day, and we have to wait in patience for that day. If you meet Sisir, please convey to him my heartfelt blessings and my best wishes for a brighter and happier future. The conviction that he has done no wrong will, I hope, cheer him up.

I knew that [illegible] would be able [illegible]

আমার প্রথম গ্রেপ্তারের খবর পাবার পর বাবার চিঠি

তাদের নজর উপন্ন তলার দিকে এবং আমিই যেন তাদের লক্ষ্য। আমার বই, কাগজপত্র বেশ কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করল। কয়েকটি বই ও পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করল। রাঙাকাকাবাবুর ৯ আগস্টের বেতার-ভাষণ কপি করে টাইপ করে আমার টেবিলে রেখেছিলাম, পরে প্রচার করার উদ্দেশ্যে। খুব ভাগ্যের কথা যে, ঐ কাগজটির উপর তাদেব নজর পড়ল না। সার্চ শেষ করে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আমাকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দেখাল। আমি তো অনেকদিন থেকেই মনে মনে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। নিজের ভাগ্যে কী আছে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনি। তবে মা'র মনের অবস্থা অনুমান করে বিচলিত হতাম। অবশ্য জানতাম যে, তাঁর সহ্যশক্তি অসীম, ঠিক চালিয়ে যাবেন। বিদায় নেবাব সময় কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে বইলাম, একটু হাসলাম। মা কিন্তু হাসতে চেষ্টা করেও পারলেন না, ঠোঁট চেপে রইলেন ; চোখে জল এল, কিন্তু পড়ল না। এই অবস্থায় মা'কে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি।

প্রথমে তারা লর্ড সিন্‌হা রোডের গোয়েন্দা দপ্তরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখল। কিছু বাদে প্রশ্নও করল। দুপুরের পর আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। জেল অফিসে কিছু কথাবার্তার পর আমাকে 'বড়াহ্-হাজত'-এ নিয়ে

গেল। লম্বা একটা ব্যারাক, দেখি সেখানে অনেক বন্দী রয়েছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুবীর রায়চৌধুরী প্রমুখ। "এ কী, তুমিও এলে!" বলে সুরেশবাবু আমি কোথায় কীভাবে থাকব এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন। একটু পরেই কিন্তু সুরেশবাবু আবিষ্কার করলেন যে, আমার গায়ে বেশ জ্বর। চেহারাটাও যে ভাল দেখাচ্ছিল, তা নয়। অবস্থাটা বুঝে বন্দীরা সকলে মিলে দাবি জানালেন যে, আমাকে হসপিটাল ওয়ার্ডে রাখতে হবে। জেলারকে ডেকে পাঠানো হল। জেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়ে গেলেন, আমি হসপিটাল ওয়ার্ডের দোতলায় এককোণে জায়গা পেলাম।

জেল হাসপাতালের অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। প্রথম কয়েকদিন একটু-আধটু ওঠাউঠি করতে পারতাম। দু'দিন পরে মা'র সঙ্গে জেল অফিসে একটা ইন্টারভিউও হল। মা'কে জানালাম আমার জ্বর ও মাথাব্যথা বাড়ছে, উঠে আবার দেখা করতে আসতে পারব কি না জানি না, তিনি যেন মন্ত্রিসভায় বাবার মনোনীত সদস্যদের জানান ও ব্যবস্থা নিতে বলেন।

হসপিটাল ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন কমবয়সী উৎসাহী বন্দী ছিলেন। আমার প্রচণ্ড মাথাধরার মধ্যেও তাঁরা আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা চালাতেন। জেলের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারটি মাঝে-মাঝে ঘুরে যেতেন। হসপিটাল ওয়ার্ডের কর্তা আসলে ছিলেন একজন পুরনো কয়েদী। আসলে হাতুড়ে হলেও বছরের পর বছর জেলের রোগীদের ওষুধপত্র দিতে দিতে আধা-ডাক্তার বনে গিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রকৃতির নিয়মে আমার রোগ ক্রমে-ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং আমি শেষ পর্যন্ত একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম।

সুদূর দক্ষিণ ভারতে বন্দী বাবা আমার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বাবা ও মা তো গোপন কথাগুলি জানতেন। সেজন্য তাঁদের চিন্তার অবধি ছিল না। তবে আমি কারারুদ্ধ হবার পরে চিঠিতে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বাবা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আমি কারাযন্ত্রণা ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে সহ্য করব।

॥ ৫৩ ॥

মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে সত্যিই মৃত্যুকে ভয় হয় না, মনটা কেমন যেন উদাস ও শান্ত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি জেলের হস্‌পিটাল ওয়ার্ডে বিছানায় টাইফয়েড জ্বরে মারাত্মক দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার মনের ভাব সেইরকমই হয়েছিল। জেলের ডাক্তার মাঝে-মাঝে এসে কী যে দেখে যান বুঝি না। ভারপ্রাপ্ত কয়েদি ওয়ার্ডার এটা-ওটা ওষুধপত্র দেন, আমি খেয়েও নিই। কিন্তু ধুম-জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা কিছুতেই কমে না। রোজ সন্ধ্যায় লক-আপের আগে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ব্যারাকের গরাদগুলো ঠুকে-ঠুকে 'বার-টেস্টিং' করে, মানে দেখে গরাদগুলো সব ঠিক আছে কি না। আমার মাথার ঠিক উপরেই একটা বড় গরাদের জানালা। 'বার-টেস্টিং'-এর সময় সে কী বিকট আওয়াজ। মনে হয়, মাথায় যেন কেউ লাঠি মারছে। বললাম, "ওটা বন্ধ করা যায় না?" উত্তর হল, "ওটা করতেই হবে, নিয়ম!"

একদিন হাফ-ডাক্তার ওয়ার্ডারবাবুর মনে হল আমাকে কড়া জোলাপ দেওয়া দরকার, সুতরাং পুরো মাত্রায় 'সাইডলিট্‌স্' পাউডার খাইয়ে দিলেন। দিয়েছেন যখন, খেয়েই নিলাম, যদিও সম্প্রতিই আমাদের কলেজে পড়ানো হয়েছে যে, টাইফয়েড সন্দেহ হলে, কড়া

জোলাপ দেওয়া মানা। ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি বুঝতে পারছি। জেলর বা ডেপুটি-জেলর এলেই আমি বলি যে, মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসুকে যেন অনুরোধ করা হয় আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, জেলের হাসপাতালে থাকলে আমার বাঁচবার আশা নেই। বাড়ি থেকেও এ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা হচ্ছিল, আমি পরে জেনেছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একদিন আমাকে জানানো হল আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার উমাপ্রসন্ন বসু আমাকে পরীক্ষা করতে আসবেন। কানাঘুষা শুনলাম, হোম ডিপার্টমেন্টের সাহেবরা নিশ্চিন্ত হতে চান যে, আমার সত্যিই খুব অসুখ, ভান করছি না। প্রিন্সিপাল সাহেব এসে তো আমাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন। আমি ক্ষীণস্বরে একবার তাঁকে বললাম যে, আপনারাই তো পড়িয়েছেন টাইফয়েডের দ্বিতীয় সপ্তাহে গায়ে র‍্যাশ হয়, আমারও হয়েছে দেখছি, তাহলে কি আমার টাইফয়েড হয়েছে? তিনি মাস্টারসুলভ বকুনির সুরে বললেন, "তোমার টাইফয়েড হয়েছে কি হয়নি, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই, সেটা আমরা দেখব। তুমি যেমন-যেমন বলে যাচ্ছি ওষুধপত্র খাও। তারপর আমি দেখছি কী উপায় করা যায়।"

দু-তিনদিন পরে ডেপুটি-জেলর এসে জানালেন, আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার হুকুম এসেছে। আমার তখন আর ওঠবার শক্তি নেই।স্ট্রেচারে করে জেল থেকে আমাকে বের করে নিয়ে এসে একটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে বন্দুকধারী দুই সিপাই আমার পাশে বসল। মনে মনে হাসলাম, এ একেবারে তাসের দেশ, নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি রুমে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ফেলে রাখল। আমি ডিউটি-অফিসারকে বারে-বারে বলবার চেষ্টা করলাম যে, বন্দী হলেও আমি যখন এ-কলেজের ছাত্র, আমাকে যেন ডাক্তার মণি দে-র ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার দে আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু ও ডাক্তার, তার উপর আমাদের মেডিসিনের অধ্যাপক। তাঁর উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। শুনলাম উপরওয়ালার হুকুম, তা হবে না, ডাক্তার ওয়াহেদের অধীনে আমাকে ভর্তি করা হবে। ডাক্তার ওয়াহেদও আমাদের শিক্ষক, তবে আলাপ-পরিচয় কম। যাই হোক, ডাক্তার ওয়াহেদ খুব যত্নের সঙ্গে আমার দেখাশুনা করেছিলেন। তাঁর নিজের অধিকার প্রয়োগ করে ডাক্তার দে'-কে ডেকে আমাকে পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিলেন। আমাকে বলেওছিলেন, ডাক্তার দে'র সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি তোমার চিকিৎসা করছি। মেডিকেল কলেজে বেশ কিছুদিন আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মা ও নিকট-আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে একবার করে দেখে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। আমার ক্যাবিনের সামনে দিনরাত একটা লালপাগড়ি বসে থাকত ও মাঝে-মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারত। ঘোরের মধ্যেও আমি যুদ্ধের গতি ও রাঙাকাকাবাবুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতাম। সেই সময় স্টালিনগ্রাডে জার্মান ও রাশিয়ানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য এমন মরণপণ লড়াই আর হয়েছে কি না সন্দেহ। মনে আছে আমি গীতাকে প্রায় রোজই জিজ্ঞাসা করতাম, আজ কোন সেক্টরে লড়াই হচ্ছে, কোন এলাকা কার হাতে গেল ইত্যাদি। রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে কি না, তিনি কী বলছেন ইত্যাদিও জিজ্ঞাসা করতাম। পরে শুনেছি ওরই মধ্যে দু'তিনদিন আমার অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল যে, বাড়িতে বলে দেওয়া হয়েছিল কখন কী হয়

বলা যায় না, সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে। মা ও ছোটরা তখন কলেজ স্কোয়ারে মামার বাড়িতে এসে আছেন। মা তো দেখবার সময় চুপচাপ বসে থাকতেন, আর মামিমা পূজোর ফুলটুল প্রায়ই আমার বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে যেতেন।

দক্ষিণ ভারতের বন্দিশালা থেকে বাবার কাছ থেকে গোপন-বার্তা মাঝে-মাঝে মা'র হাতে এসে পৌঁছত। বাবা ও রাঙাকাকাবাবু এ-সব ব্যাপারে বেশ পটু ছিলেন। সাদা কাগজে টাইপ করা বা বড় অক্ষরে লেখা বার্তাগুলি কোনো লোকের মারফত আসত অথবা ভিন্ন-ভিন্ন জায়গা থেকে ডাকে আসত। আমার অবস্থা বুঝে মা আমাকে মাঝে-মাঝে গোপন খবর কিছু-কিছু জানিয়ে যেতেন। একবার তো টাইপ করা একটা কাগজ রাত্রে পড়ে রাখার জন্য আমাকে দিয়ে গেলেন, আমি সেটা বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলাম। ১৯৪২-এর নভেম্বরের ঐ গোপন চিঠিতে বাবা অনেক চাঞ্চল্যকর কথা লিখেছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধান ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইংরাজ সরকার কীভাবে খবর সংগ্রহ করছিল, দলের লোকদের লাহোর কোর্ট বা দিল্লির রেড ফোর্টে ধরে নিয়ে গিয়ে কী সব কাণ্ডকারখানা করেছিল, কী কী তারা জানতে পেরেছে ইত্যাদি অনেক কথা জানিয়েছিলেন। বাবার খবরের সূত্রটা সম্ভবত ছিলেন লালা শঙ্করলাল, যাঁকে পাঞ্জাবের জেলে কিছুদিন রেখে পরে ইংরাজ সরকার বাবার সহবন্দী করে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিয়েছিল। শঙ্করলাল দিল্লির একজন বিশিষ্ট প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ছিলেন। পরে তিনি রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের কিছুদিন আগে তিনি গোপনে নাম ভাঁড়িয়ে জাপান গিয়েছিলেন। বাবার ঐ বার্তায় মিঞা আকবর শাহ্ ও অন্যান্য কয়েকজনের উল্লেখ ছিল। বাবা জানিয়েছিলেন যে, ইংরাজ সরকার রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানে আমার ভূমিকার কথা জানে। সুতরাং আমার টাইফয়েড হওয়াটা হয়তো 'ব্লেসিং ইন ডিসগাইস্' অথবা মন্দের ভাল হয়েছে। নয়তো খুব সম্ভব ওরা আমাকে লাহোরে চালান করে দিত।

ডাক্তাররা যখন বললেন আমি বিপন্মুক্ত, তখন যেন পুনর্জন্মের পরে আবার উঠে বসতে শিখলাম। সরকার ঠিক করলেন যে, আমাকে গৃহবন্দী করা হবে। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমি ফিরে গেলাম। হুকুম হল যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারব না। তখন অবশ্য আমার ঘোরাফেরার অবস্থা ছিল না। তাহলেও গোয়েন্দা-বিভাগের একজন ইন্সপেকটর্ উডবার্ন পার্কে নিয়মিত এসে দেখে যেতেন যে, আমি সশরীরে সেখানে আছি। অন্তরীণের যে হুকুমটা আমার উপর ১৯৪৩-এর জানুয়ারিতে জারি করা হল, তার মেয়াদ ছিল এক বছর।

জাপানি ফৌজ তখন বর্মার সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ১৯৪২ সালেই কলকাতা, পূর্ব ভারতের অন্য কয়েকটি জায়গা ও সিংহলে ছোটখাটো বিমান-আক্রমণ হয়েছিল। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরের শেষে এক সন্ধ্যায় কলকাতায় জাপানিরা কয়েকটা বোমা ফেলল। বিমান-আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক বাড়ির নীচের তলায় একটা ঘর আশ্রয় নেবার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখবার আদেশ জারি হয়েছিল। অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার লোকজনেরা বাড়িতে এসে একটা ঘর বেছে দিয়ে যেতেন। ঘরের কোনো খোলা দিক থাকলে সেদিকটায় একটা দেওয়াল তুলতে হত, এগুলোকে বলা হত 'ব্যাফল্-ওয়াল,'

বোমার টুকরো আটকাবে। তা ছাড়া হাতের কাছে বালির বস্তা, দু-চার বালতি জল, কিছু শুকনো খাবার-দাবার আশ্রয়-ঘরটির মধ্যে বা কাছেই রাখা থাকত। কাঁচের জানালার উপর কাপড় সেঁটে দেওয়া হত, ভাঙা উড়ন্ত কাঁচ থেকে বাঁচবার জন্য। ব্ল্যাক-আউটের জন্য বাড়ির সব আলোতে কালো কাগজের ঢাকা লাগানো থাকত। মাঠে-ঘাটে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল, যাতে বিমান-আক্রমণের সময় কেউ বাইরে থাকলে আশ্রয় নিতে পারেন।

১৯৪২-এর ডিসেম্বরে বড়দিনের রাতে আসন্ন বিমান আক্রমণের সাইরেন বাজল। আমরা সকলে নীচে নেমে আশ্রয়-ঘরে জড় হলাম। আমি তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি, কষ্ট করেই নামলাম। পাশেই উডবার্ন পার্কে সাউথ ক্লাব। ক্লাবের বেয়ারা, মালি সকলে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল। হঠাৎ খুব কাছাকাছিই যেন বেশ জোরে একটা বোমা পড়ার আওয়াজ হল। ক্লাবের এক বেয়ারা হাততালি দিয়ে আনন্দে বলে উঠল, ঠিক মেরেছে, জাপানিরা তো জানে আজ বড়দিনে সাহেব-মেমেরা ফিরপোতে নাচগান করছে, ফিরপো উড়িয়ে দিয়েছে। বোমাটা অবশ্য ফিরপোতে পড়েনি। আসল কথাটা হল যে, খয়ের খাঁর দল আর কতকগুলি সুবিধাবাদী হঠকারী রাজনীতিজ্ঞ ছাড়া দেশের অধিকাংশ সাধারণ লোক চাইছিল যে, যুদ্ধে যেন ইংরাজদের হার হয়।

রাঙাকাকাবাবু জার্মানি থেকে তাঁর বেতার-বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, দেশের নানা জায়গায়, বিশেষ করে কলকাতায় বোমা ফেলতে হচ্ছে বলে তিনি ব্যথিত। কলকাতার কথা বলতে গিয়ে তিনি এই শহরের ও শহরবাসীদের প্রতি তাঁর অন্তরের টানের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, কলকাতাতেই তাঁর কর্মজীবনের বেশির ভাগটা কেটেছে, কলকাতার সব অলিগলিই তাঁর পরিচিত। তবে আমাদের শত্রু কলকাতায় ও অন্য নানা জায়গায় সমরসম্ভার গড়ে তুলছে বলে বোমা ফেলতে হতে পারে। আসলে কিন্তু জাপানিরা কলকাতার উপর বেশি বোমা ফেলেনি। আমরা চাইছিলাম যে, কলকাতা ও পূর্ব ভারতের সব সামরিক ঘাঁটির উপর যেন জোর আক্রমণ হয়। যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠলেই বিপ্লবাত্মক কাজের সুবিধা। পরে শুনেছি রাঙাকাকাবাবুই নাকি জাপানিদের বলেছিলেন মানবিকতার খাতিরে কলকাতার উপর বেশি বোমাটোমা যেন না ফেলা হয়। যে কারণেই হোক, আমাদের দেশে বোমাবর্ষণ খুব কমই হয়েছিল। কিন্তু বোমার ভয়ে ১৯৪২-৪৩ সালে হাজার-হাজার লোক তল্পিতল্পা গুটিয়ে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

॥ ৫৪ ॥

১৯৪৩ সালের মার্চ মাস। রেডিওতে বার্লিন থেকে রাঙাকাকাবাবুর বক্তৃতা শুনে কেমন যেন খটকা লাগল। মনে হল যেন পুরানো কোনো রেকর্ড করা বক্তৃতা শুনছি। রাঙাকাকাবাবু প্রতিবার বক্তৃতার প্রথমে যুদ্ধ-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন। তারপর ভারতবর্ষের ভিতরকার আলোচনা করে নিজের মন্তব্য পেশ করতেন, এবং শেষে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি কী করছেন তার একটা আভাস দিয়ে বিদায় নিতেন। যে বক্তৃতাটা শুনলাম তাতে কোনো নতুন কথা নেই, জানুয়ারি মাসের পরে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ নেই। হঠাৎ আমার মনে হল, রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার পথে

I wish I had the spiritual strength that my revered mother had. She had in her lifetime —
"To suffer woes which Hope thinks infinite;
To forgive wrongs darker than death or night;
To defy Power, which seems omnipotent;
To love and bear;"
And she did it till the end with "gentleness, virtue, wisdom and endurance." The only request she ever made to the authorities was to permit me to come to her bedside, so that she might have "one longing, lingering look." But even that was turned down! No wonder, that it broke a mother's heart.

I read Sisir's, Dada's, your and Gita's letters with tears; and the tears relieved the oppression on my mind to some extent.

মাজননীর মৃত্যুর পর বাবাব চিঠি

পাড়ি দিয়েছেন। আমি সেই রাতেই মাকে ও গীতাকে আমার অনুমানের কথা বললাম। আমি অবশ্য তখন মনে করেছিলাম যে, রাঙাকাকাবাবু খুব সম্ভবত তুরস্ক ও সোভিয়েট সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপান যাচ্ছেন। তখনও রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে খোলাখুলি কোনো ঝগড়া নেই। সাবমেরিনে এতটা পথ যাত্রার কথা কী করেই বা মনে আসবে?

১৯৪৩-এর ২৬ জানুয়ারি আমাদের স্বাধীনতা-দিবসে রাঙাকাকাবাবু বার্লিনে এক বিরাট অনুষ্ঠানে তাঁর ইউরোপ-প্রবাসের শেষ বক্তৃতা দেন। পুরো অনুষ্ঠানটি বার্লিন রেডিও প্রচার করেছিল, এবং আমরা শুনেছিলাম। মূল বক্তৃতাটি তিনি জার্মান ভাষায় দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বয়ানটা আমাদের জন্য প্রচার করেছিলেন। সেই সময়কার ইউরোপের কূটনীতিকরা তো সভায় উপস্থিত ছিলেনই, পশ্চিম-এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামী কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয়েছিল, বাজিয়েছিলেন বার্লিনের রেডিও অর্কেস্ট্রা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের এত ভাল অর্কেস্ট্রা আমি আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

১৯৪৩ সাল যতই এগোতে লাগল, দেশের অবস্থা ততই সঙ্কটাপন্ন হতে লাগল।

ইংরেজ সরকার জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধে খুবই বিব্রত, সে-জন্য জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপর খড়্গহস্ত। একদিকে যুদ্ধের স্বার্থে চলছে নির্মম জনগণের শোষণ, অন্য দিকে কংগ্রেস নেতা ও হাজার হাজার কর্মী জেলে। জাতীয়তাবাদী বামপন্থী—রাঙাকাকাবাবুর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা বাইরে ছিলেন এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যে-সব নেতা ও কর্মীরা আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন। বাংলাদেশে রাঙাকাকাবাবুর একান্ত বিপ্লবী দল বি ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই একে-একে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। সরকারি গোয়েন্দাদের তো সর্বক্ষণ ঐ-সব দল ও লোকদের উপর সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বুঝতেই পারতাম আমাদের পিছনে সবসময়েই পুলিশ। এরই মধ্যে এই বাংলাদেশে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল। শত্রুর হাতে যাতে কিছু না পড়ে এই অজুহাতে ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের মুখের গ্রাসও কেড়ে নিল। আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লাম। আমাদের কাছে আজও সেই সময়কার কলকাতার পথঘাটের দৃশ্য দুঃস্বপ্নের মতো। বাংলার পল্লীগ্রাম থেকে হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার নারী, পুরুষ ও শিশু কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় এক বাটি ফেনের জন্য আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে। তাদের আকুল ডাক রাত্রের অন্ধকার ভেদ করে ক্রমাগতই কানে আসে, ঘুম হয় না। রাস্তায় কত যে মৃতদেহ দেখেছি তার হিসেব নেই। দেশপ্রেমী, সংগ্রামী সব মানুষ তখন বিদেশী সরকারের অত্যাচারে কোণঠাসা। সব দেখে ক্ষোভ ও চাপা ক্রোধে মন ভরে যেত, ভাবতাম আরও কত লোক তো দেশে রয়েছে, কেবল লঙ্গরখানা না খুলে তাঁরা আরও তো কিছু করতে পারেন। জগতের গণতন্ত্র রক্ষায় ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এত লোক তো গলাবাজি করছিলেন, ঘরে বসে ঘুষি পাকিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে বিক্রম দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু কই, বাংলার অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কেউ ডাক দেননি। বিপ্লবের কথা দূরে থাক, সেই সময় এঁরা কেউ ঐ বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে একদিনের জন্যও ধর্মঘট বা হরতাল ডাকেনি। আমাদের মনে হত বিবেকানন্দ,দেশবন্ধু,সুভাষচন্দ্রের দেশটা ক্রীতদাসে ভরে গেল কী করে ? যে দিকে চেয়ে দেখি, কেবলই ক্রীতদাস ! অবশ্য তাদের জামার রঙ ভিন্ন ভিন্ন, কারুর সাদা, কারুর সবুজ, কারুর লাল।

সব দুঃখ ও ক্রোধ ছাপিয়ে উঠত একটা আশা—রাঙাকাকাবাবু—আসবেন। তিনি তো বলেই গিয়েছেন আসবেন, খালি হাতে আসবেন না, বিজয়-খড়্গ হাতে নিয়ে আসবেন, রক্তের বন্যা বেয়ে আসবেন। ক্রীতদাসের দেশ আবার বীরের দেশে পরিণত হবে।

পারিবারিক দিক থেকেও ১৯৪৩ সালটা ছিল শোকের বছর। বছরটার মাঝামাঝি ইলার মৃত্যু হল, শেষের দিকে বিদায় নিলেন মাজননী। আগের বছরের গোড়াতেই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। জ্যাঠাবাবু সতীশচন্দ্রের বড় ছেলে গণেশ, আমাদের মেজদা, হঠাৎ মারাত্মক রকমের মস্তিষ্কের অসুখে মারা গেলেন। ছোট ছেলে দ্বিজেন তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। মেজদার মৃতদেহের পাশে জ্যাঠাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, সে দৃশ্য দেখা যায় না। কলকাতায় তখন বড়দের মধ্যে বিশেষ কেউ নেই। আমি তখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। মেজদার শেষকৃত্য করবার জন্য ছোট ভাই দ্বিজেনকে চাই। আমিই দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ করলাম। বাবারই হাতে গড়া মন্ত্রিসভা তখন রয়েছে। সন্তোষবাবু কলকাতায় নেই, বাবার মনোনীত অন্য মন্ত্রী-মহাশয় বিশেষ গা করলেন না। ফজলুল হক

সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি পুলিশ সাহেবদের বললেন, বড় ভাইয়ের সৎকার করবার জন্য ছোটভাইকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি দেওয়া হোক। তারা তো কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, এর দায়িত্ব তারা নিতে পারবে না, ভারত-সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ফজলুল হক সাহেবকে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর ঘরে আসতে বললেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আমার সেই প্রথম প্রবেশ। গেটে বলা ছিল, সেজন্য ভিতরে যেতে অসুবিধা হল না। আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে শ্যামাপ্রসাদবাবু দিল্লিতে হোম সেক্রেটারি রিচার্ড টটেনহ্যামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাইলেন! কথাবার্তা থেকে বুঝতেই পারছি, সাহেব রাজি হচ্ছেন না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদবাবু ছাড়বার পাত্র নন। শুনে খুব ভাল লাগল যখন শ্যামাপ্রসাদবাবু জোরের সঙ্গে বললেন, এটা করতেই হবে, 'দিস্ হ্যাস টু বি ডান!' শেষ পর্যন্ত টটেনহ্যাম নিমরাজি হল, শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সারাদিন টানাপোড়েনের পরে বিকেলে পুলিশ-পাহারায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিজেন বড় ভাইয়ের শেষ কাজ করে আবার জেলে ফিরে গেল। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর রাজনীতির ক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্য ছিল, তাঁদের পথ ছিল ভিন্ন, কিন্তু আমাদের পারিবারিক ঐ বিপর্যয়ের সময় তাঁর দৃঢ়তা দেখে আমি বেশ অভিভূত হয়েছিলাম।

আগেই বলেছি সেই সময় আমাদের আশার বাণী আসত বেতারে, রাঙাকাকাবাবুর কণ্ঠে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আচমকা টোকিও রেডিও ঘোষণা করল যে, সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে পৌঁছে গেছেন। খবরটা শুনে আমরা সকলে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সারা রাত রেডিও শুনলাম। টোকিও রেডিওতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এটাই ছিল প্রধান খবর। রাঙাকাকাবাবুর প্রত্যেকটি কথা ও ভঙ্গি, তাঁর চেহারার বিবরণ, তাঁর সংগ্রামের কাহিনী, এমন-কী তাঁর পোশাকের খুঁটিনাটি, টোকিও রেডিওর প্রোগ্রামে ভরে রইল। দিন দুয়েক পরেই রাঙাকাকাবাবু টোকিও রেডিও থেকে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করলেন। সারা পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের ডাক দিলেন আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামে শামিল হতে। আমাদেরও আশা হল বছরের শেষের দিকে স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে। কিছু দিনের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু সিঙ্গাপুরে এসে নামলেন। তারপর থেকে প্রতিদিনই সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, সাইগন, রেঙ্গুন, টোকিও, বাটাভিয়া প্রভৃতি রেডিও মারফত আমরা নতুন-নতুন খবর পেতে লাগলাম। সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম বড় প্যারেডে রাঙাকাকাবাবু যে বক্তৃতা দেন সেটা এখনও কানে বাজে। তখন শুনে মনে হয়েছিল, তিনি কত এগিয়ে গেছেন, দেশে আমরা কত পেছিয়ে পড়ে আছি।

ইলার মৃত্যুর খবর রাঙাকাকাবাবু পেয়েছিলেন কি না জানি না। মাজননীর মৃত্যুর খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছিল জানি, কলকাতা থেকেই এক গোপন-বার্তার মাধ্যমে। দেশে ফেরার পরে দেবনাথ দাস বলেছিলেন, একদিন যথারীতি কাজকর্মের পরে অনেক রাত পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিলেন। হয়তো এমনিতে কারুকে কিছু বলতেনও না। দেবনাথবাবু বলে ফেলেন, "আজ আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শুয়ে পড়ুন।"

উত্তরে রাঙাকাকাবাবু বললেন, "না, আমি ক্লান্ত নই, আজ খবর পেয়েছি আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।"

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে মাজননীর শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। নতুনকাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসু যখন বুঝলেন যে, তাঁকে বাঁচানো যাবে না তখন শেষ দেখার জন্য বাবাকে নজরবন্দী হিসাবে কলকাতায় আনবার চেষ্টা শুরু হয়। মাজননী বাবাকে একবার দেখবার জন্য আকুল হয়েছিলেন। বাঙালী ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করবে না বলে সাহেব ডাক্তার ডেনহ্যাম হোয়াইট-এর রিপোর্ট ভারত-সরকারকে পাঠানো হয়। কিন্তু হোম ডিপার্টমেণ্ট কিছুতেই বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে রাজি হয় না। বাবা জেলে থাকতে আমার মাও একবার ১৯৪৪-এ মরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাবার নিজেরই মনে হয়েছিল, মা'র সঙ্গে হয়তো তাঁর আর দেখা হবে না। তখনও কিন্তু ইংরেজ সরকারের মন টলেনি। মা কোনো ক্রমে রক্ষা পেয়ে যান, কিন্তু মাজননীকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। মাজননীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা কয়েকটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর মা'র কথা তিনি ইংরেজ কবি শেলির ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন—

> "জীবনে তাঁকে আশাহীন সীমাহীন দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে ;
> মৃত্যু বা নিশার চাইতেও ঘনান্ধকার অন্যায় তিনি ক্ষমা করেছেন ;
> যে শক্তিকে মনে হয়েছে দুর্জয়, তা তিনি তুচ্ছ করেছেন ;
> ভালবেসেছেন সয়েছেন ;
> এবং তা তিনি জীবনান্ত পর্যন্ত করেছেন নম্রতা, ধর্মপরায়ণতা, জ্ঞান ও সহ্যশক্তির সঙ্গে।"

॥ ৫৫ ॥

১৯৪৩-এর শেষ, ১৯৪৪-এর শুরু। ক'দিন আগেই মাজননীর মৃত্যু হয়েছে, আমাদের অশৌচ চলছে। এক নির্জন সন্ধ্যায় এক অবাঙালী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। একেবারে যুবক না হলেও বয়স বেশি নয়। শরীরের গড়ন মোটামুটি ছোটখাটো, রং ফর্সা, মাথার চুল কোঁকড়া। বললেন পূর্ব এশিয়া থেকে গোপনে এসেছেন, সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর নিজের হাতে লেখা চিঠি। রাঙাকাকাবাবু তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিলেন। পড়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। লেখাটা যে রাঙাকাকাবাবুর সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ হল না। সিঙ্গাপুরের ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স্ লিগের সদর দপ্তরের চিঠির কাগজে লেখা। একেবারে উপরে ছাপানো রয়েছে Faith, Unity, Sacrifice। তার নীচে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স্ লিগের ৩ নম্বর চাঙ্গারি লেনের ঠিকানা। তারিখটা রাঙাকাকাবাবুর নিজের হাতে লেখা : শ্রীশ্রীকালীপূজা, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

চিঠিটার বয়ান হল : পত্রবাহক বিশেষ জরুরি কাজে দেশে যাচ্ছেন। আমার বন্ধু, সহকর্মী ও সমর্থকেরা তাঁকে সাহায্য করলে আমি বিশেষ বাধিত ও সুখী হব।—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

চিঠিটা ভাল করে দেখার পর আমি অতিথিকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কী করতে হবে। তিনি বললেন নেতাজীর নির্দেশ অনুযায়ী গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য ও নানারকম ব্যবস্থাদি নেবার জন্য ঠিকমতো যোগাযোগ করে দিতে হবে। তিনি বললেন, তাঁর

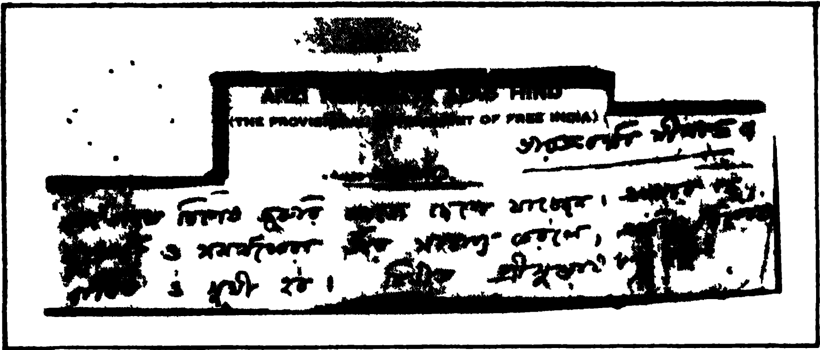
নাম টি কে রাও ; বাড়ি মাদ্রাজে। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সাবমেরিনে চেপে ওঁরা ভারতে এসেছেন, নেমেছেন সুদূর কাথিয়াওয়াড় উপকূলে। চারজন চারদিকে চলে গেছেন। প্রারম্ভিক কাজ সমাধা করে ওঁরা কোনো বিশেষ দিনে বেনারসে মিলিত হবেন। নিজের সম্বন্ধে ভদ্রলোক জানালেন যে, তিনি ব্রিটিশ ফৌজে ছিলেন, উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত টোবরুক-এর জার্মান সেনাপতি রোমেলের ফৌজের হাতে বন্দী হন। তারপর ইউরোপে নেতাজীর ডাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। গোপন বৈপ্লবিক নানারকম কার্যকলাপে বিশেষ করে রেডিও যোগাযোগের কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নেতাজী ইউরোপ ত্যাগ করার কিছুদিন পরে মেজর এম· জি· স্বামীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল একটি জার্মান ব্লকেড রানার জাহাজে এশিয়া পাড়ি দেন। শত্রুপক্ষের ব্লকেড ভেদ করে এবং সবরকম আক্রমণ প্রতিহত করে ওঁরা পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছে যান। সিঙ্গাপুরে মেজর স্বামী নেতাজীর নিজস্ব গোপন বিপ্লবী সংগঠনের ভার পান। জার্মানিতে প্রস্তুত একটি আধুনিক রেডিও ট্রান্সমিটার তাঁরা নিয়ে এসেছেন। ঐ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তাঁরা নেতাজী ও মেজর স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

রাও খুব আবেগের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনেক কথা বললেন। বিশেষ করে আমাদের স্বাধীন সরকার গঠিত হবার পর থেকে মালয় ও সারা পূর্ব-এশিয়ায় যে বিরাট মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে এবং রাঙাকাকাবাবু সব স্তরের ভারতীয়দের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছেন তার একটা ছবি তিনি আমার সামনে তুলে ধরলেন। বললেন, নেতাজী যেখানেই যান, হাজার-হাজার মানুষ তাঁর পেছনে ছোটে। রাও সেই প্রথম আমাকে 'জয় হিন্দ' বলতে শেখালেন। আমি অবশ্য আগেই রেডিও মারফত অনেক খবরই পেয়ে গেছি। পুলিশের অনুমতি নিয়ে পুজোর সময় বারারিতে দাদার কাছে গিয়েছিলাম। যে-ঘরে মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে রাঙাকাকাবাবুকে চা খাওয়ানো হয়েছিল, সেই ঘরে বসেই ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর রাঙাকাকাবাবুর নিজের গলায় আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ শুনেছিলাম। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। এখন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সবকিছু শুনলাম।

যোগাযোগের ব্যাপারে রাও কয়েকটি নাম করলেন—সত্যরঞ্জন বক্সী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুধীর রায়চৌধুরী ও অতুলচন্দ্র কুমার। প্রথম তিনজনই তখন জেলে, অতুলবাবু বোধহয় মালদায়। সেজন্য তখনই আমি রাওকে কোনো কথা দিতে পারলাম না। একটা দিন বাদ দিয়ে সন্ধ্যার শো-এ মেট্রো সিনেমায় আসতে বললাম। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে দেখাশুনো করা মোটেই সমীচীন নয়, আমি তখনও অন্তরীণ, গোয়েন্দাদের নজর খুব কড়া।

সেই রাত্রেই মা'কে চিঠিটা দেখালাম। চিঠিটা যে রাঙাকাকাবাবুর লেখা, সে-বিষয়ে মা'রও কোন সন্দেহ হয়নি। কার সঙ্গে কীভাবে রাওর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেওয়া যায়, এ-বিষয়ে মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। আমরা জানতাম যে গোপন বৈপ্লবিক কাজে রাঙাকাকাবাবুর একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। আমরা ছোটরা তাঁকে আমাদের পরিবারের একজন বলেই মনে করতাম। বাবার গ্রেপ্তারের পর তিনিই মা'র কাছে রাঙাকাকাবাবুর খবরাখবর নিয়ে আসতেন। তিনি যখন জেলে, আমি ঠিক করলাম তাঁর ছোট ভাই সুধীররঞ্জন বক্সীর সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাইব।

পরের দিন সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে সত্যবাবুর বাড়িতে সুধীরবাবুকে পেয়ে



নেতাজীর গোপন বার্তা

গেলাম। তাঁকে ব্যাপারটা বললাম। সুধীরবাবু সব শুনে বেশ উৎসাহিত হলেন। তখনও বিপ্লবী দল বি· ভি· বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস-এর কিছু-কিছু সদস্য মুক্ত ছিলেন। সুধীরবাবু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো বিপ্লবীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন স্থির করলেন। সুধীরবাবু কলকাতা করপোরেশনে কাজ করতেন। ঠিক হল যে, আমি রাওকে বলব করপোরেশনে গিয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। অফিসে ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানের অজুহাতে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করলে কেউ সন্দেহ করবে না। আমরা রাওয়ের একটা নাম দিলাম—প্রসাদ। সে সুধীরবাবুর কাছে প্রসাদ বলে পরিচয় দেবে। তারপর যা করবার সুধীরবাবু করবেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সোশ্যাল। আমি ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। স্বাগত ভাষণটা আমাকেই দিতে হবে। মেডিকেল কলেজের পথে মেট্রোয় নেমে রাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রটা সমাধা করতে হবে। মেট্রোর সামনে পৌঁছতেই রাওকে দেখতে পেলাম। দুটো টিকিট কেটে রাওকে ইশারা করে ডেকে নিয়ে ভিতরে গেলাম। ছবি আরম্ভ হবার আগে যে কয়েক মিনিট সময় পেলাম তারই মধ্যে রাওকে বুঝিয়ে দিলাম কীভাবে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। নিউজ্ রিল দেখানো হয়ে যাওয়ামাত্র আমি সিনেমা থেকে বেরিয়ে এলাম। মেডিকেল কলেজে সময়মতোই হাজির হয়ে গেলাম। বক্তৃতাও করলাম।

পরের দিন দুপুর বেলা কলকাতা করপোরেশন থেকে টেলিফোন এল। অন্য দিক থেকে কেউ বললেন, আমি প্রসাদ বলছি, আপনার নির্দেশমতো আমি এখানকার অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবার ভার নিয়েছেন।

রাঙাকাকাবাবুর সেই চিঠিটা আমি আট-নয় মাস নিজের কাছেই রেখেছিলাম। আমি যখন মেডিকেল কলেজে যাতায়াত করতাম, প্রায়ই চিঠিটা আমার পার্সে থাকত, যেটা খুলে আমি ট্রাম-বাসের ভাড়া দিতাম। কাজটা বোধহয় ঠিক করিনি। তবে চিঠিটা বুকের কাছে রেখে কী যে আনন্দ পেতাম বলবার নয়। রাঙাকাকাবাবু আমাকে মনে রেখেছেন, আবার এত বড় একটা কাজের ভার দিয়েছেন, এর চেয়ে বেশি আমি জীবনে আর কী পেতে পারি!

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার অন্তরীণের আদেশের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। কী

জানি কেন, সরকার সেই সময় আদেশটা বহাল রাখল না। সেই সময় মা ও ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে বাবার সঙ্গে কুনুরের বন্দিশালায় দেখা করতে গেলাম। সঙ্গে নিয়ে গেলাম রাঙাকাকাবাবুর চিঠিটা। ঠিক করেছিলাম যে-কোনো উপায়ে বাবাকে চিঠিটা দেখাব। আমাদের কুটুম্বিতার সূত্রে এক আত্মীয় মিত্তিরমশাই পুলিশ অফিসার ছিলেন, এবং কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কুনুরের সেই বাড়িতে থাকতেন। তিনি সব সময় বাবার উপর দৃষ্টি রাখতেন আর চিঠি সেন্সর করতেন। বাবার সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি আমাদের উপর চোখ রাখতেন আর কান পেতে থাকতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, মিত্তিরমশাইকে বারে-বারে বাথরুম যেতে হত। সেই সুযোগে আমি বাবাকে রাঙাকাকাবাবুর চিঠিটা দেখালাম এবং আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু খবর তাড়াতাড়ি বলে দিলাম। চিঠিটা নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যখন সুধীরবাবু ও আমি বুঝলাম যে, পুলিশ ধীরে ধীরে চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে আনছে তখন এক রাত্রে আমি চিঠিটা নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের হাতে দিয়ে আসি। তিনি পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সেটি নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হন। যুদ্ধের পর পি· কে· রায় বলে এক ভদ্রলোক অনুরূপ একটি চিঠি আমার হাতে দেন। রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশে তিনি পায়ে হেঁটে সীমান্ত পার হয়ে দেশে আসছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের গতি প্রতিকূল হয়ে পড়ায় সীমান্ত পার হতে পারেননি। চিঠিটি রাঙাকাকাবাবু আমার হাতে দিতে বলেছিলেন। বয়ান ছিল একই, কেবল ঠিকানা ছিল আলাদা। মূল চিঠি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় আছে।

॥ ৫৬ ॥

রাঙাকাকাবাবু যখন ১৯৪১ সালে ইউরোপে যান তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটা ছিল অন্য রকম। জার্মানি তখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে। রাশিয়া নিরপেক্ষ। জাপান ও আমেরিকা লড়াইয়ের আওতার বাইরে। ইতালির সহযোগিতায় জার্মানি ইংরেজদের ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ঘাঁটিগুলি আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। এই অবস্থায় রাঙাকাকাবাবু জার্মান সরকারের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব রাখলেন। তিনি চাইছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্বার্থে, যে-কোনো উপায়ে লড়াইটা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে টেনে আনতে। তিনি জার্মানদের বলেছিলেন যে ইউরোপ থেকে আফগান-ভারত সীমান্তে পৌঁছতে তিন-চারটি পথ বের করা যায়। তবে রাশিয়া বা তুরস্কের কিছু সাহায্য পেলে কাজটা সহজ হয়। রাঙাকাকাবাবুর পরিকল্পনা ছিল তিনি ইউরোপে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলবেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র উপজাতিদের সাহায্যে সেটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করবে। তারপর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠান ও পাঞ্জাবি বিপ্লবীরা দলে দলে ঐ মুক্তি অভিযানে যোগ দেবেন।

১৯৪১-এর মাঝামাঝি জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করায় ঐ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। সুতরাং রাঙাকাকাবাবু নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন। দলিলপত্র থেকে দেখতে পাই যে, ১৯৪২ সালের প্রথম থেকেই তিনি ইউরোপ ছেড়ে পূর্ব-এশিয়ায় চলে

আসার জন্য ব্যবস্থা নিতে জার্মানিদের চাপ দিচ্ছিলেন। জাপান তখন ভারতের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল, কিন্তু পুরো এক বছর পরে। সিঙ্গাপুরে রাঙাকাকাবাবু পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের প্রথমে। দেরি হলেও তিনি ছাড়বার পাত্র নন। কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাকাকাবাবু একটি গুপ্ত বিপ্লবীদের দল গড়ে তুললেন, যাঁরা গোপনে আগেই দেশে প্রবেশ করবেন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি সুগম করবেন। এইরকম একটি দলের পক্ষ থেকে 'টি কে রাও' রাঙাকাকাবাবুর চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

সুধীররঞ্জন বক্সীর সঙ্গে রাওয়ের যোগাযোগ করে দিয়ে বেশ ভাল ফলই হল। সুধীরবাবু রাওকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কী-কী ভাবে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। রাও বললেন, প্রথমত, তাঁরা ভারতে ইংরেজ ও আমেরিকান ফৌজ সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর চান। যথা, তাদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার, বিমান-বাহিনীর শক্তি এবং কোথায় এবং কীভাবে তাদের সাজানো হয়েছে। এই সব খবর রাঙাকাকাবাবুকে তাঁরা গোপন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে পৌঁছে দেবেন। দ্বিতীয়ত, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাংলার গেরিলা-বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশের ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় রাঙাকাকাবাবুর অনুগামী রাজবন্দীদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে হবে এবং তাঁদের মনোবল অটুট রাখতে হবে।

সুধীরবাবু বি ভি দলের রাতুল রায়চৌধুরী ও ধীরেন সাহারায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ধীরেনবাবু তাঁর দুই সহকর্মী নীরেন রায় ও চঞ্চল মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতায় বলরাম বসু স্ট্রীটে এক ভাড়াবাড়িতে বসবাস করছিলেন। সুধীরবাবু, রাতুলবাবু ও ধীরেনবাবু নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চললেন। অন্যদিকে সুধীরবাবু রাওয়ের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিলেন। আমি সন্ধ্যার পর মাঝে-মাঝে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করে খোঁজ-খবর নিতাম। প্রথম মাসচারেক পুলিশ কিছু আঁচ পেয়েছিল বলে আমার মনে হয় না।

বি ভি-র তিন বন্ধু ঠিক করলেন যে, গেরিলা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা ঠিকমতো করা দরকার। তাঁরা গোপনে রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র নামানোর জন্য সন্দেশখালি ও রায়মঙ্গল বেছে নিলেন। ঐ এলাকার অনেক মাঝির সঙ্গে নৌকা সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন। ওপার থেকে আসা বিপ্লবী-যোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখার জন্যও নানা জায়গা ঠিক করে রাখা হল।

সুধীরবাবু রাও ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় দেখা করতেন। শেষ পর্যন্ত একদিন ১৫নং বলরাম বসু স্ট্রীটে স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাও ও তাঁর সাথী ক্রমাগত তাঁদের বাসস্থান পালটাতেন। স্থানীয় কর্মীদের গোপন আস্তানা থেকে মাঝে-মাঝে তাঁরা খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন এবং রেঙ্গুন থেকে রাঙাকাকাবাবুর কাছ থেকে বার্তাগুলি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। গোপন সামরিক খবর সংগ্রহের ব্যাপারে এক দুঃসাহসী দেশপ্রেমী মহিলা শান্তিসুধা রায়চৌধুরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি আমেরিকান সামরিক দপ্তরে সেক্রেটারির কাজ করতেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তিনি এনে দিয়েছিলেন এবং সেগুলি রাও রেডিও মারফত রাঙাকাকাবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ধীরেন সাহারায়, চঞ্চল মজুমদার ও

নীরেন রায় বাংলার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য ঘাঁটির ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাঙাকাকাবাবুর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি বার্তা গোপন ট্রান্সমিটার মারফত কলকাতায় পৌঁছেছিল। দুটি সুধীরবাবু আমাকে দেখিয়েছিলেন, আমার বেশ মনে আছে। একটাতে বি ভি-র কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন হঠাৎ আক্রমণাত্মক কিছু না করে বসেন, তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। যশোর, খুলনা ও চট্টগ্রামের কোনো কোনো অঞ্চলে ডুবোজাহাজ পাঠানোর সুবিধা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তিনি জানতে চেয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানি সৈন্যবাহিনী আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ শুরু করল, তখন আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। খবর পেলাম, সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে আকাশ থেকে প্রচারপত্র ফেলা হচ্ছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর স্থানীয় বিপ্লবীদের আস্তানা সরিয়ে চিৎপুরে শিব ঠাকুর লেনের তিনতলার একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। রাও ও তাঁর সঙ্গী প্রায়ই এই বাড়িতে আসতেন এবং খবর আদান-প্রদান করতেন। লড়াই যতই তীব্র হতে লাগল, কাজকর্মও তত বেড়ে গেল। এই সময় রাঙাকাকাবাবু চাইলেন যে, তাঁর দলের রাজবন্দীদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করা হয়। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নীরেন রায়কে ছদ্মবেশে বক্সা বন্দী-শিবিরে পাঠানো হল। সেখানে সত্য গুপ্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার ও অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। ঠিক হল যে, যথাসময়ে ঐ বন্দীরা জেল থেকে উধাও হবেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হবেন। বন্দীদের পালাবার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

রেডিও মারফত আমরা খবর পেলাম আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানি সেনা কোহিমায় পৌঁছে গেছে এবং ইম্ফল ঘিরে ফেলেছে। আরও নীচের দিকে টামু দিয়েও আজাদি সৈন্য ভারতে ঢুকে পড়েছে। সেই সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও তাঁদের তাঁবেদারদের মনে কী ত্রাসেরই না সঞ্চার হয়েছিল! আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে, ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলা থেকে হঠে গিয়ে বিহারের মাঝামাঝি কোথাও নতুন একটা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা প্রস্তুত করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য। ইম্ফল দখল করার আগেই প্রচণ্ড বর্ষা নামল। জুলাই মাসে রাঙাকাকাবাবু আজাদ হিন্দ ফৌজকে সীমান্ত থেকে ফিরে আসবার নির্দেশ দিলেন। রাও মারফত গোপন-বার্তায় তিনি জানালেন যে, পুজোর সময় আবার আক্রমণ শুরু করা হবে। এর কয়েক দিন পরে রাও ও তাঁর সঙ্গী শিব ঠাকুর লেনে এসে ধীরেন সাহারায় ও চঞ্চল মজুমদারকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের উলটো দিকে এক গলির ভিতর এক হোটেলের চারতলায় নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে খুব জরুরি কিছু খবর তাঁদের বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে রাঙাকাকাবাবুকে পাঠালেন।

ধীরেনবাবু ও চঞ্চলবাবু ফিরে শিব ঠাকুর লেনের কাছাকাছি এসে দেখলেন, অনেক পুলিশ বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। তাঁরা খবর পেলেন যে, নীরেন রায় গ্রেফতার হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গী গোপাল সেন পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চারতলা থেকে রাস্তায় পড়ে গেছেন। ধীরেন ও চঞ্চল সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুধীর বক্সী ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাবধান করে দিলেন। সুধীরবাবু টেলিফোনে আমাকে মেডিকেল কলেজে

গোপাল সেন সম্বন্ধে খবর নিতে বললেন। আমি কিছু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

পুলিশের দল শিব ঠাকুর লেনের আস্তানায় যখন উপস্থিত হয় তখন নীরেন ও গোপাল সেখানে ছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁরা গোপন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে থাকেন এবং যতক্ষণ পারেন সর্বশক্তি দিয়ে পুলিশকে ঘরের বাইরে ঠেকিয়ে রাখেন। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ে। নীরেন গ্রেপ্তার হন, গোপাল সেন পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চারতলা থেকে একেবারে নীচে পড়ে যান। তাঁদের উপর নির্দেশ ছিল, কোনো কাগজপত্র যেন পুলিশের হাতে না পড়ে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে গোপাল সেন বলেছিলেন, "জীবন থাকতে আমি ওদের কিছু নিতে দিই নাই।"

॥ ৫৭ ॥

১৯৪৪ সালে বর্ষা নামবার পরে সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয় এবং কলকাতার শিবঠাকুর লেনে বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানায় পুলিশের হানা প্রায় একই সময়ে ঘটল। সুধীর বক্সী আমাকে জানালেন যে, শিবঠাকুর লেনের দুর্ঘটনার পরে টি· কে· রাও ওরফে 'প্রসাদ' ও তার সঙ্গীদের বাংলা থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে বলা হয়েছে। তাঁরা যে গ্রেফতার এড়াতে পেরেছিলেন সেটা আমি যুদ্ধের পরে জেনেছিলাম।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ইংরেজ গোয়েন্দা দফতর আমাদের এই সব কার্যকলাপের খবর পেল কোন্ সূত্রে? ক্রমেই তারা খুব সজাগ হয়ে উঠল এবং আমাদের গতিবিধির ওপর খুব কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করল। সাবমেরিনে চড়ে রাও ও তার সঙ্গীদের ভারতে প্রবেশ ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের খবর জার্মানি পররাষ্ট্র দফতরের পুরনো নথিপত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ১৯৪৪-এর মে মাসে কাবুল থেকে জার্মান দূত এক গোপন টেলিগ্রামে বার্লিনে জানাচ্ছেন যে, সুভাষ বসুর পাঠানো একটি দল তাঁর নিজের লেখা চিঠি নিয়ে কলকাতায় "শরৎ বসুর ছেলে শিশির"-এর সঙ্গে দেখা করেছে। তাদের মধ্যে একজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে সাহায্যের জন্য খোঁজখবর করেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাওয়ের দলের কেউ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছেছিল এবং আমাদের পুরনো সহকর্মীদের খুঁজেছিল।

১৯৪২-এর প্রথম থেকেই পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আমাদের সব ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়। কারণ পাঞ্জাবের কিরতি কিষান পার্টি, যারা ১৯৪০-৪১ সালে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এবং ভগত রাম যে পার্টির সদস্য ছিলেন, ১৯৪২ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায় এবং আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করায় আমাদের সঙ্গে তাদের প্রতিপক্ষের সম্পর্ক দাঁড়ায়। এই অবস্থায় অনেক কিছু ঘটবার সম্ভাবনা। বাবা আমাকে বন্দীনিবাস থেকে এক গোপন চিঠিতে ১৯৪২ সালেই জানিয়েছিলেন যে, রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের খুঁটিনাটি খবর ইংরেজ গোয়েন্দা দফতরে পৌঁছে গেছে।

১৯৪৪ সালে যখন আমরা রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো দলের সঙ্গে কাজ করছি, আমি নিজেই মেডিকেল কলেজের কমনরুমে এক রাজনৈতিক দলের পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, সুভাষ বসুর এজেন্টরা দেশে গোপনে প্রবেশ করছে এবং তাদের যেন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

পড়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম।

যাই হোক, জুন-জুলাই মাস থেকে নজর করলাম যে, গোয়েন্দারা আমাকে খুব কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করছে। আমি বাড়ি থেকে বেরোলেই তারা আমার পেছু নেয়, একজন নয় দুজন। কলেজে যাওয়া, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করা তো আছেই। আমি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ট্রামে চেপে যখন সুধীরবাবুদের বাড়ি যেতাম তখনও অন্তত জনাদুয়েক টিকটিকি আমার পিছনে পিছনে যেত। আমরা সেই সময়ে বেশ বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধে আমরা এতই নিশ্চিত ছিলাম যে, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কী বিপদ হতে পারে চিন্তা করতাম না। আমি যখন ঘুরে বেড়াতাম প্রায়ই আমার মানিব্যাগে রাঙাকাকাবাবুর চিঠিটা থাকত।

সরকার যে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একটা আঁচ পেয়েছিলেন সেটা তাদের কতকগুলি হুকুম থেকেও বোঝা যায়। বাবার চিঠিপত্র বন্দীনিবাসে নিযুক্ত বাঙালী অফিসারটি সে-পর্যন্ত সেন্সর করতেন। হঠাৎ হুকুম হল যে, বাবার সব চিঠিপত্র কলকাতায় সেন্সর হবে—সেন্সর করবেন কট্টর গোয়েন্দা-অফিসার শশধর মজুমদার। আমি যখন ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখনও 'বডি-সার্চ'-এর হুকুম ছিল না। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন বাড়ির অন্য কেউ-কেউ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন কর্তৃপক্ষ বললেন যে, প্রত্যেকের বডি-সার্চ করা হবে, এমনকী মহিলাদেরও। বাবা ঐ শর্তে দেখা করতে অস্বীকার করেন।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আমি বেশিক্ষণ তাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলে গোয়েন্দারা অস্থির হয়ে পড়ত। ঐ সময় মেডিকেল কলেজে আমার 'লেবার ডিউটি' পড়ল, ইডেন হাসপাতালে দিনকতক থাকতে হল। আমি ভিতরকার ডিউটি-রুমে সত্যিই আছি কি না জানবার জন্য বাইরে থেকে তারা আমার খোঁজ করত বা ডেকে পাঠাত। বাইরে এসে আমি দেখতাম কেউ কোথাও নেই। যখন আমি বুঝলাম যে, আমার গ্রেফতার প্রায় নিশ্চিত, আমি রাঙাকাকাবাবুর চিঠিটা সরিয়ে ফেলা ঠিক করলাম। সুধীরবাবু আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন যে, আমাদের গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়কে জানিয়ে রাখা হয়েছে। আমি একদিন সন্ধ্যায় নরেনবাবুর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে এলাম।

গ্রেফতার অনিবার্য হয়ে আসছে বোঝবার পরে একবার আমি গা-ঢাকা দেবার বা আণ্ডার গ্রাউণ্ড হয়ে যাবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাকে না পেলে পুলিশ আমাদের পরিবারের উপর, বিশেষ করে আমার মা'র উপর, বেশি রকম জুলুম আরম্ভ করবে এই ভেবে ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করি।

১৯৪৪-এর অক্টোবর। একদিন যথারীতি সকালে মেডিকেল কলেজে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে লি রোড ধরে হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্রাম ধরব। লি রোডে ঢোকামাত্র টের পেলাম দুটি লোক খুব কাছাকাছি থেকেই আমাকে অনুসরণ করছে, ঠিক যেন মিলিটারি কায়দায় মার্চ করে আসছে। ভাবলাম বাড়ি ফিরে যাব কি না। কিন্তু মনে হল যে, এরা আমাকে বাড়ি ফিরতে দেবে না। এগিয়েই চললাম। খানিকটা এগিয়ে দেখি রাস্তার ডান দিকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—আমাদের বেশ চেনা, গোয়েন্দা দফতরের ছাই-রঙের

Coonoor,
7th November 1944.
Tuesday evening

CENSORED AND PASSED
14/11
D.I.G., I.B.
BENGAL

My dear Ajit,

Your letter of the 29/30th ult was delivered to me yesterday afternoon. Asoka must have given me the details of what happened on the 17th ult in his letter to me of the 19th ult; but that letter never reached me.

From your letter I gather that Sisir was brought to Woodburn Park after his arrest and was given the opportunity to meet his mother and his brothers and sisters for a few minutes. I can well imagine what a sad and poignant parting it must have been. Who could ever have thought that Sisir, of all persons, would be pounced upon by the guardians of law and order. We are living in very strange times, indeed!

That Sisir would remain calm and collected even in most distressing circumstances was what I had expected. That he should have thought more about his mother than about himself was just like him. Persons with clear conscience do not get ruffled even under trial and unnerved [illegible]. May the Divine

আমার দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তারের পর বাবার চিঠি

ফোর্ড ভি-এইট গাড়ি। আমি কাছাকাছি আসতেই ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক পুলিশ অফিসার ধীরে ধীরে রাস্তার ওপার থেকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, "শিশিরবাবু, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একবার লর্ড সিন্‌হা রোডে আসতে হবে।" গাড়িতে তুলে নেবার পর বললেন, "কলেজে যাচ্ছিলেন বোধহয়, আমাদের ওখানে বেশি সময় লাগবে না, একটু দেরি হয়ে যাবে আর কি।" ১৪নং লর্ড সিন্‌হা রোডের পুলিশ দফতরের উত্তরে ছোট-ছোট কয়েকটি ঘর আছে। তার মধ্যে একটাতে আমাকে বসাল। কিছুক্ষণ পরে কতকগুলি

CENSORED AND PASSED
h. 14/4
D.I.G. ... BENGAL

Mother bless him and so ordain that his maligner, or maligners, whoever he or they may be, may be shamed into silence and he may be completely vindicated!

The suppression of all news about Sisir is most exasperating. From this distance it is not possible to suggest what should be done. I have no doubt, however, that you and others on the spot will do all that is humanly possible to ascertain the state of his health and the conditions of his detention.

It was very good of Montu to arrange to send Sisir's clothes to Delhi. Please give him my love and blessings and tell him that, though I have not been able to write to him, I can never forget his solicitude for us and his loving services.

I wonder if Mr Akhil Chandra Datta remembers Sisir. As far as I remember, he saw Sisir in Simla more than once in the year in 1936. Please convey my kindest regards to him.

Yes, I read in the papers last month that Sri Asoka Roy came to Calcutta for a couple of days. If you happen to write to him, please convey to him my love and good wishes. I hope he remembers me still.

I was glad to learn that you made it possible for Asoka to stay a day more in Calcutta. I hope the servants did not make a mess of things during his absence from Bararee and that you had not

মামুলি ধরনের প্রশ্ন-টশ্ন করল। গ্রেফতারের অর্ডার দিল। তারপর আমাকে আবার গাড়িতে তুলল, ভাবলাম বুঝি জেলে পাঠাচ্ছে। একটা ছোট-খাটো পুলিশের গাড়ি মিছিল করে আমাকে কিন্তু উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আবার বাড়ি সার্চ হবে। এবার সার্চটা হল বেশ উগ্র রকমের। মনে হল, বিশেষ কিছু যেন তারা খুঁজছে। আমাদের রেডিওটা এ· সি·-তে চলত বলে একটা কনভার্টার ছিল। পুলিশের সন্দেহ হল ওটা বোধহয় ট্রান্সমিটার বা ঐ ধরনের কিছু হবে। আমরা যতই বোঝাবার চেষ্টা করি ততই তাদের সন্দেহ

বাড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা এক সাহেব রেডিও-এঞ্জিনিয়ারকে ধরে নিয়ে এল। তাঁর কথায় তারা আশ্বস্ত হল। কিছু বই কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে ক্ষান্ত হল। রওনা হবার আগে বাড়িতে ভাত খেলাম, একদিকে বসে পুলিশ, অন্যদিকে মা ও ভাইবোনেরা।

আমাকে আবার লর্ড সিন্‌হা রোডে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। কড়া পাহারায় সেই ছোট ঘরটিতে বসিয়ে রাখল। বিকেলের দিকে একবার বাইরে নিয়ে গিয়ে সব দিক থেকে আমার ছবি তুলল। সন্ধ্যার পরে একজন অফিসার এসে একটা নতুন অর্ডার জারি করে গেলেন। এই অর্ডারে ভারত-সরকার আমাকে পাঞ্জাব সরকারের হেফাজতে দিলেন। বুঝলাম, আমাকে পাঞ্জাবে চালান দেবে। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল, কেউ আমাকে নিতে এল না। কিছু অখাদ্য খাবার খেতে দিল। পরে একজন এসে বলে গেল, ঘরে যে টেবিলটা আছে, সেটার উপর আমি শুতে পারি। প্রভুদের কী যে মতলব বুঝলাম না!

রাত চারটে নাগাদ কড়া নেড়ে আমার ঘুম ভাঙাল। আমাকে বলা হল, রওনা হতে হবে। তৈরি হবার কিছু ছিল না, এক বস্ত্রেই তো আছি, সঙ্গে কোনো বাক্স-প্যাঁটরাও নেই। দেখলাম সামনেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একজন ইউনিফর্ম-পরা অফিসার, দুজন বন্দুকধারী পুলিশ ও কোট-প্যাণ্ট-পরা এক বাঙালী অফিসার আমাকে নিতে এসেছিলেন। ভাবতে লাগলাম, এই ভোররাতে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে! মনে হল, হাওড়া স্টেশন থেকে সম্ভবত আমাকে ট্রেনে তুলতে চায় না, বর্ধমান বা আসানসোল কোথাও আমাকে নিয়ে রাখবে। পরের দিন সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের ট্রেনে তুলে দেবে।

চৌরঙ্গি দিয়ে বেরিয়ে কিন্তু হাওড়ার দিকে না গিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ দিয়ে গাড়ি এগোল। আমি তো মনে করলাম তাহলে একটু ঘুরিয়ে বোধহয় মোটরেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অন্ধকার রাতে মেডিকেল কলেজের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। পাঁচমাথার মোড় পেরিয়ে গাড়ি দমদমের রাস্তা ধরল। শেষ পর্যন্ত দমদম এয়ারপোর্টের সাইন-বোর্ড দেখে বুঝলাম, প্রভুদের মতলবটা কী।

ভাবলাম এরোপ্লেন করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কেন, এত তাড়াহুড়ো কিসের জন্য? হয়তো তাড়াতাড়ি আমাদের একটা গোপন বিচার করতে চায় এবং সাজা দিতে চায়। সাজাটা যে চরম হতে পারে তাও মনে হল। সুধীর বক্সীর গ্রেফতারের খবর ক'দিন আগেই খবরের কাগজে পড়েছিলাম। পুরো দলটা ধরা পড়ে যায়নি তো!

আমাকে গাড়িতে বসিয়ে অফিসাররা কী সব ব্যবস্থা করতে এরোড্রোমের অফিসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে একটা সামরিক ডাকোটা বিমানে তোলা হল। সঙ্গে রইলেন বাঙালী অফিসারটি। অন্যান্য সব যাত্রীই ছিলেন ইংরেজ সামরিক অফিসার। তাঁদের জন্য ছিল চেয়ারের ব্যবস্থা, আমাদের জন্য বাকেট সিট।

এরোপ্লেনে চড়া আমার জীবনে সেই প্রথম, সরকারের খরচাতেই হল। হঠাৎ-হঠাৎ যখন এয়ার পকেটের জন্য বিমানটি নীচে নেমে আসছিল, খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল মাটিতে সবসুদ্ধ পড়েই যাবো নাকি। পথে বিমানটি এলাহাবাদে নামল। নামবার সময় আকাশ থেকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দেখলাম। এলাহাবাদে নেমে আমি এদিক-ওদিক একটু দেখছি। আমার অফিসারটি আমার দিকে এগিয়ে এসে পকেট থেকে হাতকড়া বের করে বিনয়ের সুরেই বললেন, "হুকুম আছে, প্রয়োজন হলেই এটা ব্যবহার করতে।" আগেই তিনি নিজের

পরিচয় দিয়েছিলেন। নাম জ্যোতি রায়।

দিল্লির সামরিক বিমানবন্দরে নেমেই দেখতে পেলাম একটা প্রিজন ভ্যান। বন্দুকধারী পুলিশ পাহারায় আবার যাত্রা শুরু হল। লালকেল্লার দরজায় পৌঁছে বিশেষ রকমের একটা অনুভূতি হল। রাঙাকাকাবাবুর কথা মনে হল, যেন কোথা থেকে একটু গৌরবের ছোঁয়া পেলাম। ফোর্টের সামরিক এলাকায় পৌঁছে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেলাম। মাটির তলায় দালানে দেওয়াল ও গরাদ বসিয়ে সেল বানানো হয়েছে। তার একটায় আমাকে তালাবন্ধ করল। সম্রাট শাহজাহানের অতিথি হলাম।

॥ ৫৮ ॥

লালকেল্লার মাটির তলার সেলে ঢুকেই চোখে পড়ল দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা চারটি লাইন :

Stone Walls do not a prison make
Nor iron bars a cage,
The mind is its own place
And can make a heaven of hell.

পূর্ববর্তী কোনো বন্দীর ঐ লেখা পড়ে মনটা বেশ ভরে গেল। ঘরটি মাপে খুব ছোট ছিল না। তিন দিক দিয়েই বন্ধ, কেবল সামনের দিকে গরাদ দেওয়া দুটি জানালা ও একটি শক্ত লোহার গেট। খুবই অপরিচ্ছন্ন, দেওয়ালগুলি ঝুলে ভর্তি, মেঝেতে পুরু ধুলো। আসবাবের মধ্যে একটি লগবগে খাটিয়া। দালানের অন্যদিকে আর একটি সেল আছে তা আসবার সময় নজর করেছিলাম।

সেলের ভারপ্রাপ্ত লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। নাম মহম্মদ নাজির, দেখে পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না, পরনে লুঙ্গি আর হাফ শার্ট। সে আমাকে জানাল যে, সকালে একবার আর সন্ধ্যায় একবার সেল থেকে বের করে কলঘরে নিয়ে যাবে। খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবে সেলের মধ্যে। আশেপাশে আরও বন্দী আছে কি না আমাকে জানায়নি, প্রথমে বুঝতেও পারিনি। আমাকে পাহারা দেবার জন্য একজন বন্দুকধারী সিপাই দিনরাত আমার সেলের সামনে পায়চারি করত। দিনের বেলায় ডিউটিতে থাকত কুড়ি-বাইশ বছরের এক জাঠ যুবক, খুব হাসিখুশি। তার গ্রামের কথা, বাড়ির কথা আর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর কথা আমাকে ক্রমাগতই বলবার চেষ্টা করত। ভাষাটা সড়গড় না থাকায় সব কথা ঠিক ধরতে পারতাম না, তবে ওরই মধ্যে বেশ ভাল লাগত ওকে।

যেদিন পৌঁছলাম সারাদিন খাওয়া হয়নি। সন্ধ্যায় লালকেল্লার প্রথম ডিনার আমার সামনে রাখা মাত্র বেশ খানিকটা খেয়ে ফেললাম। সারা শরীরটা যেন জ্বলে গেল, ওরকম ঝাল আলু-মটর আমি জীবনে খাইনি। সারা রাত হেঁচকি তুললাম। পরের দিন থেকে সাবধান হয়ে গেলাম।

দিল্লিতে তখনই ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার গায়ে তো খদ্দরের জামাকাপড় আর হাল্কা একটা আলোয়ান। জেলের মোলায়েম কম্বল গায়ে দিয়ে তো সারা শরীরে লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ হয়ে গেল।

লালকেল্লায় দিন-দশেক ছিলাম। গোয়েন্দা দফতরের কেউ ঐ কদিন মোটেই দেখা দিলেন না। কলকাতাতেই তো আমার উপর হুকুম জারি হয়েছিল যে আমাকে পাঞ্জাব সরকারের হেপাজতে রাখা হবে। সুতরাং বুঝতে পারলাম, যে-কোনো কারণেই হোক লালকেল্লায় আমাকে সাময়িকভাবে রাখা হয়েছে। জীবন অদ্ভুতভাবে গতানুগতিক। দিনে দুবার সেলের বাইরে নিয়ে যায়, তাছাড়া মাটির তলায় ঐ বন্দিশালায় কেবল "বসে বসে শোনা আপন মর্মবাণী"। বাড়ির কথা মনে হয়, মা'র কথা মনে হয়, রাঙাকাকাবাবুর কথা মনে হয়, সহকর্মীদের কার কী হল ভাবি, কিন্তু করবারও তো কিছু নেই।

বন্দী হিসাবেও তো আমার কতকগুলি অধিকার আছে, যেমন বাড়িতে চিঠি লেখার অধিকার, জীবনযাত্রার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় ও জিনিসপত্র পাবার অধিকার ইত্যাদি। মহম্মদ নাজির এসব বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। উপরওয়ালারা জানেন, তাঁরা তাকে কিছু জানাননি।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল জানলার একধারে কাঠের উপর পেন্সিলে খুব ছোট-ছোট করে এক বন্দী নিজের কথা লিখে গেছে। হংকং-এ ব্রিটিশ ফৌজে কোনো এক ব্যাটেলিয়ানে সে ছিল, নিজের ক্রমিক নম্বরটি সে লিখেছিল। বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে কোর্ট-মার্শাল করার জন্য ঐ সেলে রাখা হয়েছিল। ভাবলাম লোকটির শেষ পর্যন্ত কী হল কে জানে!

অন্য দিকের সেলের বন্দীকে আমার সেলের সামনে দিয়ে স্নানের ঘরে নিয়ে যেতে হত। সেই সময় চোখাচোখি হত। কথা বলবার খুব একটা চেষ্টা আমি করতাম না, যদিও ভদ্রলোকটির যে কথা বলার খুব ইচ্ছা তা বুঝতে পারতাম। কী জানি কেন একদিন বিকালে মহম্মদ নাজির আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সেল থেকে বের করল এবং কিছুক্ষণ সেলের বাইরে একসঙ্গে বসতে দিল। বলল, "একলা আর কত থাকবে, একটু কথা-টথা বলে নাও না, কেউ জানতে পারবে না।" প্রথমেই পরস্পরের নাম বিনিময় হল। আমার নামটা শুনে ভদ্রলোক যেন বেশ বিস্মিতই হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে লালকেল্লায় নিয়ে এসেছে কেন, আমি কি কোনো গোপন বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে জড়িত। আমি উত্তরে বলেছিলাম, "ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আমার একটু-আধটু সম্পর্ক আছে।"

নিজের সম্বন্ধে তিনি জানালেন যে, তিনি পূর্ব-এশিয়া থেকে একটি দলের সঙ্গে সাবমেরিনে করে দেশে এসেছিলেন, আসবার আগে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল এবং কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরা পড়ে যান। লালকেল্লায় আমাদেরই সেলের উপরে একটি ঘরে তাঁকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর কথা শুনে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম বলাই বাহুল্য।

টি· কে· রাওয়ের দলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবার কিছুদিন পরে একদিন উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমার খুড়তুতো দাদা কার্তিক আমাকে বলেন যে, রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো একটি দলের লোকেরা এলগিন রোডের বাড়িতে এসেছিল। তাদের সাহায্য করা হচ্ছে এবং কলকাতারই আশেপাশে তারা গোপন কাজকর্ম চালাচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, এলগিন রোডের বাড়ির বেশ কয়েকজন, এমন কী ছোটরাও, ব্যাপারটা জানে। আমি কথাটা চুপচাপ শুনে গিয়েছিলাম, কোনো মন্তব্য করিনি। সুধীর বক্সী মহাশয়কে আমি ব্যাপারটা জানাই এবং খোঁজ করতে বলি আরও একটি দল কলকাতায় কাজ করছে কি না। সুধীরবাবু খবর

নিয়ে আমাকে বলেন যে, অন্য দলটির যোগাযোগ ও কাজকর্ম সম্বন্ধে জানা গেছে। তবে ঠিক হয়েছে যে, আমাদের দলটিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হবে এবং আমাদের কাজকর্মের গোপনীয়তা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না। এক বছর বাদে মুক্তির পর আমি জানতে পারি যে, যে-ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার লালকেল্লায় ঘটনাচক্রে দেখা হয়েছিল তিনি নাকি গোপন বিচারে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন।

একদিন বিকালে সেলের মধ্যে পায়চারি করছি। দেখি, সিপাই- সান্ত্রী নিয়ে দুজন পুলিশ অফিসার আমার সেলের সামনে হাজির হলেন। অফিসারদের মধ্যে একজন বিরাটকায় শিখ আর একজন কোট-প্যান্ট পরা ছোটখাটো মানুষ। বললেন, তাঁরা আমাকে নিতে এসেছেন। এই প্রথম আমাকে হাতকড়া পড়ানো হল। খুব ভারী লোহার গয়না, দু'হাতে পরিয়ে একসঙ্গে করে চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোটা ভারী চেনটা একটা সিপাই বা অফিসার শক্ত করে ধরে থাকে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে মাটির উপরে এলাম। একটি বন্ধ ভ্যানে চাপিয়ে আমাকে এনে ফেলল দিল্লি জংশন স্টেশনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দিল্লি স্টেশনে লোক গিজগিজ করছে। যেমন সব সময়েই হয়। আমাকে যখন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, যদি কোনোমতে একটা চেনামুখ পাই। অন্তত বাড়িতে যদি খবরটা কেউ পৌঁছে দেয়। কিন্তু চেনা মুখ তো নেই-ই, আমাকে যে এভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কারুরই মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলে মনে হল না। ভেবে দুঃখ হল যে, ওদিকে রাঙাকাকাবাবু সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে দেশের স্বাধীনতার জন্য পাহাড়ে-জঙ্গলে লড়াই করছেন, স্বাধীন সরকার গঠন করেছেন, আর তাঁর দেশের লোক ছোটখাটো ও তুচ্ছ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে বড়ই একলা মনে হল। যাই হোক, আমাকে পাঞ্জাব মেলের একটি কূপে কামরায় তুলল। দরজার চাবি পড়ে গেল। আমি ভাবলাম হয়তো হাতকড়াটা এবার খুলে দেবে। অফিসারটি আমার অসুবিধাটা যেন উপলব্ধি করলেন, কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে, হাতকড়াটা কোনোমতেই খোলা হবে না, হুকুম আছে। বললেন, "আমরা কী করব বলুন, বিপ্লবী বন্দীরা সুবিধা পেলেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে যান।" বাথরুমে যাব তাও হাতকড়া খুলবে না, দরজার সামনে একজন সিপাই চেনটা ধরে বসে রইল।

ঘুমটা ভাগ্যিস আমার ভাল হয়। ঐ অবস্থায়ও খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুমোলেই খানিকটা সোয়াস্তি, ঘুম ভাঙলেই দুঃস্বপ্ন, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। সকাল-সকালই ট্রেনটা লাহোরে পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে দেখলাম এক শিখ পুলিশ অফিসার আমার কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, "সো দিস ইজ দি ম্যান !" এবার কিন্তু প্রিজন ভ্যানে নয়, একটা টাঙ্গায় আমাকে তোলা হল। আমাকে চালকের পাশে সামনে বসিয়ে হাতকড়াটা ভাল করে মুঠোর মধ্যে নিয়ে সর্দারজি পেছনে বসলেন। কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে ! লাহোরের পথের ধুলো উড়িয়ে টাঙ্গার চালক আমাদের লাহোর ফোর্টের ভিতরে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড় করাল। সর্দারজি কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গেলেন। পরে বুঝলাম রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে টাঙ্গা থেকে আমাকে নামিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন। একটা বারান্দা পেরিয়ে, একপাশে কতকগুলি ঘর পিছনে ফেলে একটা খোলা ছাদের উপর দিয়ে গিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। গুণ্ডার মত চেহারার এক

পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে আমার ভার নিয়েছেন। বড়সড় একটা চাবি নিয়ে বারো নম্বর সেলের লোহার গেটটা খুললেন। আমাকে ভিতরে নিয়ে হাত-কড়াটা খুলে দিলেন। গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম, যাক, শাজাহানের প্রাসাদ থেকে মুক্তি পেয়ে এবার শাহ্ আকবরের অতিথি হলাম।

॥ ৫৯ ॥

লাহোর ফোর্টের বারো নম্বর সেল আমার জন্য ধার্য ছিল। রেড ফোর্টের মাটির তলার ঘরটির চেয়ে অনেক ছোট, বড়জোর দশ ফিট×বারো ফিট হবে। মেজেটা ইট বের করা, কেবলই হোঁচট খাবার ভয়; দুদিকের দেওয়ালের একই অবস্থা, তবে চুন মারা আছে। উত্তর-পূর্ব দিকটা সম্পূর্ণ খোলা, অবশ্যই মোটা গরাদ দেওয়া। গেটটাও বেশ বড় এবং এমনভাবে বাইরে থেকে বন্ধ করা যে কারুর সাধ্যি নেই যে সেটাকে একটু নাড়াতে পারে। ঐ দুই দিক দিয়ে বাইরে থেকে বন্দীর উপর বেশ ভাল নজর রাখা যায়। আসবাবের মধ্যে একটা ছোট মাপের চারপাই বা খাটিয়া, যাতে পা ছড়িয়ে শোয়া সম্ভব নয়। আর আছে—একটা জলের কলসি আর একটি আধা-ভাঙা পিতলের গেলাস। ঘরের এক কোণে অতি প্রাচীন কায়দায় পায়খানার ব্যবস্থা। বুঝলাম বাবার মনে যে আশঙ্কা ১৯৪২ সাল থেকে জেগেছিল তাই শেষপর্যন্ত হয়েছে। কুখ্যাত এই বন্দীশালায় আমাকে এনে ফেলেছে।

ভাবতে লাগলাম আমাকে নিয়ে এরা কী করবে। যে নাটকীয়ভাবে এরা আমাকে লাহোর দুর্গে এনে ফেলল, নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে, এবং খুবই গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম। এরা সম্ভবত আমাদের দলের অনেককেই ধরে ফেলেছে। আমার মনে হয়েছিল এরা খুব সম্ভব লুকিয়ে আমাদের বিচার করবে এবং কঠোর সাজা দেবে। কম করে হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবেই, কারুর-কারুর ফাঁসিও হতে পারে। বিচারের সময় আসামীর কাঠগড়ায় কাকে-কাকে দেখব আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। যদি আসামী হয়েই জীবনের শেষ কথা বলতে হয়, তাহলে কী বলব তাও মনে মনে বিচার করতে লাগলাম।

বারো নম্বর সেলে তালা বন্ধ হবার কিছুক্ষণ পরেই আমাকে প্রথম সম্ভাষণ জানাল একটি কালো বিড়াল। একটি বড় ছাদ আমার সেল থেকে দেখা যেত, তার ধারে এসে স্থির হয়ে বসে বিড়ালটি আমার দিকে চেয়ে রইল। কালো বিড়াল তো আমরা মোটেই শুভ বলে মনে করি না, ইংরেজরা কিন্তু করে। নিজেকে বোঝালাম, ইংরেজেরই তো এখন রাজত্ব, সুতরাং তাদের সংস্কারমতো কালো বিড়ালটিকে শুভ বলে ধরে নেওয়া যাক। একটু পরেই একটি সুশ্রী হরিণ এসে গরাদের বড় জানলা দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। একটু হাসিই পেল, কেমন যেন চিড়িয়াখানার উলট-পুরাণ। আমি রয়েছি খাঁচার মধ্যে, বাইরে থেকে জন্তু-জানোয়ার আমাকে দেখছে। হরিণটি লাহোর ফোর্টে আমার সাড়ে তিন মাস নি[illegible] বন্দীদশার সময় প্রায়ই আমার সেলের সামনে ঘোরাঘুরি করত, আমার ভা[illegible]গত। বন্দুকধারী সান্ত্রী তো রয়েছেই। সে আমার সেলের সামনে পুরোপুরি [illegible]রি কায়দায় পায়চারি করে। রাইট অ্যাবাউট টার্নগুলির প্রত্যেকটি পদ আমি খুঁ[illegible] দেখতাম। যখন দেখলাম কেউই এদিকে মাড়াবে না বলে মনে হচ্ছে, সিপাইয়ের [illegible] আলাপ জমানোর

চেষ্টা করলাম। জবাব শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। কেবল বলল, "বাত্‌ করনা মনা হ্যায়।" সাড়ে তিন মাস সে আমার সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি। কেউ তো কোথাও নেই, কিন্তু সান্ত্রীমশাই নিজের চেহারা, ছবি, পোশাক, বন্দুক সম্বন্ধে খুব সজাগ। তার প্যান্টের দু'পকেটে দুটি রুমাল। একটি দিয়ে মুখ মোছে, আর একটি দিয়ে জুতোজোড়া পালিশ করে। ভাবতাম, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই উলটো-পালটা হয়ে যায়!

রাতগুলো ছিল বড়ই বিভীষিকাময়। আমার সেলের ছাদ থেকে একটা জোরালো আলো আমার উপর সব সময় ফোকাস করা আছে। বাইরেটা একেবারে অন্ধকার। সব সময়েই মনে হচ্ছে ওরা আমার প্রতিটি ওঠা-বসা, ঘোরা-ফেরা বাইরে থেকে দেখছে, আমি কিন্তু কাউকেই বা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ কাছে আসছে মনে হয় আর সান্ত্রীমশাই হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন 'হল্ট'! কিছু একটা বলে আগন্তুক সরে যায়, পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ঐ অবস্থায় কি ঘুমানো যায় নাকি!

আমি যখন লাহোর ফোর্টে দিন গুনতে আরম্ভ করেছি বাড়িতে তখন তোলপাড়। সরকার কিছুতেই জানতে দেবে না আমি কোথায় কী অবস্থায় আছি। বাবাই বোধহয় কেবল বুঝতে পেরেছিলেন আমাকে কোথায় নিয়ে গেছে, তাঁর দক্ষিণ ভারতের বন্দীশালা থেকে লেখা চিঠিপত্র থেকে এটা বোঝা যায়। মা'র তো করুণ অবস্থা। তাঁর একটা চিঠির জবাবে দিল্লি থেকে হোম ডিপার্টমেন্ট সোজা বলে দিল যে আমি কোথায় বন্দী তারা বলবে না, দেখা করতে দেবে না। তবে আমার জন্য জিনিসপত্র পাঠাতে চাইলে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে পারেন। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আমাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। আমি সাড়ে তিন মাস এক কাপড়ে ছিলাম, স্নানও করিনি, দাঁত মাজিনি, দাড়ি কামাইনি।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কেউ আমাকে দেখতেও আসে না। বাইরে থেকে ভিস্তি কলসিতে জল দিয়ে যায়, আর একজন বাইরে থেকে গরাদের নীচে দিয়ে খাবারের থালা ঠেলে দিয়ে যায়, যেমন চিড়িয়াখানায় জানোয়ারদের দেয়। কিন্তু সকলের মুখে কুলুপ আঁটা! সকালের খাবার ইটের মতো শক্ত একটা রুটি আর চা। ভাঙা গেলাসে বাইরে থেকে চা ঢেলে দেয়, সামান্য মিষ্টি দেওয়া উষ্ণ জল বই আর কিছু নয়। খাবারের কথা না বলাই ভাল। ঠাণ্ডায় জমা খাদ্য, কোনোরকমে উদরস্থ করা আর কী!

দিনকতক কাটবার পরে মনে হল দিনক্ষণ ঠিক রাখতে পারছি না। দেওয়ালের এক কোণে নখ দিয়ে দাগ কাটা আরম্ভ করলাম, রোজ একটা করে দাগ, মানে তারিখের হিসেব।

হঠাৎ একদিন সকালে বেশ ফিটফাট সাহেবি পোশাক-পরা এক অফিসার আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার সেলের সামনে এসে হাজির। যেন কিছুই জানেন না এমন ভান করে কেতাদুরস্ত ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে এসেছেন কেন, হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার?

আমি বললাম, আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি, আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি বললেন, ঐ একই কথা হল। আরও বললেন, আপনাকেও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, আপনি আবার গোপনে বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম করছিলেন নাকি! এটা তো ভদ্রলোকের জায়গা নয়, এখানে কেবল খুব মারাত্মক চরিত্রের লোকেদের নিয়ে আসা হয়। যাঁরা অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন, তাঁদের সাধারণ জেলে বা ডিটেনশন্‌ ক্যাম্পে

C/o the Additional Secretary
to the Government of India
(Home Department)
23rd November, 1944.

My dear mother,

You have to excuse my writing to you in English as that is the best thing to do under the present circumstances.

I just want to tell you that I am keeping well and that there is no cause for anxiety. There has not been any digestive trouble and so please do not worry.

I hope to hear from you soon.

লাহোর ফোর্ট থেকে লেখা আমার পোষ্ট কার্ড

পাঠানো হয়, দল বেঁধে তাঁরা বেশ থাকেন। লাহোর ফোর্ট এক ভয়ঙ্কর জায়গা, এখানে একবার যে এল, সারা জগৎ তাকে ভুলে যায়, আর একবার এখানে এলে এখান থেকে বেরোবার ঠিক-ঠিকানা নেই। এক যুগ কেটে যেতে পারে।

এই সব কথা বলে আবার ভাল করে আমি কী করি, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে বললেন, তোমার ইংরেজিটা তো অন্যরকম, কোথা থেকে শিখেছ ? বাংলা থেকে যে-সব লোক এখানে আসেন, তাঁদের মধ্যে এম· এ·, এম· এস-সি পাশ করা লোকও আছে, কিন্তু তাঁদের ইংরেজি উচ্চারণ তো অন্যরকম।

আমি বললাম, আপনি কিছুই জানেন না, অনেক-অনেক বাঙালী আছেন যাঁরা আপনার চেয়ে ও আমার চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজি বলেন। আমি যেটুকু বলি সেটুকু আমি আমার বাবার কাছে শিখেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'গুড লাক্' ছাড়া তাঁর আর কিছু বলার নেই। পরে জানলাম অফিসারটির নাম নাজির আহমেদ্ রজ্‌ভি, লাহোর ফোর্টের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ।

মাস-দুয়েক আমার খবর না পেয়ে মা'র মনে হয়েছিল যে, আমি সম্ভবত বেঁচে নেই। খবরটা সরকার চেপে যাচ্ছে। আক্ষেপের সুরে ভাই-বোনেদের কাছে বলতেন, সত্যি কথাটা বলে দিলেই তো পারে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাকে বলা হল যে, আমি বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড লিখতে পারি, তবে ইংরেজিতে লিখতে হবে। পোস্টকার্ড একটি লোক নিয়ে এল, সঙ্গে কালি ও কলম, তার সামনে লিখতে হবে। আমি তো লাহোর ফোর্টের ঠিকানা দিয়ে মাকে দু-চার লাইন লিখলাম। দুদিন পরে আমাকে বলা হল, লাহোর ফোর্টের ঠিকানা দেওয়া চলবে না। ভারত সরকারের অ্যাডিশনাল হোম সেক্রেটারির কেয়ারে আমি আছি, ঐটুকুই লেখা যাবে। তাই লিখলাম। চিঠিটা মা'র হাতে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁর চিন্তা দূর করতে পারেনি।

লাহোর ফোর্টে প্রথম মাস-দেড়েক যে আমার কী করে কাটল, এখনও আমি ভেবে পাই না। রাত্রের ঘুম বারে-বারে ভেঙে যায়। প্রথমত চোখের উপর জোরালো আলো, তারপর মাঝে-মাঝেই প্রহরীর 'হল্ট' চিৎকার। তার উপর আছে শীত। ঘুমের মধ্যে ক্রমাগতই আমার স্কুলজীবনের স্বপ্ন দেখি। দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সুবারবান স্কুলে আমার ছেড়ে আসা দিনগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে স্বপ্ন। কেন ঐ ধরনের স্বপ্ন দেখতাম মনস্তত্ত্ববিদরাই বলতে পারবেন। ভোর হলে আশেপাশে লোকজনের আনাগোনার আভাস পাই, কিন্তু বিশেষ কারুকে দেখতে পাই না। কিছুক্ষণ পরে চা আর রুটি দিয়ে যায়। তখন মনে হয়, দিনটা বুঝি শুরু হল।

যতই শীত বাড়তে থাকে চায়ের জন্য আমার উৎকণ্ঠাও তত বাড়তে থাকে। চা খাবার জন্য ততটা নয়, যতটা আমার ভাঙা পিতলের গেলাসটিতে চা ঢেলে হাত গরম করার জন্য। তার পরেই ঐ ছোট সেলের মধ্যে পায়চারি শুরু। দেওয়ালের ওপাশ থেকে মিলিটারি ব্যাণ্ডের ড্রামারদের প্র্যাকটিসের আওয়াজ কানে আসে, সেটা মন্দ লাগে না। গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশে ছোটছোট হলুদ রঙের এরোপ্লেনের ক্রীড়া-কৌশল দেখতে পাই। পরে শুনেছিলাম সেগুলি নাকি চীনা এরোপ্লেন, আমাদের দেশে শিক্ষানবিসি করতে এসেছিল। দুপুরটা কাটতেই চায় না, মনে মনে গান গাই। ওরই মাঝে মাঝে দূর থেকে অথবা মনে হয় মাটির নীচের সেল থেকে অত্যাচারিত বন্দীদের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম। একদিন যেন শুনলাম, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম'। শুনে মনে হল, আমাদেরই দলেরই হয়তো বা কেউ। শীতকাল, সন্ধ্যা শীঘ্রই নামত। বিকাল থেকে সারা সন্ধ্যাটা আমি আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। সূর্যাস্তের আগে ও পরে মেঘের রঙের যে কী বিচিত্র পরিবর্তন হয়, এর আগে আমি কখনও দেখিনি। সন্ধ্যা হলেই আবার সেই বিচিত্র অনুভতি। চারিদিকে যেন অন্ধকারের সমুদ্র, আমি রয়েছি একটি আলোকিত ছোট্ট নৌকায়।

মাসখানেক বাদে হঠাৎ একদিন আবার রজ্‌ভিসাহেবের আবির্ভাব হল। এবার আর তিনি ভান করলেন না যে, আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বলে ফেললেন : তোমার বাবা তো দক্ষিণ ভারতে বন্দী। তুমি পাঞ্জাবে। তোমার মা বাড়িতে অসুস্থ। তোমরা তো বেশ বিপদেই পড়েছ!

তার পর থেকে সুযোগ পেলেই তাঁরা মা'র অসুস্থতার কথা আমাকে শোনাতেন, কিন্তু চিঠিপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, কিছু আসেনি। এবার এসে রজ্‌ভিসাহেব যেন একটু অভিমানের সুরেই বললেন, আচ্ছা তোমাকে তো আমরা বেশ কষ্টের মধ্যেই রেখেছি, তুমি কমপ্লেন করো না কেন? তুমি তো অদ্ভুত লোক। সকলেই তো কম্‌প্লেন করে, ঝগড়া-ঝাটি বাধিয়ে দেয়। বুঝলাম, বন্দীর মন শান্ত ও স্থির থাকাটা ওদের পক্ষে সুবিধার নয়। শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য আমরা হারিয়ে ফেলি, ওরা তাই চায়। তারপর পুলিশসাহেব বললেন, এইভাবে থাকাটাও তো বিপজ্জনক, তোমার কাকার তো বর্মার জেলে যক্ষ্মা হয়ে গিয়েছিল। সেই যে যক্ষ্মার কথা বলে গেল তারপর অনেকদিন পর্যন্ত নিজেই নিজের বুক ঠুকে-ঠুকে দেখতাম আওয়াজের কোনো তারতম্য হচ্ছে কি না।

No.IV/4/43-M.S.
GOVERNMENT OF INDIA.
HOME DEPARTMENT.

New Delhi, the 7th November, 1944.

Notice under section 7 of the Restriction and Detention Ordinance, 1944 (III of 1944).

In pursuance of Section 7 of Ordinance No.III of 1944, you Sisir Bose are informed that the grounds for your detention are that you were acting in a manner prejudicial to the defence of British India inasmuch as in collaboration with members of the Bengal Volunteer Group and others, you were actively engaged in a manner calculated to assist Subhas Chandra Bose and the Japanese.

2. You are informed that you have a right to make a representation in writing against the order under which you are detained. If you wish to make such a representation you should address it to the undersigned and forward it through the officer-in-charge in whose custody you have been placed as soon as possible.

Sd/ R.Tottenham.

Additional Secretary to the Government of India.

আমার চার্জসীট

নানারকম চরিত্রের লোক ক্রমে ক্রমে লাহোর ফোর্টে দেখলাম। রজ্‌ভিসাহেবই হলেন কর্তাব্যক্তি, অতি বুদ্ধিমান এবং বড় সাহেবদের খুব বিশ্বাসভাজন। শুনেছিলাম, রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের কোনো হদিস করতে না পারায় বাংলাদেশের গোয়েন্দা দফতরের উপর দিল্লির বড়কর্তারা খুব প্রসন্ন ছিলেন না, বিশ্বাস রাখতেও পারছিলেন না। যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবের গোয়েন্দা দফতরই ইংরাজ সরকারের সুনজরে পড়ে যায় এবং তাদের উপরই দিল্লি অনেকটা নির্ভর করত। রজ্‌ভিসাহেবের বাবাও ইংরেজদের অতি বিশ্বাসভাজন অফিসার ছিলেন। একদিন জিজ্ঞাসাবাদের সময় রজ্‌ভি বড়াই করে আমাকে বলেছিলেন, মনে রেখো, ছেলেবেলা থেকেই আমার লাহোর ফোর্টে আনাগোনা, আমি অ আ ক খ শিখেছি ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের কাছ থেকে। এখানেই ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেব এবং

আরও কত বিপ্লবীকে আনা হয়েছিল। এখানে জনাকয়েকের ফাঁসিও হয়েছে।

কথাবার্তার মধ্যে একদিন রজ্‌ভিসাহেব বলে ফেললেন, তুমি সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আরম্ভ করছ না কেন, এই এত গজ যেতে পারলেই দেওয়ালের ওপারে পৌঁছে যাবে। তবে বলে রাখি, প্রহরীদের হুকুম দেওয়া আছে, কোনো বন্দী পালাবার চেষ্টা করছে দেখলেই গুলি করবে।

রজভির পাশে পাশে ঘোরাঘুরি করতেন দু'জন, একজন মিরজাসাহেব অন্যজন সর্দার দশোয়ন্ত সিং। মিরজাসাহেব আমিরি চালে ঘোরাফেরা করতেন, তবে বিশেষ কাজের ছিলেন বলে মনে হত না। আর সর্দারজি তো আমাকে লাহোর স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চাইতেন যে, তিনি অনেক কিছু বোঝেন। তিনি আমাকে বলতেন, দ্যাখো, তুমি আমাদের কায়দা করবার চেষ্টা করছ, আসল খবর চেপে যাচ্ছ, আমরা কি বুঝি না নাকি? খানসাহেব বলে একটি লোক ছিল, একেবারে পাষণ্ড, বন্দীদের উপর শারীরিক অত্যাচার করাই ছিল তার কাজ, তাতেই যেন তার খুব আনন্দ।

পেটরোগা বলে আমার সুনাম তো ছিলই, শেষপর্যন্ত অসুখেই পড়লাম। এরা সেলের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে এল। আমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ওষুধও পাঠিয়ে দিলেন। ওষুধের শিশির ওপর দেখি অন্য নাম লেখা—'সন্‌সার চন্দ্'। আমি তো দেখে রেখে দিলাম। ভাবলাম জঞ্জালগুলি না খেয়ে বরং উপোসে থাকি, ভাল হয়ে যাব। একটি ভালমানুষ ওয়ার্ডার, যে ওষুধটা এনে দিয়েছিল, পরের দিন যখন খবর নিতে এল আমি ব্যাপারটা বললাম। সে বলল, ভুল কিছু হয়নি, এখানে আপনার নামই 'সন্‌সার চন্দ্'। আসল নামটা এখানকার খাতায় লেখা হয় না। দু'দিন পরে রাতের অন্ধকারে সে আবার আমাকে দেখতে এল। চাপা গলায় বলল, "ইওর অনার, হাউ আর ইউ?" আমি তো অবাক। বললাম, আমাকে 'ইওর অনার' বলছ যে? সে সরলভাবে গলা আরও নামিয়ে উত্তর দিল, আপনারাই তো অনারেবল লোক, দেশের জন্য এত কষ্ট করছেন, আর আমরা তো কেবল পেটের জন্য যা বলছে তাই করছি।

আর একটি মজার চরিত্রের কথা মনে আছে। সে নাকি লাহোর ফোর্টের কেটারিংয়ের তদারকি করত, নাম ফকরুদ্দিন। একদিন হঠাৎ এসে বলল: খাবার বড়ই খারাপ হচ্ছিল শুনে খবর নিতে এলাম, এখন ঠিক আছে তো? আমি হেসে বললাম: তোমাদের কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক বুঝি না। তারপর সে দার্শনিকের মতো বলল: আমিও তো বুঝি না যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তোমরা এইভাবে জেলখানায় হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ কেন! জীবনে তাহলে আর কী রইল।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হয়েছে। একদিন দেখি ফোর্টের কর্মচারীরা সকাল থেকেই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। যেন কিছু একটা ঘটবে। বিকালের দিকে আমার সেলের দরজা খোলা হল, খানসাহেব বিশাল একটা হাতকড়া নিয়ে ঢুকল। মজবুত করে হাতকড়া লাগিয়ে আমাকে ফোর্টের উপরের দিকে নিয়ে গেল। দালান পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে প্রথমে দাঁড় করাল। দরজাটা খুলতেই দেখলাম রজ্‌ভিসাহেব আমাকে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। হাতকড়াটার চেনটা রজ্‌ভিসাহেব নিলেন এবং ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভিতরে দেখলাম দুজন ইংরেজ ভদ্রলোক টেবিলের দুপাশে বসে আছেন, একজন আমার মুখোমুখি, অন্যজন আমার বাঁ পাশে। আমার জন্য একটা চেয়ার ছিল। হাতকড়ার চেনটা শক্ত করে ধরে রজভি আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে রজ্‌ভি

আমাকে বলেছিলেন, ওরকম করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না, কারণ, অতীতে কোনো কোনো বন্দী ইংরেজ অফিসারদের হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছেন।

আমার সঙ্গে কথা বললেন যিনি আমার মুখোমুখি বসে ছিলেন। অন্যজন সর্বক্ষণ কেবল আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। প্রথম প্রশ্ন হল, তুমিই তো শিশির বসু, না ? বললাম, শিশিরকুমার বসু। জবাব, ঐ হল, একই কথা। আচ্ছা, তোমার কাকা দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বেশ নিকট ছিল, নয় কি ? আমি বললাম, আমাদের দেশে, একান্নবর্তী ভারতীয় পরিবারে, কাকা-ভাইপোর সম্পর্কটা নিকটই হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন হল, আচ্ছা, তুমি জাপানিদের সাহায্য করছ না কেন, বলো তো ? বললাম, আমি জীবনে সম্ভবত কোনো জাপানিকে চোখেও দেখিনি, সাহায্য করার প্রশ্ন ওঠে না।

আবার প্রশ্ন হল, তোমার কাকা জাপানিদের সাহায্য করছেন বলেই কি তুমিও তাই করছ ? আমি বললাম, আমার কাকা জাপানিদের সাহায্য করছেন মনে করার কোনো কারণ নেই, আমি যতদূর জানি তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, "টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট্, হি ইজ এ গ্রেট হেল্পার অব দি জ্যাপানিস।" ভবী ভোলবার নয়। কেবল জাপানি আর জাপানি। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও যে জাপানিরা যুদ্ধে জিতে যাক, আমরা জানি, এদেশের অনেকেই তাই চায়। আমি বললাম, জাপানিদের কী হয় বা না হয়, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমরা চাই আমাদের দেশ স্বাধীন হোক। তারপর সাহেব বললেন, তুমি তো মহা বিপদ নিজের উপর টেনে এনেছ। তোমার বাবা তো জেলে। তোমার এক দাদা তো বিলেতে রয়েছেন, তিনিও কি দেশে ফিরে এসে জাপানিদের সাহায্যে লেগে যাবেন ? আমি বললাম, সে-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে আমার সম্বন্ধে তোমাদের কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। গলা চড়িয়ে সাহেব বললেন, দ্যাখো, ভারত সরকার ভুল করে কারুকে লাহোর ফোর্টে আনে না। তোমার সামনে ভীষণ বিপদ। মনে রেখো, এখন যুদ্ধ চলছে, শত্রুকে সাহায্য করার দণ্ড চরম।

পরে জেনেছিলাম, সাহেবটি ছিলেন ভারত সরকারের অ্যাডিশনাল হোম সেক্রেটারি রিচার্ড টটেনহ্যাম স্বয়ং।

খানসাহেব আমাকে আবার ধরেবেঁধে আমার সেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল। রজ্‌ভিসাহেব তখন টেবিলের মাথায় বসে। রিচার্ড টটেনহ্যামের সই-করা চার্জশিটের দুটি কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। মূলটা সই করিয়ে ফেরত নিয়ে, কপিটা আমাকে দিলেন। বললেন, এর উত্তরে আমার কিছু বলার থাকলে আমাকে কাগজ-কলম দেওয়া হবে।

সেই রাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ খুব বৃষ্টি হল। আমার সেলের ছাদের নানা দিক দিয়ে জল পড়তে লাগল। সকালে কনকনে হাত-পা জমানো শীত।

॥ ৬১ ॥

চার্জশিটের জবাব যে দিতে হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তবে অভিযোগগুলি খুঁটিয়ে পড়ে দুটি কথায় আমার খুবই উদ্বেগ হল। কথা দুটি হল 'অ্যাণ্ড আদার্স'। আমি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের যোগসাজশে সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপানিদের সাহায্য করেছি এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 'অ্যাণ্ড আদার্স' কথা দুটি থাকায় আমার সন্দেহ হল যে, খুব সম্ভব রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো লোকগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ও কাজকর্মের কথা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অন্তত খানিকটা জেনে ফেলেছে। আমার মনে হল যদি তাদেরও কাউকে সরকার ধরে ফেলে থাকে, তাহলে আমাদের সকলকে একসঙ্গে গোপনে বিচার করে সাজা দেবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

এদিকে বাড়ি থেকে নানাভাবে আমার খবর নেবার চেষ্টা হচ্ছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও আমাদের মামাবাবু—অজিতকুমার দে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইনমন্ত্রী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে ধরলেন তিনি যেন ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে আমার কেসটা দেখতে বলেন। লর্ড ওয়েভেল সরকারসাহেবকে লিখলেন যে, তিনি সাধারণত এই সব ব্যাপারে হোম ডিপার্টমেন্টের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু সরকারসাহেবের কথা রাখবার জন্য তিনি তা করবেন। দিনকতক পরে বড়লাট সরকারসাহেবকে জানালেন যে, তিনি আমার ফাইলটা দেখেছেন কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এতই গুরুতর যে, তাঁর কিছু করবার নেই। সেই সময়কার কেন্দ্রীয় আইনসভার এক সদস্যার মাধ্যমেও আমার সম্বন্ধে খবর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তিনি খবর দেন সরকার আমাকে এক ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

যাই হোক, আমি চার্জশিটের জবাব দেব বলায় ফোর্টের কর্তৃপক্ষ দোয়াত-কলম ও তিন-চার পৃষ্ঠা কাগজ দিয়ে গেল। চার্জশিটের উপরই খসড়া আরম্ভ করলাম। কী লিখি? চার্জশিট খণ্ডন করে বাবার দুটি ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত চিঠি—একটি তিরিশ দশকের ও অন্যটি চল্লিশ দশকের—আমার ভাল করে পড়া ছিল। বুঝতেই পারছি যে, ওরা যা বলছে তা মোটামুটি সত্যি, যদিও আমাদের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ এবং জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ নেহাতই আনুষঙ্গিক। আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিষ্ঠ মনোভাব দেখানো ও নিজেদের আদর্শ ও মতবাদকে জোরের সঙ্গে পেশ করা আমি বাবার লেখা থেকে শিখেছিলাম। যতটা পারলাম নানারকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সরকারের অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলাম। আমি লিখেছিলাম, জীবনে একটিও জাপানির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বলে যে একটি দল আছে তাই আমার জানা নেই ইত্যাদি। আমি বলেছিলাম, তথ্যপ্রমাণ থাকলে সরকার তো অনায়াসে বিচার করে আমাকে সাজা দিতে পারেন, বিনা বিচারে আটক রাখার যুক্তি কী?

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় আমাকে হাতকড়া লাগিয়ে রজ্‌ভিসাহেবের ঘরে নিয়ে গেল। রজ্‌ভিসাহেব বললেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আরও বললেন, যদিও দেখে তাঁর মনে হয় যে, 'ইউ আর এ পারসন্‌ হু শুড বি ট্রিটেড উইথ রেসপেক্ট', কিন্তু লাহোর ফোর্টের ইনটেরোগেশন মোটেই সুখকর নয় এবং তার থেকে নিস্তার নেই। কথায় কথায় বলে বসলেন যে, তাঁদের কাছে আমি খুবই পরিচিত লোক—সেই এক রাত্রে 'তাঁকে'

নিয়ে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হওয়া থেকে আরম্ভ করে মাস-দুয়েক আগে রাস্তায় গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁরা নানা সূত্র থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করেছেন।

হাতকড়া লাগিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রশ্ন আর প্রশ্ন। যেন আমার জীবনী লিখছে। আমি মোটামুটিভাবে নিজের দিকটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ ধরে যা চলল সেটাকে আমি বলতে পারি 'ব্যাটল অব উইট্‌স'। ওরা আমাকে কেবলই ফাঁদে ফেলতে চায় আর আমি চেষ্টা করি জাল কেটে বেরিয়ে আসতে। কৌশল ও স্নায়ুর লড়াইয়ে আমি কয়েকটা উপায় ঠিক করে নিয়েছিলাম। প্রথমত, গুরুতর কার্যকলাপের কথা উঠলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর কাজকর্মকে বড় করে দেখানো। দ্বিতীয়ত, ওরা অন্যদের আমার কাজকর্মের সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করলে নিজে সব কিছুর দায়িত্ব নেওয়া। তৃতীয়ত, লোকের নাম, তারিখ ভুলে যাওয়ার ভান করা ইত্যাদি। রজ্‌ভিসাহেব তো একদিন আমাকে আমার সব জ্যাঠাইমা কাকিমাদের নাম বলতে বললেন। আমি না পারায়, বাহাদুরি দেখাবার জন্য নিজেই গড়গড় করে নামগুলি বলে গেলেন। নানারকম কথা বলে গোয়েন্দারা ক্রমাগতই বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তারা সবকিছুই জেনে ফেলেছে, যদিও আসলে কিন্তু তা নাও হতে পারে। একদিন পুলিশসাহেব আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়ি কী ভাবে তৈরি এবং বাড়ির কোথায় কী আছে বলে গেলেন।

আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নে আমার ভূমিকা এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আমার ভূমিকা খুব ফলাও করে বলেছিলাম যাতে গোপন কাজকর্মের কথা যতটা সম্ভব চাপা পড়ে যায়। নাম ভুলে যাওয়া বা ভুল বলা নিয়ে মাঝে-মাঝে বেশ মজা হত। আমি শান্ত ও গম্ভীরভাবে একটা ভুল নাম বললাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম রজ্‌ভিসাহেবের হয় বিশ্বাস হচ্ছে না বা গুলিয়ে যাচ্ছে। বি· ভি·-র শান্তিময় গাঙ্গুলি সম্বন্ধে একদিন বললেন, "শান্তি গাঙ্গুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে তুমি কী জানো বলো তো?" আমি বললাম, "শান্তি গাঙ্গুলি? মহিলাটি কে?" তাচ্ছিল্যের সুরে রজ্‌ভি বলে উঠলেন, "দুত্তোরি, তুমি তো কিছুই জানো না দেখছি!" আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমার নানারকম গোপন কার্যকলাপের আওতা থেকে বাবা-মাকে বাইরে রাখা যায়। আমার বিশ্বাস, আমি ওদের এ-ব্যাপারে বিচার-বিবেচনায় গোলমাল করে দিতে পেরেছিলাম। রাঙাকাকাবাবুর সব কাজকর্মে আমি গভীরভাবে উৎসাহী একথা আমি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলাম।

সুধীর বক্‌সী মহাশয়কে লাহোর ফোর্টে এনেছে আমি অনুমান করেছিলাম। দলের অন্য কার-কার এই দুর্ভাগ্য হয়েছিল, তখন জানতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম। আমি যখন সেখানে ছিলাম, জয়প্রকাশ নারায়ণও লাহোর ফোর্টে বন্দী ছিলেন। অত্যাচারের ফলে একদিন কোনো এক বন্দীর মৃত্যু হল—এরকম আভাসও আমি পেয়েছিলাম।

প্রথম দিকে আমার নানারকম আশঙ্কা হলেও, জিজ্ঞাসাবাদের শেষের দিকে ওদের কথাবার্তা থেকে আমার ধারণা হল যে, পূর্ব-এশিয়া থেকে আগত আমাদের বন্ধুদের ওরা ধরতে পারেনি। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের একটা কেস খাড়া করা সরকারের পক্ষে খুবই শক্ত। অন্যদিকে বুঝলাম যে, ১৯৪১ সালে রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানে আমার ভূমিকার ভিত্তিতে কোনো কেস খাড়া করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। আরও

JANUARY **FRIDAY 12** **1945**

Samvat.—13 Magh (Badi), 2001. *Bengali.*—28 Pous, 1351.
Fuslee.—14 Magh, 1352. *Hijri.*—26 Muharram, 1364.

Got Amiya's letter of the 6th inst. He said in his letter there was still no news about Sisir.
My mind is full of gloomy apprehension that something serious has happened to Sisir. Prayed after midnight & then went to bed.

বাবার ডায়েরী—আমার সম্বন্ধে উদ্বেগ

বুঝলাম, যে সূত্র তাদের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে, রাজনৈতিক কারণে তাদের পর্দার আড়ালে রাখাই তাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তাহলেই রাঙাকাকাবাবুর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার ও দেশের বিশেষ যে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর যে গোপন আঁতাত হয়েছে, সেটা ধরা পড়বে না, ভবিষ্যতেও চালু থাকবে।

ইনটেরোগেশনটা খুব লম্বা হওয়াতে একদিক দিয়ে আমি কিছু লাভ উঠিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে এমন হয় যে, পুলিশ অফিসার বন্দীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, এবং অসতর্ক হয়ে মাঝে মাঝে এটা-ওটা বলে ফেলে। এইভাবে আমি রাঙাকাকাবাবুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে কারও-কারও সম্বন্ধে কিছু কিছু অপ্রিয় খবরাখবর আদায় করতে পেরেছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে, অনেকের সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবুর সন্দেহ অমূলক ছিল না।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে চলছিল আমার ইনটেরোগেশন। কিন্তু আমার তো গরম জামাকাপড় বলতে কিছু নেই। ঠাণ্ডায় পায়ের গাঁটে-গাঁটে রক্ত জমে গেল। চলাফেরা করতে ব্যথা লাগছিল। একদিন একটা ঘরে নিয়ে গেল যেখানে বেশ গনগন করে আগুন জ্বলছে। খাবার সময় হলে রজ্‌ভিসাহেব আমার থালিটা আনিয়ে বললেন, "আজ তোমার খাবারটা গরম করে দিই।" যেন দয়াপরবশ হয়েই খানিকটা আগুনের উপরে রেখে গরম করে দিলেন। কিন্তু আমি খেতে পারলাম না, দু'মাস বরফের মতো ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে অন্যরকম অভ্যাস হয়ে গেছে। দেখে পুলিশসাহেব বলে উঠলেন, দেখ, মানুষের কী না হয়! ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে একটা জিনিসই একটু যেন গরমের আঁচ এনে দিত—আমার ক্রমবর্ধমান দাড়ি। প্রায়ই কলসির জলে মুখের ছায়া দেখে দাড়ির বিস্তার আন্দাজ করতাম। আমাকে আগেই ওরা জানিয়ে দিয়েছিল যে, লাহোর ফোর্টে তারা বন্দীদের দাড়ি কামাতে

JANUARY MONDAY 22 1945

Samvat.—9 Magh (Sudi), 2001. Bengali.—9 Magh, 1351.
Fasle.—24 Magh, 1352. Hijri.—7 Safar, 1364.

"During my afternoon nap, dreamt that three persons came to see in a house where I was detained & one of them was Girin Mitra. I asked them to go upstairs.+

Yesterday and today my mind has been oscillating very much — sometimes I feel that Sisir is getting over the crisis, sometimes I feel just the opposite. My heart bleeds for my poor boy & his mother. Won't the Divine Mother who has kept me in fetters save my poor boy? Won't She teach me how to pray at Her lotus feet?

Received wife's letter of the 16th this evening at 7 P.M. She says that Ami is leaving the same evening (the 16th) for Delhi. Her letter shows that she expects no mercy from men but is trying to surrender herself at the Divine Mother's feet. Won't the Divine Mother listen to the prayers of a distressed mother?

1.30 PM - 98.8
9 PM - 98.5

+When I came upstairs, saw that Sisir was taking out an Asan for my visitors to sit.

বাবার ডায়েরী—আমার সম্বন্ধে উদ্বেগ

দেয় না যাতে আমরা আত্মহত্যার সুযোগ না নিই।

ইনটেরোগেশনের শেষের দিকে রজ্‌ভিসাহেবকে একদিন বলে ফেললাম, "তোমরা তো আমার কেরিয়ারটাই নষ্ট করে দিলে।" উত্তরে তিনি বললেন, "না, লাহোর ফোর্টে কেরিয়ার শেষ হয় না, শুরু হয়।" নাটকীয় সুরে আরও বললেন, "আমি এই ফোর্টে জীবন শুরু করেছিলাম, এইখানেই শেষ করব। তোমার এখানে শুরু—ইউ উইল বি এ বিগ্‌ ম্যান সাম ডে, আই স্টার্টেড হিয়ার অ্যাণ্ড উইল এণ্ড হিয়ার।"

শেষ পর্যন্ত আমাকে একদিন জানানো হল যে, আমাকে ফোর্ট থেকে বদলি করা হবে। বাড়ি থেকে পাঠানো আমার জিনিসপত্র ভর্তি একটা ট্রাঙ্ক এতদিন তাদের কাছেই ছিল। সেটা থেকে বের করে আমাকে কিছু কাপড়-চাপড় দেওয়া হল। গরম কোটটা পরতে গিয়ে দেখি ভিতরে লাইনিং সব কাটা। যদি লাইনিংয়ের ভিতরে কাগজপত্র লুকানো থাকে!

বিদায় দেবার আগে, নাজির আহ্‌মদ রজ্‌ভি খানিকটা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "যা ঘটল, তার জন্য কিছু মনে কোরো না, আমরা বর্তমানে পরস্পর-বিরোধী পক্ষের লোক, উপায় ছিল না। তবে আমরা যে সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে তারই হুকুম তামিল করি। তবে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট তো একদিন হবেই, তখন যদি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি তো বোলো।"

রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, তাঁর সামনে তো খুবই বিপদ। রাশিয়ানরা তো তাঁকে গ্রহণ করবে না। তিনি যাবেন কোথায়? গ্রেট থিংস অফ্‌ন বার্ন দেমসেলভ্‌স আপ্‌ ইন দেয়ার ওন ফায়ার!

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারির এক সকালে হাতকড়া লাগিয়ে কড়া পাহারায় ওরা আমাকে আরও পশ্চিমমুখো এক ট্রেনে তুলল।

॥ ৬২ ॥

লাহোর ফোর্ট থেকে আমাকে কোথায় বদলি করছে আমাকে ওরা বলেনি। সকালে রওনা হয়ে সন্ধ্যার মুখে ট্রেন পৌঁছল লায়ালপুরে। লায়ালপুর ছিল পাঞ্জাবের মুলতান ডিভিশনের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন যাকে বলে প্ল্যাণ্ড শহর। তবে মুলতান এলাকায় গ্রীষ্মে অসহ্য গরম হয়। ভাবলাম লাহোরে তো বেশ ঠাণ্ডা দাবাই দিয়েছে, এবারে বোধহয় খানিকটা গরম দাবাই দেবে। আর একবার টাঙ্গায় চাপিয়ে আমাকে স্টেশন থেকে লায়ালপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলের সামনে নামাল। নিয়মমতো জেলের বড় দরজার ছোট অংশটি খোলা হল। সুপারিনটেনডেন্টসাহেব যেন আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ঘরে হাজির হবার পরে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, হাতকড়াটা খুলে দিতে পারো। মনে হল, ভদ্রলোকটি নিজেকে যেন বেশ কেউকেটা ভাবেন। জানলাম তাঁর নাম সৈয়দ আমির শাহ্‌। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, আমরা যেন মিলেমিশে সুখে ঘর করি। জেলরসাহেবকে ডেকে আমাকে আমার নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে বললেন। খুব লম্বা, ধবধবে ফর্সা, বিরাট পাগড়ি মাথায় এক ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে জেলের ভিতরে এগিয়ে চললেন। রাস্তায় সারিবদ্ধ কয়েদিরা জেলারসাহেবকে সেলাম ঠুকতে লাগল। দেখলাম কয়েদিরা তাদের সন্ধ্যার আহারের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় তন্দুরে তৈরি বিরাটকায় রুটি তাদের মধ্যে

C/o The Superintendent,
District Jail
Lyallpur, Punjab.

10.2.45

My dear mother,

I am now in the District Jail, Lyallpur. I am keeping well. I hope the letters I wrote on the 20th and the 27th of last month have all reached their destination. It is too early to say whether this place will suit me or not; but it seems to me that the climate of this place is [illegible] and healthy. I hope you are not worrying too much about me and all of you are keeping well there. The last letter that I received from home was one from Gita dated the 17th Jan. I am expecting to hear from you again in the course of the next few days. Please send my news to father informing him that I am well and that there is no cause for anxiety. Please convey to him my pronams. I am informed that I can now receive books and newspapers. I am also writing to Gita today. I shall mention to her some of the books that I like to have now. Please give me all news of home and of how all are getting on. I am all right. Pronams, Your loving [illegible]

Signature of censoring officer	Date	Name of sender
Passed by Supdt. of Police C. I. D.	3. 2. 45	Sisir Kumar Bose

লায়ালপুর জেল থেকে লেখা আমার প্রথম চিঠি

বিতরণ করা হচ্ছে।

জেলটি কিন্তু ইঁট, সিমেন্ট দিয়ে পাকা গাঁথুনির নয়। কেবল মাঝের টাওয়ারটি পাকা। বাকি সবই কাঁচা মাটি জমিয়ে তৈরি। দেওয়ালগুলি অবশ্য যে-কোনো জেলের মতোই সোজা ও উঁচু। আমাকে যে ওয়ার্ডে নিয়ে গেল তার এলাকাটা বেশ বড়ই। তারই মাঝ-বরাবর পাশাপাশি চারটি সেল। সবগুলিই খালি। একটি অমায়িক বৃদ্ধ পাহারাওয়ালা ছিল। চারটির মধ্যে একটি সেল জেলারসাহেব আমার জন্য বরাদ্দ করে গেলেন।

লায়ালপুর জেলে সেই সময় বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। শুনলাম আমার আগমন-বার্তায় তাঁদের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এমনিতেই বাঙালী বন্দীদের বহুদিন ধরে পাঞ্জাবের জেলমহলে বেশ নাম-ডাক। তার উপর আবার বসুবাড়ির একজন।

একটু পরেই অন্য ওয়ার্ড থেকে আমার জন্য চা ও খাবার এসে পৌঁছল। সেদিনের জন্য তো আমার ইয়ার্ডে কোনো ব্যবস্থা নেই, বলা হল পরের দিন থেকে আমাকে একটি লোক দেওয়া হবে, রেঁধেবেড়ে নেওয়ায় সাহায্য করবে।

সন্ধ্যা বাড়তেই আমাকে সেলে ঢুকতে বলে তালা দিয়ে দিল। খবর পেয়ে অন্য রাজনৈতিক বন্দীরা খুব শোরগোল তুললেন। দাবি তুললেন যে, অন্য রাজবন্দীদের লক্-আপ করা হয় না,আমাকেও করা চলবে না। কিন্তু পরে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, এই বন্দীটি সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি নির্দেশ আছে, একে একেবারে আলাদা রাখতে হবে, নিয়মমাফিক লক্-আপ করতে হবে, কাগজ-কলম দেওয়া চলবে না, ইত্যাদি। আমাকে যে ইয়ার্ডে বন্দী করা হল সেটিতে সাম্প্রতিক কালেও কনডেমড প্রিজনার্সদের বা ফাঁসির কয়েদিদের রাখা হত। এটা নিয়েও অন্য রাজবন্দীরা আপত্তি তুললেন।

সেলটি ছিল ছোট, একটা চারপাই প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল। জানালা নেই, আলো-বাতাস কম। রাত্রের জন্য একটি টিমটিমে কেরোসিনের লণ্ঠন। যাই হোক, আমার মনে হল লাহোর ফোর্টের সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে হয়তো বা রেহাই পেলাম।

ফেব্রুয়ারি মাস, বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। তবে জামাকাপড় তো পেয়ে গেছি, ভারী গরম জামা চাপিয়ে যতটা সম্ভব ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। দেখলাম, মা ইউরোপে ব্যবহার করা রাঙাকাকাবাবুর গরম ড্রেসিং গাউনটি আমার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। পরে বেশ ভাল লাগল।

সকাল হতেই এক ওয়ার্ডার বছর আঠারো-কুড়ির একটি কয়েদিকে আমার সামনে হাজির করল। নাম ইব্রাহিম। সে আমার ইয়ার্ডে থাকবে, রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করবে। ভাবলাম, যাক, কথা বলার অন্তত একটা লোক হল। তাছাড়া রান্নাবান্না তো আমি জীবনে করিনি, ভাবলাম সেদিক দিয়েও একটা ব্যবস্থা হল।

ইব্রাহিম ছেলেটি অতি সরল ও অতি ভদ্র। কিন্তু কথা বলব কী, সে হিন্দি-টিন্দি বলে না, বলে কেবল গ্রাম্য পাঞ্জাবি ভাষা। যাই হোক, জিজ্ঞাসা করলাম, রান্নাবান্না কী করবে বলো। সে আমাকে বুঝিয়ে দিল, সে জীবনে কোনোদিন রান্না করেনি। করবেই বা কেন, বাড়িতে মা, বৌ নেই নাকি। সে অবশ্য মদ তৈরি করতে জানে, বেআইনি ভাবে মদ চোলাই করবার অপরাধেই তো সে জেলে এসেছে।

আমি নিজেকে বোঝালাম, কেমিস্ট্রি তো আমার কিছু জানা আছে। তারই জোরে আমি ইব্রাহিমকে নির্দেশ দিতে পারব। ভাত রাঁধতে কতটা জল দিতে হবে আলু-বাঁধাকপির চচ্চড়িতে কী কী মশলা ব্যবহার করা সঙ্গত। কোন্‌টা পরে বা কোন্‌টা আগে দিতে হবে ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে ইব্রাহিম ও আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

লাহোর ফোর্টে আমার বন্দীজীবনের শেষের দিকে ছাপানো রুলটানা ফর্মে আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখতে দিয়েছিল। আমাকে বলেও দিয়েছিল যে, বাংলায় লিখলে চিঠি পৌঁছতে অনেক দেরি হবার সম্ভাবনা। এখানেও সেই ব্যবস্থা বহাল রইল। একজন ওয়ার্ডার ফর্ম, কালি ও কলম নিয়ে আসবে। আমি যতক্ষণ লিখব আমাকে পাহারা দেবে। লেখা হয়ে গেলে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমাকে কিছু বই ও খবরের কাগজ দেওয়া হবে, অবশ্য যেগুলি উপরওয়ালা মঞ্জুর করবেন। জেলের একটা লাইব্রেরি ছিল, নিজের বই না পাওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে দু-চারখানা ইংরেজি সাহিত্যের বই জেল

কর্তৃপক্ষ আমাকে দিতে রাজি হলেন। মনে আছে, চার্লস ডিকেন্সের'পিক-উইক পেপার্স' জেলে বসে পড়তে বেশ ভালই লেগেছিল।

লাহোর ফোর্টে থাকাকালীন আমি গল্পের রিপ্ ভ্যান্ উইনকল্ হয়ে গিয়েছিলাম। দেশ-বিদেশের খবরাখবর তো কিছুই জানতে পারতাম না। মাঝে মাঝে ওরা কেবল বর্মায় ইংরেজ ফৌজের অগ্রগতির কথা আমাকে শোনাত। যেমন একদিন বলল, কাল তো আমরা আকিয়াব দখল করেছি। পরে একদিন বলল, তোমাদের অবস্থা খারাপ, আমাদের ফৌজ ইরাবতীর তীরে পৌঁছে গেছে—ইত্যাদি। মনে আছে জানুয়ারি মাসের শেষে একদিন আমি রজভি-সাহেবকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খুব খানিকটা হেসে বললেন, আরে, তুমি কোথায় আছ, ব্যাপারটা তো মাস-দুয়েক আগেই হয়ে গেছে। যাই হোক, লায়ালপুরে আসার পরে আমি দেশের ও যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম। কলকাতার দুটি খবরের কাগজ—আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড চাইলাম, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটা নামঞ্জুর করলেন। প্রথমে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা আমাকে দেওয়া হল। পরে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা মঞ্জুর হল। বইয়ের জন্য বাড়িতে লিখলাম—কিছু ডাক্তারি বই, কিছু বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের বই। তবে বাড়ি থেকে পাঠানো বইপত্র আমার হাতে পৌঁছতে অনেক সময় লাগত, আবার অনেক কিছুই আটকে দেওয়া হত।

এক রাজবন্দীর অন্য এক রাজবন্দীকে চিঠি লেখবার অনুমতি ছিল না। সেজন্য বাড়িতে লেখা আমার চিঠি কপি করে বাবাকে পাঠানো হত। বাবা সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। আমার সাধারণ কথার মধ্যেও নানারকম অর্থ খুঁজে পেতেন, যেগুলি অন্য কারও মনেও ধরত না।

ইব্রাহিমের সঙ্গে আমার দিনগুলি কোনোরকমে কেটে যেত লাগল। প্রতিদিন সকালে সুপারিন্‌টেনডেন্ট আমির শাহ প্রায় রাজকীয় কায়দায় ছাতি মাথায় দিয়ে মিছিল করে রাউণ্ডে আসতেন। আমি বেশি কথা বলতাম না। কুশল-বিনিময় ও আকাশ-বাতাস নিয়ে দু'চারটি কথা বলে সেরে দিতাম। হঠাৎ একদিন কিছু চেয়ে বসলাম। শুনেছিলাম জেলে একজন মাস্টার আছেন, তিনি কয়েদিদের নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করেন। আমি সকালে কিছুক্ষণের জন্য মাষ্টারকে চাইলাম উর্দু শেখার জন্য। আমির শাহ রাজি হয়ে গেলেন। 'আলিফ' 'বে' 'পে' থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ আমি উর্দুতে ছোটদের জন্য লেখা গল্পের বই পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে একদিন আমার সেলের সামনে পায়চারি করছি। হঠাৎ কানে এল, জেলের টাওয়ার থেকে প্রচার করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটি পূজার গান। জীবনে কোনোদিন বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথের গান এত ভাল লাগেনি, প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল:

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী ॥
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে,
থাক-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম কখনও কখনও লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশন থেকে গানের প্রোগ্রাম রিলে করে শোনানো হয়—তার মধ্যে কখনও-কখনও বাংলা গানও থাকে।

॥ ৬৩ ॥

১৯৪৫-এর প্রথম মাস-চারেক ছিল ইউরোপের যুদ্ধের শেষ পর্যায়। পশ্চিম থেকে আমেরিকান, ফরাসি ও ইংরেজদের যুক্ত আক্রমণ আর অন্য দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার অভিযান জার্মানিকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। দুই পক্ষের খবর না পেলেও বুঝতেই পারছিলাম যে, হিটলার যতই আস্ফালন করুন না কেন, জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয় অনিবার্য। লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকা আমাকে মাঝে-মাঝে পড়তে দেওয়া হত। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তাম। দেশ-বিদেশের যতটা খবর পাওয়া যায়। তখন কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে, জার্মানির হারের পরেও জাপানকে কাবু করতে ইংরেজ ও আমেরিকানদের অনেক সময় লাগবে। সেজন্য আরও বেশ কিছুদিন যে জেলে থাকতে হবে সেটা ধরেই নিয়েছিলাম।

ইব্রাহিমকে নিয়ে কোনোরকমে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে ইব্রাহিম ও অন্য কয়েদি বা ওয়ার্ডারদের কথাবার্তা বুঝতে শুরু করলাম। ভাঙা-ভাঙা পাঞ্জাবিও বলতে আরম্ভ করলাম। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের ও জনজীবনের অনেক খবর আমার গোচরে এল। পাঞ্জাবের জেলে আসার আগেই তো বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখে এসেছি। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার কথা শুনে মনে হল এদের অবস্থা তো বেশ সচ্ছল, একই দেশে একই রাজত্বে এমন হয় কী করে!

সাধারণ কয়েদিদের সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেল। বর্মার জেলে থাকতে রাঙাকাকাবাবু এদের কাছ থেকে দেখে, তাদের মানসিকতা বিচার করে, তাদের বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়ে,জেলের নিয়মকানুনের সংস্কার ও অভিযুক্ত কয়েদিদের প্রতি আমাদের আচরণবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন। নিজের জেলের অভিজ্ঞতা থেকে এখন আমি রাঙাকাকাবাবুর মতামতের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারলাম। আমি একলা থাকি, যে সব কয়েদি কোনো কাজ নিয়ে আমার ইয়ার্ডে আসে তাদের সকলেরই চেষ্টা কী উপায়ে অমাকে প্রফুল্ল রাখা যায়। একটি বৃদ্ধ কয়েদির ওপর আমার ইয়ার্ড পরিষ্কার রাখার ভার ছিল। সে কাজ সেরে যাবার আগে গান গেয়ে ও নেচে আমাকে এনটারটেন করে যেত। পাঞ্জাবিরা মুখে মুখে কবিতা বা 'শ্যার' তৈরি করতে খুব পটু। প্রায়ই আমার কয়েদি বন্ধুরা কোনো অজুহাতে আমার ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ে 'শ্যার' শুনিয়ে যেত। ক্রমে-ক্রমে এদের সম্বন্ধে ভীতি বা সন্দেহ একেবারেই কেটে গেল। বুঝতে শিখলাম এদের মধ্যে বেশির ভাগই সহজ-সরল মানুষ, বিশেষ কোনো অবস্থায় পড়ে বা সাময়িক ঝোঁকের মাথায় কোনো অপরাধ করে ফেলেছে এবং শাস্তি ভোগ করছে।

বাড়ি থেকে পাঠানো কিছু-কিছু বই কর্তারা পাশ করে দিচ্ছিলেন। কিছু ডাক্তারি বই, কিছু ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের বই। তিরিশের জব্বলপুর জেলে বাবার ব্যবহার-করা একটি গীতা আমার কাছে পৌঁছে গেল। দেখলাম, বইটির বিভিন্ন পাতায় পেনসিলে রাঙাকাকাবাবুর হাতে লেখা কিছু কথাবার্তা রয়েছে। ভাবলাম, রাঙাকাকাবাবু সম্ভবত বাবার কাছে বইটির মাধ্যমে কিছু খবর পাঠিয়েছিলেন। গোয়েন্দারা নজর করেনি। নানা ধরনের ও

বিষয়ের বই নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পেলেও আমি ভাবলাম ডাক্তারি পড়াটা তো শিকেয় তুলে রাখতে হবে। যদি বছর কয়েক বন্দী থাকতে হয় তাহলে ডাক্তার হবার বাসনা ত্যাগ করাই ভাল। বাড়িতে লিখলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর নিতে আমাকে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে বি· এ· পড়ার অনুমতি দেবে কিনা। অনেক রাজ-বন্দী তো জেলে থাকতেই বি· এ· এম· এ· পাশ করেছেন। আমার এই প্রস্তাব বাড়িতে কারও পছন্দ হল না। তাঁরা হয়তো ভাবলেন আমি অধৈর্য হয়ে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিতে চাইছি।

আমি এমনিতেই শীতকাতুরে। কলকাতার শীতেই মোটা সোয়েটার, গরম মোজা ও গেঞ্জি, স্নানের গরম জল ইত্যাদি না হলে অস্থির হয়ে যাই। লাহোর ফোর্টের ঠাণ্ডা দাবাইয়ের পর অভ্যাসটা যেন বদলে গেল। লায়ালপুরে প্রথম দু'মাস খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তারই মধ্যে ইব্রাহিমের শখ হল খোলা আকাশের নীচে কনকনে ঠাণ্ডা জলে আমাকে স্নান করাবে। প্রাণ যায় আর কি! কিন্তু দেখলাম যা কি না কিছুদিন আগে পর্যন্ত একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হত, তা বেশ সম্ভব। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা বাতাসের মধ্যে ঠাণ্ডা জলে স্নান নিয়মিত চলতে লাগল। নিউমোনিয়া তো হলই না, বরং স্বাস্থ্যের যেন কিছু উন্নতিই হল।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'সলিটারি কনফাইন্‌মেন্ট' বা একেবারে একলা বন্দী করে রাখা জেলখানার সাধারণ নিয়মেও গ্রাহ্য নয়। জেলের শৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে কোনো বন্দীকে সপ্তাহ-দুয়েক একলা রেখে দেওয়া যায় বলে আমরা জানতাম। ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে অনেক বেআইনি কাজ করতেন। তার মধ্যে মাসের পর মাস 'সলিটারি কন্‌ফাইনমেন্টে' রাখাটা ছিল একটা ঘোরতর অন্যায় ব্যবস্থা। তখন আমাদের হয়ে দেশে বা বিদেশে বলবার তো কেউ ছিল না। তা হলেও বিদেশী সরকার যতটা সম্ভব এই ধরনের অন্যায় কাজকর্ম চেপে রাখবার চেষ্টা করত। আমাদের বাড়ি থেকে এই ব্যাপারে একটু নাড়াচাড়া হওয়াতে ভারত সরকার বোধহয় একটু সতর্ক হয়ে গেলেন। তবে আমাদের মতো বিপজ্জনক বন্দীদের জন্য সঙ্গী যোগাড় করতে সরকারকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হত। অনেক গড়িমসির পরে বাবার জেলের সঙ্গী হিসাবে তারা লালা শঙ্করলালকে পাঠিয়েছিল। লালা শঙ্করলাল তার আগে বসুবাড়ির আর দুই ছেলে দ্বিজেন ও অরবিন্দের সঙ্গে পাঞ্জাবের ক্যাম্পবেলপুর জেলে ছিলেন। আমার বেলায় নয় মাসের উপর একলা থাকার পরে সরকার একটা ব্যবস্থা নিলেন।

মাস-তিনেক 'কনডেম্‌নড প্রিজনার্স' ইয়ার্ডে থাকার পরে আমাকে অন্য একটি এলাকায় বদলি করা হল। ইয়ার্ডটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফাঁসির আসামীদের ওয়ার্ড ও ফাঁসির মঞ্চের ঠিক পাশেই। ফাঁসির মঞ্চের ওপরের ভাগটি এখান থেকে বেশ ভালভাবেই দেখা যেত। নতুন জায়গায় এসে একটা সুবিধা হল যে, অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের আমি খানিকটা কাছাকাছি এলাম। লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মাঝে অন্য দু-একজন রাজবন্দীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলাও যেত। এঁদের মধ্যে দুজন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির তারাচাঁদ গুপ্ত ও পণ্ডিত বাৎস্যায়ন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন, লুকিয়ে বই ও কাগজপত্র পাঠাতেন। এক প্রবীণ বিপ্লবী বন্দী বাবা গুরুদিৎ সিং সেই সময় ঐ জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে রোজ একবার করে হেঁটে জেল প্রদক্ষিণ করতে দিত। সেই সময় ঐ সৌম্যকান্তি পাঞ্জাবি-বিপ্লবী আমার ওয়ার্ডের

C/o The Superintendent
District Jail
Lyallpur (Punjab)

Signature of censoring officer	Date	Name of sender
	8.5.45.	

লায়ালপুর জেল থেকে লেখা আমার চিঠি

সামনে এসে আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বিনিময় করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন সকালে এক সুদর্শন বাঙালী ভদ্রলোককে জেলারসাহেব আমার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বললেন, ইনি আমার সঙ্গে থাকবেন। সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়ের বাড়িতে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ১৯৪৪ সালের প্রথমের দিকে এক সন্ধ্যায় আমি এঁকে দেখেছিলাম। মনে হল তিনিও যেন সেই বছর-খানেক আগে এক ঝলক দেখা হবার কথা মনে রেখেছেন। বুঝলাম অনেক মাছই এক জালে ধরা পড়েছে। ভদ্রলোকের নাম অরুণচন্দ্র সেন, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক। পাঞ্জাবেরই ঝাং বলে একটি জায়গায় কয়েক মাস তাঁকে বন্দী করে রাখার পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, মাথার চুল প্রায় সবই পাকা, জেলে থাকতে বেশ কষ্ট পেয়েছেন বলে মন হল। যাই হোক, দিন-কয়েকের মধ্যেই আমার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হয়ে গেল তাঁর,

এবং দিনের পর দিন তিনি তার জীবনের অনেক ঘটনা আমাকে অকপটে বলে যেতে লাগলেন।

লায়ালপুরে তখন বেশ্ গরম পড়ে গিয়েছে—১১৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা নেহাতই স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রে সেলের ভেতর শোয়া যায় না। আমাদের বাইরে শোবার অনুমতি দেওয়া হল। মাঝে-মাঝে আঁধি আসে—মানে ধুলোর ঝড়। প্রথমে মনে হয় যে, ধুলোর একটা বিরাট পাহাড় ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে, তারপর ধুলোর মধ্যে যেন সব কিছুই ডুবে যায়। আমরা সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে দৌড়ে সেলের ভেতর আশ্রয় নিই। অরুণবাবুর খুবই কষ্ট হত বুঝতে পারতাম, কিন্তু উপায় কী?

প্রবীণ অধ্যাপকটি প্রথমে ছিলেন ঘোর কমিউনিস্ট। কোনো কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গেই একবার রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে এলগিন রোডের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। প্রথম কথাবার্তায় এতই আকৃষ্ট হন যে, রাঙাকাকাবাবুর কাছে বারবার আসতে লাগলেন। কিছুদিন যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার পরে তিনি রাঙাকাকাবাবুর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং ঘোর কমিউনিস্ট-বিরোধী হয়ে পড়েন। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, একদিকে এক পুরুষসিংহ ও মহাবিদ্রোহী, অন্যদিকে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর একদল মানুষ, রাঙাকাকাবাবুর সংস্পর্শে এসে তাঁর চোখ পুরোপুরি খুলে গেছে। আমার সব চালচলন এবং দৈনিক রুটিন তিনি খুব মন দিয় লক্ষ করতেন। ঐ গরমের মধ্যেও রোজ স্নান করা তিনি অপছন্দ করতেন, বলতেন তাঁর বাবা স্বনামধন্য স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে শিখিয়ে গেছেন, মানুষের শরীর রজ্জুর ন্যায়, জলে ভেজালে দুর্বল হয়। আমি যখন গীতা পড়তাম বা উর্দু শিখতাম তিনি খুশি হতেন। অন্য রাজবন্দীরা আমাকে স্টালিনের লেখা রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন সেটা পড়তাম তখন তিনি মুখ ভার করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বলতেন, কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়াটাও পাপ। কারণ, তাঁর মতে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ও জাতীয় জীবনের এত ক্ষতি আর কোনো মতবাদ করেনি।

তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে অরুণবাবু আমাকে অনেক কিছু বলেছিলেন। অনেক মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে যাতে আমি হঠাৎ অথবা যথেষ্ট প্রস্তুতির আগে রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ি, সে-বিষয়ে আমাকে প্রায়ই সাবধান করে দিতেন। বয়সের তফাত থাকলেও জেলের ভেতরে আমাদের মধ্যে এক গভীর স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠেছিল। অন্য দিকে আবার পাঞ্জাবের এক নিভৃত গ্রামের এক সরল যুবক ইব্রাহিমের আমার প্রতি কী মমতা! আমার সঙ্গে মাস-চারেক থাকার পরে তার জেলের মেয়াদ পূর্ণ হল এবং ছুটির আদেশ এল। বিদায়ের সময় তার সে কী কান্না!

ফাঁসির মঞ্চের পাশেই থাকার ফলে অন্তত আংশিকভাবে তিনটি ফাঁসি আমি দেখেছি। ফাঁসির দিন ঠিক হলেই আমরা জানতে পারতাম। ফাঁসির আগের দিন শেষ দেখার জন্য আসামীর আত্মীয়-স্বজন আসত। খবর পেতাম যে, আসামীরা সেই সময় স্থির ও অবিচলিত থাকত। ফাঁসির পরে দেহ নেবার সময় জেলগেটের সামনে যে জমায়েত হত, তখনই কেবল খানিকটা শোরগোল শোনা যেত।

দেওয়ালের ওপর থেকে কখনও-কখনও ফাঁসির আসামীরা আমাদের কাছ থেকে সিগারেটের টুকরো চাইত। আমি সিগারেট ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়ে দেওয়াল টপকে ফেলে দিতাম। ঐ সামান্য কাজটির জন্য তারা অন্য বন্দীদের মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতা

জানাত। এর আগে আমার ধারণাই ছিল না খুনি আসামীরা কী সাহসের সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে ওঠে! ফাঁসির সময় আমি যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় উঠে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করতাম। প্রথমে একটা আওয়াজ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জোর গলায় 'ইয়া আল্লাহ' বলে চিৎকার, শেষে ফাঁসির দড়িটার কাঁপুনি দেখতে পেতাম। পরেই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা।

ফাঁসির পরে সুপারিনটেন্‌ডেন্টসাহেব, সিভিল সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের একবার দেখে যেতেন। তাঁদের মুখে বিশেষ কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পেতাম না। ভাবতাম এই যে আমরা প্রাণের বদলে প্রাণ নিচ্ছি, এই অধিকার আমরা কোথা থেকে পেলাম।

॥ ৬৪ ॥

১৯৪৫-এর মার্চ থেকে আগস্ট। জেলে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে বুঝতেই পারছিলাম, বর্মায় প্রথমে চিনদ্‌উইন্‌ ও পরে ইরাবতী নদীর তীর বরাবর প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ব্রিটিশ ফৌজ আমেরিকানদের সাহায্যে এগিয়ে চলেছে ও জাপানিরা হটে যাচ্ছে। তখন অবশ্য জানতে পারিনি যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ বীর বিক্রমে ঐ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে, হাজার-হাজার আজাদি সৈনিক প্রাণ দিয়েছে। হাজার-হাজার যুদ্ধবন্দীও হয়েছে। দেশের খবরের কাগজে রাঙাকাকাবাবু বা আজাদ হিন্দ ফৌজের নামগন্ধও থাকত না। ইংরেজ সরকার খুব সাফল্যের সঙ্গে ভারতের জনগণের কাছ থেকে এত বড় একটা মুক্তি অভিযানের খবর লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ একদিন পত্রিকায় রাঙাকাকাবাবুর একটি অর্ডার অব দি ডে-র একটা অংশ রয়টার সংবাদ সংস্থার সৌজন্যে ছাপা হল। উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল লোককে বোঝানো যে, সুভাষচন্দ্র বসু হার স্বীকার করে নিয়েছেন। রাঙাকাকাবাবুর কথাগুলি ছিল—

Comrades : At this critical hour, I have only one word of command to give you, and that is, that if you have to go down temporarily, then go down fighting with the National Tricolour held aloft; go down as heroes; go down upholding the highest code of honour and discipline...

আসলে কিন্তু কথাগুলির মানে ছিল অন্য। আর একটি খবর আমাদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পাবার পর বললেন যে, তিনি খবর পেয়েছেন পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি ফৌজ গঠন করেছিলেন, ফৌজটি জাপানিদের পাশাপাশি লড়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছেন। জওহরলাল বললেন যে, ঐ সব যুদ্ধবন্দীদের উপর খারাপ ব্যবহার করা চলবে না।

১৯৪৫-এর জুলাই-আগস্ট মাস আমরা খুবই চিন্তার মধ্যে কাটিয়েছিলাম। রাঙাকাকাবাবু শেষ পর্যন্ত কী করবেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ কী করবে, আমাদের ভবিষ্যৎই বা কী হবে—এই সব প্রশ্ন নিয়ে অরুণবাবু ও আমি ক্রমাগতই আলোচনা করতাম। প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যেও রাঙাকাকাবাবু যে ঠিক একটা রাস্তা বের করবেন, এ-বিষয়ে কিন্তু আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তারপর হঠাৎ একদিন নাগাসাকি ও হিরোসিমার উপর অ্যাটম বোমা ফেলার খবর এল।

AUGUST SATURDAY 25 1945

Samvat.—2 Bhadoon (Badi), 2002. *Bengali.*—8 Bhadra, 1352.
Faslee.—2 Bhadoon, 1352. *Hijri.*—16 Ramzan, 1364.

Today's "Indian Express" and "Hindu" brought the heart-rending news of Subhas's death as the result of an aeroplane crash. Divine Mother, how many sacrifices have we to offer at your altar! Terrible Mother, your blows are too hard to bear! Your last blow was the heaviest and cruellest of all. What divine purpose you are serving thereby, you alone know. Inscrutable are your ways!

Four or five nights back dreamt that Subhas had come to see me. He was standing on the verandah of this bungalow and appeared to have become very tall in stature. I jumped up to see his face. Almost immediately thereafter, he disappeared. I did not attach any meaning to the dream then and that is why I did not record it in this diary the day after. But, now?

1.30 PM – 98.9
9 PM – 98.5

বাবার ডায়েরী—নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাবার পর

মানবজাতির ইতিহাসে এত বড় নিষ্ঠুর ও ধ্বংসের খেলা যে আর হয়নি—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। দিন-কতকের মধ্যেই এল জাপানের আত্মসমর্পণের খবর। এর আগেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

জাপানের আত্মসমর্পণের দিন সূর্যাস্তের সময় দেখলাম, প্রবীণ বন্দী বাবা গুরুদিৎ সিং আমাদের ইয়ার্ডের গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, ভাবছি সুভাষ এখন কী করবে। তার পক্ষে তো এক চরম সংকটের দিন এসে পড়েছে।

শুক্রবার ২৪ আগস্ট দুপুরে আমি স্নান করে এসে শুনলাম যে, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব খবরের কাগজ হাতে করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছেন, কিছুক্ষণ পরে আবার আসবেন বলে গেছেন। অরুণবাবু আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। একটু পরেই বড়সাহেব আবার হাজির হলেন। বললেন, সকালের কাগজে একটা খবর পড়ে কাগজটা তোমাকে আর পাঠাইনি। ভাবলাম নিজেই তোমার কাছে আসব ও আমার কর্তব্য করব। আই অ্যাম রিয়ালি ভেরি ভেরি সরি, তোমার কাকার সম্বন্ধে খুব খারাপ খবর আছে, এই দেখ কী লিখেছে। এই চরম দুঃখের দিনে আমরা সকলে তোমাকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

ছবিসুদ্ধ খবর—ফরমোসোয় সুভাষচন্দ্র বসু এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

কিছুক্ষণের জন্য যেন সব কিছু থেমে গেল। ট্রিবিউন পত্রিকাটি হাতে নিয়ে নিজের সেলের ভিতরে গিয়ে বসলাম। অরুণ সেন মহাশয় একটু পরে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। মিনিট-কয়েক কোনো কথাবার্তা নেই। কেবল পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা। অরুণবাবু আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পরে বলে উঠলেন, বাট দিস ইজ নট ট্রু। চমকে উঠলাম। তাই তো, এটা তো সত্যি নাও হতে পারে!

সপ্তাহের শেষ, চিঠির কোটা ফুরিয়ে গেছে। বাড়িতে লিখবই বা কী! সোমবার মাকে চিঠি লিখলাম।

এর পরেও মাস-খানেক জেলে ছিলাম। গুজব চলছিল যে, এবার আমাদের বোধহয় ছেড়ে দেবে। কিন্তু একদিন আমাদের সহবন্দী তারাচাঁদ গুপ্ত চুপি-চুপি আমাকে বললেন, তোমার কেসটা কিন্তু ভাল নয়, বোধহয় ছাড়বে না। তোমার সম্বন্ধে বাংলার গোয়েন্দা দফতরের একটা রিপোর্ট লাহোর ফোর্টে না গিয়ে ভুল করে এই জেলের অফিসে চলে এসেছিল। সেটা আমি দেখেছি। তাতে তোমাকে বিপজ্জনক লোক বলা হয়েছে, এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

রাঙাকাকাবাবুর মৃত্যুর খবরটা সত্যি বা সত্যি নয়—এই নিয়ে আমরা দু'জনে ক্রমাগতই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম। আমার কিন্তু কেবলই বাবার কথা মনে হত। শুনেছি, পুত্রশোকের চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নেই। বাবার কাছে এটা তো পুত্রশোকের চেয়েও বড় আঘাত। রাঙাকাকাবাবু ছিলেন তাঁর চোখের মণি। তিনি বুক ফুলিয়ে বলতেন, লিখেও গেছেন, যে ছোট্ট 'কুকা'কে তিনি ছেলেবেলায় কোলে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন, সে তাঁর সব আশা, সব স্বপ্ন পূর্ণ করল। হয়ে উঠল এক মহান কর্মযোগী। ভাবলাম, সুদূর দক্ষিণ ভারতের বন্দিশালায় বাবা আজ কত নিঃসঙ্গ। অনেক পরে তাঁর ডায়েরির পাতা

6/9/45.

District ... 201
Lyallpur (Punjab)
Monday,

My dear mother,

On Friday afternoon 'The Tribune' brought me the terrible news. What shall I say? It is all big to be brave at the loss of one of the bravest of men. His will be done!

I shall anxiously await news about you all at home and particularly about father's health. Please do not be anxious on my account. I shall be all right.

I have received Roma's and Gita's letters of the 9th and the 15th respectively and also three English books.

With pranams,

Your loving
Sisir

Signature of censoring officer	Date	Name of sender
[signature]	27th August 1945	Sisir Kumar Bose

... ed by Supdt. of Poli ... I.B.

আমার চিঠি—জেল থেকে

ওলটাতে-ওলটাতে ১৯৪৫ সালের ২৫ আগস্ট তারিখের লেখায় তাঁর গভীর মর্মবেদনার কথা খুঁজে পেয়েছিলাম। তিনি লিখছেন, মঙ্গলময়ী মা রুদ্রাণীর রূপ নিলেন কেন ? এত বড় এত নিষ্ঠুর আঘাত কেন তিনি হানলেন ! আমাদের আরও কত দিতে হবে, আরও কত বলিদানের প্রয়োজন হবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য ? মা ভগবতীর ইচ্ছা মা-ই জানেন ! আরও লিখেছেন, কদিন আগেই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সুভাষ তাঁর বন্দিশালার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং আকৃতিতে তাঁকে বিরাট দেখাচ্ছে। বাবা তাঁর মুখ দেখবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল !

১৯৪৫-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল :

With the effective surrender of the Japanese in Singapore, it has become unnecessary to keep any longer in custody a number of persons, including Mr. Sarat Chandra Bose and certain members of his family, who had been detained by order of the Central Government to prevent them from acting in a manner prejudicial to the defence of British India and the efficient prosecution of the war.

এবার যে মুক্তি পাব ধরেই নিলাম। কিন্তু আমার মুক্তির আদেশটা লায়ালপুরে পৌঁছতে দু'দিন দেরি হল। শেষ পর্যন্ত অরুণবাবু ও আমাকে একসঙ্গেই ছেড়ে দেওয়ার আদেশ এল। জীবনে এক অধ্যায় শেষ হল।

॥ ৬৫ ॥

জেল থেকে বেরোবার আগের দিন জিনিসপত্র গোছগাছ করতে-করতে ভাবছিলাম, কী জানি, দেশবাসী আমাদের কী ভাবে গ্রহণ করবেন! আপাতদৃষ্টিতে তো রাঙাকাকাবাবুর দুঃসাহসিক মুক্তি-অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজ যুদ্ধে জিতে গেছে, তাঁর নিজের সম্বন্ধেও এক নিদারুণ খবর এসেছে। এই অবস্থায় দেশের মানুষ আমাদের দিকে কি আর ফিরে তাকাবেন ?

লায়ালপুর জেলের গেট পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এক বিরাট উদ্বেলিত জনতা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি, ক্রমাগতই জয়ধ্বনি। ফুল দিয়ে সাজানো এক টাঙ্গায় আমাকে তোলা হল। টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশো মানুষ দৌড়চ্ছে। পাগলের মতো হয়ে জনতা সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছে—'সুভাষচন্দর্ বোস জিন্দাবাদ'। 'বোস খানদান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। জীবনে এত অপ্রস্তুত ও বিব্রত কখনও হইনি। লায়ালপুরের বিশিষ্ট এক নাগরিকের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও কেবল লোক আর লোক। ছোটরা এসে আমার অটোগ্রাফ চায়, আমি যত না-না করি, কেউ শুনতে চায় না। আমি উর্দুতে লিখতে পারি দেখে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

আমাকে বলা হল বিকেলে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। আমি যেমন ফুলের মালা আগে পরিনি, জনসভাতেও তেমনি বক্তৃতা করিনি। এক বন্ধুর সাহায্যে রোমান হরফে উর্দুতে বক্তৃতা লিখে ফেললাম। বারবার পড়ে সেটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। লায়ালপুরের মতো ছোট শহরের পক্ষে বেশ বড় সভাই হল।

পরের দিন ভোরে লায়ালপুরের বন্ধুরা আমাকে লাহোরের দূরপাল্লার বাসে তুলে দিলেন। লাহোরে বসুবাড়ির তিন ছেলের মিলিত হবার কথা। সেখান থেকে একসঙ্গে কলকাতায় যাত্রা হবে। দ্বিজেন তো লাহোরেই রয়েছে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। অরবিন্দ আসবে ক্যাম্প্‌বেলপুর থেকে। কলকাতায় বসুবাড়ির বন্ধু এক পাঞ্জাবি পরিবারের আত্মীয়রা লাহোরে আমাদের দেখাশুনো করার ভার নিলেন। কলকাতা রওনা হতে কয়েকদিন দেরি হল। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া বেশ শক্ত, তা ছাড়া দ্বিজেনের ডাক্তারদের ছাড়পত্র চাই।

এদিকে বাবার মুক্তির খবর কাগজে বেরিয়েছে। তিনি মাদ্রাজ হয়ে বাড়ি ফিরছেন।

লাহোর থেকে কলকাতা যাত্রায় ট্রেনেও এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। প্রত্যেকটি স্টেশনে লোকের ভিড়, রাত্রেও নিস্তার নেই। বারে বারে 'সুভাষচন্দর্ বোস জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি। প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনেরাও বিভিন্ন স্টেশনে এসে আমাদের দেখে গেলেন। দু'রাত ট্রেনে কাটাবার পরে আবার আমরা বাংলার মুখ দেখতে পেলাম। হাওড়া

স্টেশনে অনেক লোক, মেডিকেল ছাত্রদের একটা বিরাট দল আমাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করল।

উডবার্ন পার্কের বাড়ি আবার সরগরম। অনেক লোকের যাওয়া-আসা। বাবাকে কিন্তু তখনই পেলাম না। কংগ্রেসের নেতাদের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে বোম্বাই চলে গেছেন। ১৯৩৯-৪০-এর মতভেদ ও বিচ্ছেদ ভুলে গিয়ে কংগ্রেসের নেতারা আবার বাবাকে তাঁদের সঙ্গে চান, ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা দাবি তোলবার জন্য। বাবা তাঁদের ডাকে সাড়া দিলেন। বোম্বাইয়ে বাবার সংবর্ধনাও হল অভূতপর্ব।

বাবা কলকাতা ফেরার দিন কী বিরাট অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার বিবরণ শুনলাম। সাঁতরাগাছি থেকে হাওড়া পর্যন্ত পথ নাকি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। মোটরে হাওড়া পৌঁছতে বাবার কয়েক ঘন্টা লেগেছিল। হাওড়ার জনসভা ছিল ইতিহাসে লিখে রাখবার মতো একটা ব্যাপার। বাবা মুক্তি পাবার পরই ইংরেজ সরকারের উদ্দেশে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি কোনোরকম দুর্ব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না—'নট এ হেয়ার অন দেয়ার হেডস্ মাস্ট বি টাচড্।' কলকাতায় পৌঁছেই তিনি সংগ্রামের ডাক দিলেন। যৌবনে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁরা যে গান গেয়ে পথে-পথে ঘুরতেন, সেই গান তিনি আবার শোনালেন:

"চলরে চলরে চলরে ও ভাই
জীবনে আহবে চল,
বাজবে যেথা রণভেরী
আসবে প্রাণে বল—"

বললেন রণভেরী সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়েছে, আবার লড়াইয়ের ডাক আসবে।

কদিন পরেই বাবা বোম্বাই থেকে ফিরলেন। বারে-বারেই বলতে লাগলেন, শারীরিক ও মানসিক অনেক কষ্ট তো গেছে, আবার মন ও শরীর ঠিক করে নাও। আর একটা কথা প্রায়ই বলতেন বা মাকে দিয়ে বলাতেন, আমি যেন আমার জেলের অভিজ্ঞতা এবং রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের কাহিনী বিশদভাবে লিখে ফেলি।

রাতারাতি আমরা 'ফেমাস' হয়ে যাওয়ায় নানা সভা-সমিতিতে আমাদের ডাক আসতে লাগল। মনে আছে কংগ্রেসের এক বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর সভায় বর্ধমানে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বাবার অনুমতি চাইলেন। ঐ সভায় যাবার অনুমতি দিয়ে বাবা আমাকে আলাদা ডেকে কিছু পরামর্শ দিলেন। বললেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের নিয়ে দেশবাসী যে এত করছেন এটার মূলে রয়েছে 'সুভাষের reflected glory'। সবটাই সুভাষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অভিব্যক্তি। আরও বললেন, এই সব দেখে আমাদের যেন মাথা ঘুরে না যায়। আমার উচিত নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে প্রথমে ডাক্তারি পড়া শেষ করা।

বাবা চাইলেন, আমরা সকলে মিলে পুজোর সময় আমাদের কার্শিয়ঙের বাড়িতে দিন-কতক কাটিয়ে আসি। কার্শিয়ঙে বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হত। দেখলাম, দীর্ঘ ও কষ্টকর বন্দী-জীবনের পরেও বাবার মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ আসেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধের পর এবং বিশেষ করে রাঙাকাকাবাবুর আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের

আঘাতে ব্রিটিশ সরকার আসলে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে। নীতিগত কোনো আপোস করবার প্রয়োজন নেই।

রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে বাবার চিন্তার অবধি ছিল না, তবে সবটা প্রকাশ করতেন না। তিনি নেই—এ-কথা বাবার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুভাষ আসবে, সে ফিরে কাজের ভার নিলে তবে আমার ছুটি, এই ধরনের কথা বাবা প্রায়ই বলতেন। বাবার অন্তরের আশা জাগিয়ে রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। বিমান-দুর্ঘটনার কথা উঠলেই বলতাম, ওটা বাজে সাজানো গল্প।

১৯৪৫-এর নভেম্বরে দিল্লির লাল কেল্লায় যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন অফিসারের বিচার শুরু হল, সারা দেশ যেন ঝলসে উঠল। জীবনে কয়েকটি বড় গণ-আন্দোলন দেখেছি, কিন্তু সর্বস্তরের সব মানুষ—বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, ছাত্র, শিশু, পুরুষ, মহিলা—সকলের মধ্যে এক কথায় সমগ্র জাতির হৃদয়ে এমন আলোড়ন আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রাঙাকাকাবাবু বিদেশে একটা কথা জোর দিয়ে বলতেন। বলতেন, তিনি যা কিছু করছেন তাঁর দেশবাসীর তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে যে গণ-আন্দোলন হল, তার দ্বারা রাঙাকাকাবাবুর দাবির সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হল। এমনকী, দেশের যে-সব মানুষ সংগ্রামের সময় দেশদ্রোহিতা করেছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বা যাঁরা চিরকালই ইংরাজের দোসর ছিলেন, তাঁরাও সুবিধা বুঝে কৌশলে এই নতুন আন্দোলনে ভিড়ে গেলেন। দেশের মরা গাঙে আবার বান এল, ভারতবাসী আবার তাঁদের মনোবল ফিরে পেলেন।

আমি জেল থেকে ফেরার আগেই কিছু উৎসাহী ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ ও কীর্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স কোরের সূচনা করেছিলেন।

ফেরার পর এঁরা আমাকে ডেকে আই· এন· এ· সি-র এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিলেন। সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাবা। কিছুদিনের মধ্যেই আই· এন· এ· সি· একটি বিরাট শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও পরের বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আই· এন· এ· সি-র সেবার কাজ সর্বকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আই· এন· এ· রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল। বাবার সভাপতিত্বে বাংলার কমিটিই ছিল কাজের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে। বউবাজার স্ট্রিটে কমিটির অফিসটি হয়ে উঠেছিল এক প্রাণমাতানো কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র। তাছাড়া কলকাতায় বেশ কয়েকটি আই· এন· এ· ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। পূর্ব-এশিয়া থেকে প্রত্যাগত আই· এন· এ· অফিসার ও সৈনিকদের সেখানে রাখা হত। ঐ সব আজাদি সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলে বা সেবা করে আমরা যে কী আনন্দ ও প্রেরণা পেতাম, তা বলবার নয়। সব দেশবাসীর মতো আমরাও কেবলই ভাবতাম, যিনি এই নতুন ইতিহাসের স্রষ্টা তিনি কোথায়?

॥ ৬৬ ॥

দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচার যতই এগোতে লাগল, পূর্ব এশিয়ায় রাঙাকাকাবাবুর বিরাট কীর্তির কাহিনী ততই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সারা ভারতে তখন ঘরে-ঘরে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরগাথাই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। সকলেরই ইচ্ছা ও চেষ্টা কী করে আমাদের জাতীয় জীবনে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বাণী ও শিক্ষাকে রূপ দেওয়া যায়। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা সামরিক কায়দায় প্যারেড করতে আরম্ভ করল। নতুন করে দেশসেবায় ব্রতী হতে পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে উঠল। সকলের মুখেই জয় হিন্দ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গান : 'কদম কদম বাড়হায়ে যা, খুশি কে গীত গায়ে যা'। অন্যদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুক্তির দাবিতে এক বিরাট গণ-আন্দোলন গড়ে উঠল। কলকাতায় আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়ি স্বাভাবিকভাবেই এইসব কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। এরই মধ্যে খবর এল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডিসেম্বরে কলকাতায় হবে। পণ্ডিত জওহরলালকে বাবা আগের মতোই আমাদের বাড়িতে থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন। একই সঙ্গে বাড়িতে বিয়ে লাগল, আমার মেজ বোন গীতার বিয়ে ডিসেম্বরেই হবে ঠিক হল। সব মিলে বাড়িতে এক এলাহি কাণ্ড।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেশপ্রিয় পার্কে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে যে বিরাট সভা হল, তার নজির পাওয়া ভার। বাবা ছিলেন সভাপতি, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। জওহরলাল আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকাতে সেখানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও কংগ্রেসকর্মীদের যাওয়া-আসা খুব বেড়ে গেল। গীতার বিয়ের জন্য তো আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের দিয়ে বাড়ি ঠাসা।

১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে রাঙাকাকাবাবুর জন্মদিনে কলকাতায় এক বিরাট ব্যাপার হল। আই এন এ রিলিফ কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেশপ্রিয় পার্ক থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত পরিক্রমা করল। সদ্যমুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার শাহ নাওয়াজ খান ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় উদ্দীপনার শেষ ছিল না। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে আমিও সারা পথটা হেঁটেছিলাম।

যুদ্ধের পর ইংরেজরা দুটো বড় ভুল করেছিল। প্রথম ভুল আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, দ্বিতীয় ভুল দেশে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেবল যে দেশের জনসাধারণকে নতুন করে জাগিয়ে তুলল তাই নয়, ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সৈনিক ও যে-সব অফিসার পূর্ব এশিয়ায় আজাদি ফৌজের কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এক বিপ্লব ঘটে গেল। লালকেল্লার বিচারের ফলে সেই বিপ্লবের বহ্নি আরও ছড়িয়ে পড়ল। নৌবাহিনীতে ও বিমানবাহিনীতে বিদ্রোহ হল। ভারতের ব্রিটিশ আর্মির অধিনায়ক অকিন্‌লেক নানা সূত্রে খবর নিয়ে জানলেন যে, ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রায় চলে যেতে বসেছে। আমার বেশ মনে আছে, যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরেই ভারতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির একেবারে উপরতলার অফিসার জেনারেল কারিয়াপ্পা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে বাবার সঙ্গে গোপনে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন।

১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের পর জাতীয়তাবাদীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার জনগণের মনোবল একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশে সেই মনোবল ফিরিয়ে দিল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ অবলম্বন করায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও জোরদার হল। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয় হল। বাংলায় কংগ্রেসের পক্ষে বাবা নির্বাচনযুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন, কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন এবং দিল্লির আইনসভায় কংগ্রেস দল তাঁকে নেতা নির্বাচিত করল। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর বক্তৃতাগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৪৬-এর মে মাসে বাবা বসুবাড়ির ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করলেন। তিনি খবর পেলেন যে, ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িটি বিক্রি হতে যাচ্ছে। বাবার দৃঢ় মত ছিল যে, ঐতিহাসিক ঐ বাড়িটি রাঙাকাকাবাবুর জীবন ও কর্মের প্রতীক হিসাবে চিরকালের জন্য রক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই সময় বাবার হাতে যথেষ্ট অর্থ ছিল না। তিনি দুই বন্ধুর সাহায্যে বাড়িটি কিনে নিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, বাড়িটির ঐতিহাসিক অংশগুলি যেমন ছিল তেমনই রক্ষা করা হবে এবং বাকি অংশগুলি জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো হবে। বাড়ির পিছনের অংশটি ইতিমধ্যেই হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সেটিও বাবা ফিরিয়ে নিলেন। বাবা বাড়িটির নাম রাখলেন 'নেতাজী ভবন'।

নেতাজীর শোবার ঘর ও অফিস যেমন ছিল, তেমনই রাখা হল ; আজও তেমনই আছে। বাড়ির বাকি অংশে আই এন এ ক্যাম্প হল। পূর্ব এশিয়া থেকে সদ্য-ফেরা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সেখানে রাখা হত। টোকিও ক্যাডেটদের মধ্যে অনেকেই বেশ কয়েক বছর নেতাজী ভবনে থেকে পড়াশুনা বা কাজকর্ম করেছেন। আজ নেতাজী ভবন যে একটি বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার মূলে রয়েছে বাবার সেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করতে বাবা বেশ বাধা পেয়েছিলেন। যেখানে দেশের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্ন সেখানে পারিবারিক বা অন্য ধরনের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে হয়। বাবা তাই করেছিলেন, তাই 'নেতাজী ভবন' দেশের জন্য রেখে যেতে পেরেছিলেন।

১৯৪৬-এর মাঝামাঝি বর্মা থেকে ডাক এল। সেখানে ইংরেজ সরকার কয়েকজন আই এন এ অফিসারকে নানা অভিযোগে বিচার করে সাজা দিতে চাইছিলেন। ঠিক হল, বাবা তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য রেঙ্গুন যাবেন। সঙ্গে যাব আমি ও এক পরিবারের বন্ধু। সেই প্রথম পূর্ব এশিয়ায় রাঙাকাকাবাবুর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নানা জায়গা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তা ছাড়া অনেক বিশিষ্ট লোকজনের সঙ্গেও পরিচয় ও কথাবার্তা হল। যুদ্ধকালীন বর্মার নেতা ও রাষ্ট্রপতি ডাঃ বা ম তখনও নিরুদ্দেশ। তাঁর স্ত্রী বাবাকে ও আমাদের তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। অনেক কথাবার্তা হল। যুদ্ধের পর বর্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন জেনারেল আউঙ সাং। আউঙ সাং প্রথমে তাঁদের দলের সদর দপ্তরে বাবাকে সংবর্ধনা দিলেন। আউঙ সাং তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। পরে তাঁর সঙ্গে বাবার নিভৃতে বেশ কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ হল। আমি দু'জনকার ছবি তুলে নিলাম। শেষে রেঙ্গুনের টাউন হলে আউঙ সাং বাবার জন্য এক বিরাট সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করলেন। বাবা যেখানেই যান আউঙ

সাং-এর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বাবাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। সংবর্ধনা-সভায় আউঙ সাং রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে বললেন :

I knew him as a sincere friend of Burma and Burmese people...Between him and myself there was complete mutual trust...we did have an understanding in those days that, in any event, and whatever happened, the INA and the BNA should never fight each other. And I am glad to tell you today that both sides did observe that understanding scrupulously......

বাবা যখন আই এন এ-র মামলার কাজে বা বর্মার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, তখন আমি কয়েকজন কমবয়সী বর্মী রাজনীতিবিদের সঙ্গে আলাপ জমালাম। তার মধ্যে ছিলেন আউঙ সাং-এর সেক্রেটারি আউঙ তান্। যুদ্ধের সময় আউঙ তান্ জাপানে বর্মার দূতাবাসে মিলিটারি অ্যাটাচি ছিলেন। সেই সময় রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। আউঙ তান্ আমাকে বলেন যে, টোকিয়ো সফরের সময় রাঙাকাকাবাবু একখানা চিঠি জাপানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে গোপনে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁকে দিয়েছিলেন। আউঙ তান রাস্তায় রাষ্ট্রদূতের গাড়ি থামিয়ে চিঠিটি গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

রেঙ্গুনে রাঙাকাকাবাবুর গুণগ্রাহীরা বাবার হাতে রাঙাকাকাবাবুর ব্যবহার করা জিনিসপত্র, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী দিয়েছিলেন। সেগুলি নেতাজী মিউজিয়ামে রাখা আছে।

বর্মা থেকে ফিরে শোনা গেল যে, একটি ইন্টারিম্ বা অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বড়লাট ওয়েভেল ঐ সরকারের সভাপতি থাকবেন, তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের এটাই যেন হবে প্রথম পদক্ষেপ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশের মত হল ঐ সরকারে যোগ দেওয়া। এদিকে জিন্নাসাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবি কিছুতেই তো ছাড়বেই না, বরঞ্চ তারা ক্রমাগতই সুর চড়াতে লাগল। বাংলায় তাদের প্রবক্তা সুরাবর্দিসাহেব তো কেবলই হুমকি দিতে লাগলেন, তাঁরা পাকিস্তান আদায় করে তবে ছাড়বেন। ১৬ই আগস্ট তাঁদের পক্ষ থেকে 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' আরম্ভ হল। বিকাল হতেই খবর আসতে লাগল, ব্যাপক হারে লুঠতরাজ ও খুনখারাপি আরম্ভ হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতায় ও বাংলার জেলায় জেলায় যে হত্যা ও ধ্বংস চলল, তার দৃশ্য মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি।

॥ ৬৭ ॥

১৯৪৬-এর মাঝামাঝি বাবা বর্মায় জেনারেল আউঙ সাং-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে অনেক আশা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। ১৯৪৫-এর শেষ থেকে ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল এক অতি উদ্দীপনাময় সময়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রবল জোয়ার এসেছিল। সেনাবাহিনীও আর ইংরেজদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে রাজি ছিল না। জনগণের প্রতিনিধিদের পক্ষে ক্ষমতা দখলের এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে? ওদিকে আউঙ সাং-এর মতো পূর্ব-এশিয়ার নেতাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলিও

আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়বে। ইতিমধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই নেতা সুকর্ন ও হাতার সঙ্গে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ হয়েছিল। ভিয়েতনামের জনগণ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন, ভারতের মুক্তিকামী সব মানুষই তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং দেশের ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল ছিল।

আমাদের প্রতিপক্ষ ইংরেজরা কিন্তু ছিল অতি কুশলী ও ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ। ১৯৪৬-এর প্রথমেই একটি মিশন পাঠিয়ে দেশের সব দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রস্তাব দিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে একটি দল হাজিরও হল। ইংরেজদের সঙ্গে কূটনীতিতে পেরে ওঠা শক্ত যদি আলোচনার লক্ষ্য ও সীমা আগে থেকে বেঁধে না দেওয়া যায়। তা না হলে তারা প্রতিপক্ষকে পদে পদে বেকায়দায় ফেলে দেয়। কথার মারপ্যাঁচে এবং কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে আলাদা করে কথাবার্তা চালিয়ে তারা একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করল। এদিকে জিন্নাসাহেবও কম যান না, তিনি সুবিধা বুঝে পাকিস্তানের দাবিতে অনড় রইলেন।

দাবিটা খুব উঁচু রাখলে শেষ পর্যন্ত অনেকটা পাবারই সম্ভাবনা। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি বেশ বোঝা গেল যে, সব দিক দিয়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আমরা কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছি, সংগ্রামের পথ থেকে সরে এসেছি। এই অবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাবার মতভেদ শুরু হল। বাবার মতে আমরা কথার লড়াইয়ে ইংরেজ ও জিন্নাসাহেবের কাছে নতি স্বীকার করেছিলাম। তিনি বারবার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য ও নীতি থেকে আমরা যেন কোনোমতেই সরে না যাই। বাবার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট—স্বাধীনতা হবে নিষ্কলুষ, তাতে কোনো খাদ থাকবে না, দেশ থাকবে এক ও অখণ্ড ; আমাদের জাতীয়তাবাদ হবে শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, তাতে জল মেশানো চলবে না ; দেশী বা বিদেশী কোনো কায়েমি স্বার্থের কাছে আমরা মাথা নত করব না ; আমাদের বিদেশী নীতি হবে পুরোপুরি স্বাধীন—আমরা কোনো বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হব না, বরঞ্চ আমরা এশিয়ার নবজাগ্রত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করব।

আগস্ট মাসে জানা গেল যে কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে বড়লাট ওয়েভেল একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করবেন। পণ্ডিত জওহরলাল সহ-সভাপতি হিসাবে ঐ মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাবাকেও মন্ত্রিসভায় নেবার প্রস্তাব দিলেন। শোনা গেল, বাবাকে নিতে ওয়েভেলের খুব আপত্তি, যদিও বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা এবং সরকার গঠন করতে যে কোনো স্বাধীন দেশে তাঁকেই ডাকার কথা। যাই হোক, কংগ্রেসের এ ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব দেখে ওয়েভেল প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। সরকার গঠিত হল এবং বাবা তাতে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বিধানসভা ও প্রাদেশিক বিধানসভা থেকে সদস্য নিয়ে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি সংসদ গঠিত হয়েছিল এবং বাবা তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বাবা যখন মন্ত্রী তখন আমি দিনকতক দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। বাবার দফতর ছিল ওয়ার্কস, মাইনস্ ও পাওয়ার। অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ায় দেশে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী মহলে, বেশ আশার সঞ্চার হয়েছিল। অনেকেই এটাকে কংগ্রেসের পুরো ক্ষমতায় আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিয়েছিলেন। যাই হোক, হাতে

কাজ পেয়ে বাবা তো উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। দিনকতকের মধ্যেই শুনলাম দফতরের নানারকম অন্যায় কার্যকলাপের খবর বাবার গোচরে এসেছে। সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ও দোষীদের খুঁজে বের করার জন্য বাবা তৎপর হলেন। কিন্তু মন্ত্রী তো অল্পদিনই ছিলেন, তাই কাজ সম্পূর্ণ হল না।

এদিকে ১৬ আগস্ট থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছুদিন কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে তাণ্ডবলীলা চলছিল তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাবা খুব বিচলিত ছিলেন। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কত লোক যে মারা গেল! যে-সব পাড়ায় কোনো-এক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বেশি, সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের বাড়িঘর জ্বালিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। এই কলকাতাতেই কত মানুষ যে উদ্বাস্তু হলেন তার ইয়ত্তা নেই। অনেক বাজার হাট ধ্বংস বা বন্ধ হয়ে গেল। যানবাহন, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ সবই বিপর্যস্ত। পাড়ায় পাড়ায় রাতে বা দিনের পর দিন কারফিউ, রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারির টহল। বাবা যেমন চাইলেন যে, দাঙ্গায় আহত ও গৃহহারাদের যথাসম্ভব সাহায্য দেওয়া হোক, তেমনই সাম্প্রদায়িক, হিংসাশ্রয়ী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়ি আই· এন· এ· সি-র হেড কোয়ার্টার্স হয়ে দাঁড়াল। শহরের সব উপদ্রুত এলাকায় আই· এন· এ· সি-র কেন্দ্র খোলা হল, তার মধ্যে বেশ কতকগুলিই ছিল ছোটখাটো হাসপাতাল। তাছাড়া বড়-বড় গাড়ি করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা থেকে হাজার হাজার পরিবারকে উদ্ধার করে শান্ত এলাকায় সরিয়ে আনা হল। পাড়ায়-পাড়ায় যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে তোলার কাজে বাবা সাহায্য করতে লাগলেন। এ কাজে গোপনে কিছু অস্ত্র সংগ্রহেরও প্রয়োজন হয়েছিল। বাবা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের নানা জায়গায় শান্তি মিছিল করলেন। নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের কী নিদারুণ দৃশ্য কলকাতার পথে পথে সেই সময় দেখেছি তা ভোলবার নয়।

কলকাতায় যা ঘটল তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায়—বিশেষ করে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়।

হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালেন বা গৃহহারা হলেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব বাংলা সফর করলেন। বাবাও উপদ্রুত এলাকাগুলিতে ঘুরলেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। বছরের শেষের দিকে অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও দেশের মানুষের মনপ্রাণ বিষিয়ে গেল।

খুনের রাজনীতির প্রথম ফল পেলেন মুসলিম লিগ, কেন্দ্রের অস্থায়ী সরকারে তাঁদের স্থান দেওয়ার প্রস্তাব এল। কী জানি কেন, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের এই লড়িয়ে দেবার কূটনীতির শিকার হলেন। মুসলিম লিগের প্রতিনিধিদের জায়গা করে দেবার জন্য মন্ত্রিসভা থেকে বাবাকে এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান এক সদস্যকে সরে যেতে বলা হল। মাত্র ছয় সপ্তাহের মন্ত্রিত্বের পরে বাবা ফিরে এলেন। পরে অনেকে বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর পদত্যাগ করা উচিত হয়নি। বাবা বলেছিলেন যে, গান্ধীজির মাধ্যমে প্রস্তাব আসার জন্য তিনি না করতে পারেননি।

বাবা বলেছিলেন যে, ইংরেজ বড়লাটকে মাঝে বসিয়ে মন্ত্রিসভায় একদিকে কংগ্রেস ও অন্য দিকে মুসলিম লিগকে বসানো ছিল দেশ বিভাগের প্রথম পদক্ষেপ। আসলে হলও তাই। সেক্রেটারিয়েটের এক ঘরে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে আধা-মন্ত্রিসভার বৈঠক

বসত, আর অন্য একটি ঘরে মুসলিম লিগের নেতা লিয়াকত আলি খান তাঁর দলবল নিয়ে মিটিং করতেন। লিগ তাঁদের পাকিস্তানের দাবি থেকে একচুলও নড়েননি। দর কষাকষির সুবিধার জন্য বড়লাটের সাহায্যে একটা সুবিধাজনক জায়গা দখল করে নিলেন মাত্র।

কলকাতায় ফিরে এসে বাবা দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলায় কী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। তাছাড়া দেশ ভাগের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। বারবার তিনি বলতে লাগলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করলে সর্বনাশ হবে, কোনো সমস্যার সমাধান তো হবেই না, বরং নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে। তিনি বললেন, সাম্প্রদায়িকতার ওষুধ সাম্প্রদায়িকতা নয়, উদার জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ। তিনি চাইছিলেন, দেশের সব মূল সমস্যার সমাধান জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হোক। উত্তেজনার মধ্যে বা ঝোঁকের মাথায় বা সাময়িক একটা লাভের আশায় নীতি বিসর্জন দিলে শেষ পর্যন্ত ভুগতে হবে। এই ছিল বাবার বিশ্বাস। সেইজন্য ১৯৪৬-এর শেষেও বাংলায় কংগ্রেস দলকে নতুন করে সংগঠিত করবার তিনি ডাক দিয়েছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৪৭ সালের প্রথমে নতুন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল। সাম্প্রদায়িকতাব বিষ আরও ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিয়ে মুসলিম লিগের আর একটা জয় হল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ধর্মের ভিত্তিতে পাঞ্জাবকে দুই ভাগ করার প্রস্তাব মেনে নিলেন। বাবা এই সিদ্ধান্তে খুবই বিচলিত হলেন। তাঁর মতে ঐ সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিপন্থী। তিনি লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগলেন। কিন্তু দেশের আবহাওয়া তখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কংগ্রেসি ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও অনেকে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। পাকিস্তানিদের দাবির পালটা দাবি হিসাবে তাঁরা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তুললেন। বাবা কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন। বাংলাকে এক রেখে বিকল্প কোনো রাজনৈতিক সমাধানের সূত্র বের করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

॥ ৬৮ ॥

এমন লোক এ-জগতে আছেন যাঁদের আদর্শবাদ থেকে টলানো যায় না। ব্যক্তিগত ও জনজীবনে তাঁরা কতকগুলি মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জীবনে সব কিছু ছাড়তে বা ত্যাগ করতে রাজি, কিন্তু আদর্শ ও নীতি ছাড়তে কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত নন। নীতির প্রতি এই আনুগত্য অনেক দুঃখ ডেকে আনে, ভোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিতই থেকে যান। তাঁরা যেন এ-জগতে এসেছেন কেবল সংগ্রাম করতে। তাঁরা একলা চলেন, এই নিঃসঙ্গতা শান্তভাবে গ্রহণ করেন। চারিদিক থেকে কটু কথা গালমন্দ শুনতে হয়, সে-সব তাঁরা হাসিমুখে হজম করেন। তবে অন্তরে তাঁরা সুখী, কারণ বিশ্বাসে অবিচল থেকে, নীতি আঁকড়ে ধরে, বাস্তব জীবনের সুখ-সুবিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁরা এক নির্মল আনন্দের অধিকারী হন। আদর্শের মাপকাঠিতে যা আমার কর্তব্য তাই আমি করব, তার জন্য যা মূল্য

দিতে হয় দেব, আদর্শ ও নীতি নিয়ে কখনও আপোস করব না—এই হল এঁদের কথা। আমার বাবা ছিলেন এই ধাঁচের লোক। রাজনীতি করতে নেমেও তিনি জোর গলায় বারবার বলতেন—He who is morally wrong cannot be politically right, যে নীতির ধার ধারে না, যে চরিত্রহীন, তার রাজনীতি কখনও ঠিক হতে পারে না।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা যখন আসন্ন তখন স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাবা বাংলাকে অবিভক্ত রাখবার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে হলে খুব খোলা মনেই তা করতে হবে। ঐ প্রস্তাবটি দেওয়ার ফলে বাবা বাস্তবিকই একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুরা পর হয়ে গিয়েছিলেন, রাজনীতির সহকর্মীরা তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছিলেন, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশই খোলাখুলিভাবে বা গোপনে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য কী ছিল ? হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি, এদের মধ্যে কখনোই মিল হতে পারে না। সুতরাং দুটি আলাদা রাষ্ট্র চাই, এই ছিল পাকিস্তানপন্থীদের মূল কথা। বাবা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না, ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতি চিরকালই ঐ ধর্মীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং আমরা জাতীয়তাবাদীরা ঐ মতবাদের বিরোধিতা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানেরা এই দেশে কয়েক শতক ধরে একত্রে বসবাস করে এমনই মিলেমিশে গিয়েছেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে আমরা কখনোই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারব না, বরং সমস্যাগুলি বার বার ফিরে আসবে। সুতরাং, বাবা বললেন, বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা একসঙ্গে হয়ে একটি স্বাধীন সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়বেন। ঐ রাষ্ট্রে পার্লামেণ্ট নির্বাচিত হবে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিতে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান যে-কোনো প্রার্থীকে দুই সম্প্রদায়েরই ভোট পেতে হবে। অবিভক্ত বাংলার শাসনতন্ত্র লেখবার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এক সঙ্গে সমান প্রতিনিধিত্বে একটি সভা গঠন করবেন। যুক্ত বাংলার পার্লামেণ্ট ঠিক করবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী হবে। বাবা বলেননি যে, অবিভক্ত বাংলা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে না। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের পার্লামেণ্ট এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

আমি নিজে বাবার মুখে শুনেছি যে, অবিশ্বাসের ও ঘৃণার যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে সেজন্য বড় জোর দশ বছর বাংলার স্বাধীন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকবে। তারপর স্বাভাবিক কারণে ও নিজেরই স্বার্থে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে। বাবা বলেছিলেন যে, ঐ যুগসন্ধির সময় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার পাকিস্তানি মতবাদ অন্তত পূর্ব-ভারতে বানচাল করে দেওয়া। অবিভক্ত বাংলা পুরোপুরি পাকিস্তানে চলে যাবে এই ধারণা ছিল, বাবার মতে অমূলক। কারণ, অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার গঠনতন্ত্রই হবে ভাষার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত উদ্যোগে ও যুক্ত-ভোটে নির্বাচিত একটি রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রে প্রশাসনে ও ফৌজে থাকবে হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার।

বাবা মহাত্মা গান্ধীকে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার চেষ্টায় বাংলার মুসলিম লিগের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার বিষয়ে ওয়াকিবহাল রেখেছিলেন। গান্ধীজি কয়েকটি বিষয়ে বাবাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির এক সদস্য জর্জ ক্যাটলিন অতিথি ছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার জেনারেল ওয়েভেলকে সরিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে পাঠিয়েছে। ক্যাটলিনের হাত দিয়ে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ফরমূলাটি বাবা মাউন্টব্যাটেনের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা যেন কার্যকর না করা হয়। মাউন্টব্যাটেন ছিলেন ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ। তিনি বেশ চালাকি করে উত্তর দিয়েছিলেন যে, শেষ মুহূর্তেও যদি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ও মুসলিম লিগের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ঐ ফরমূলা গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি বদলে দেবেন। যত দূর জানা যায়, কংগ্রেসের সেই সময়কার সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যুক্ত স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। জিন্নাসাহেব বাবার কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছিলেন, কিন্তু শেষ পৃর্যন্ত বাংলার মুসলিম লিগ নেতাদের কোনো নির্দেশ দেননি। মাউন্টব্যাটেন জুন মাসে দুই পক্ষের সম্মতি আদায় করে বেতারে যে পরিকল্পনা প্রচার করলেন তাতে দেখা গেল যে, বাবার সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। তিনি নতুনভাবে তাঁর নিজের কর্মপন্থা ঠিক করবার কাজে মন দিলেন। শেষ জীবনে তাঁর একলা চলার অধ্যায় শুরু হল।

রাজনীতির চরম অস্থিরতার মধ্যেও বাবা সেই সময় গঠনমূলক কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর প্রথমে রাজনীতির শিকার হয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স কোর ভেঙে গেল। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু সভ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, আদর্শবাদী সমাজসেবার কাজটা চালিয়ে যেতেই হবে। বাবার আশীবাদ নিয়ে আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রতিষ্ঠান দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের সেবা করা ছাড়াও সমাজসেবার ক্ষেত্রে নতুন-নতুন পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। নেতাজী ভবনই হল ঐ প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর। নেতাজী ভবনে আজ পর্যন্ত স্থায়ী ও অর্থপূর্ণ যা কিছু হয়েছে, সবই ঐ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের তরুণ ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের উদ্যোগে হয়েছে। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোও এঁদের দ্বারাই শুরু হয়েছিল। বাবা একটা কথা গর্বের সঙ্গে বলতেন—আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের তরুণ কর্মীরা তাঁকে সামনে রেখে কাজ করে। তাঁর সমর্থন যতটা না হলেই নয় তারা নেয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই চালায়, তারা একটি ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়। তিনি লিখে গেছেন যে, তাঁর আশা, আজাদ হিন্দ সার্ভিস কয়েক দশক ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সেবা করে যাবে। আসলে তাই হয়েছে। শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কলকাতায় অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ও তাঁকে সভাপতি করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর একটি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছিল—সুভাষ ইনস্টিটিউট অব কালচার। প্রতিষ্ঠানটির জন্য বাবা একটি বড় বাড়িও নিয়েছিলেন এবং কিছুদিন কাজকর্ম বেশ ভালই চলছিল। দুঃখের বিষয়, বাবার মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠানটি বেশি দিন টেকেনি। ব্যক্তি-বিশেষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করলে প্রতিষ্ঠানে সুসংবদ্ধ ও কর্মঠ কর্মীর দল গড়ে ওঠে না, তারা স্বাবলম্বী হয় না। ফলে ব্যক্তিটির প্রস্থানের পর প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায়। আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠানের এই পরিণতি। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আরম্ভ করে কিছুদিনের মধ্যেই অবলুপ্তি। বাবা প্রায়ই এটাকে বলতেন—**beginning with a flash and ending in smoke**।

আনন্দের কথা যে, কয়েক বছর পরেই বাবার চিন্তাধারা অনুসরণ করে নেতাজী ভবনে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর স্থাপনা হয়। বাবার সাবধানবাণী মনে রেখে রিসার্চ ব্যুরোর কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়নি। গত পঁচিশ বছর ধরে কেবল কাজের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে পুরো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাবা নেতাজী ভবনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজ বহুলাংশে বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭-এর ৪ জুন আমাদের দেশ খণ্ডিত করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। বাবার প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হল। তার মতে ঐ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই জয় সূচিত হয়েছিল। তিনি বললেন যে, আমরা আমাদের আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি। তিনি আরও বললেন যে, এমন দিন আসবে যখন কংগ্রেস ঐ সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করবে।

যাই হোক, ১৫ আগস্ট এগিয়ে এল। ইংরেজের তদারকিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হলেন। বাবার পক্ষে তখন কংগ্রেস থেকে সরে আসা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। নিজের অনুগামীদের নিয়ে নতুন এক দল গঠনের কাজে তিনি মন দিলেন।

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭, বাবার কাছে ছিল যেন শোকের দিন। এত বিষণ্ণ তাঁকে আমি কমই দেখেছি। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় দেখলাম আমাদের বাড়ির নীচের তলার দক্ষিণের বাবান্দায় একলা স্থির হয়ে বসে আছেন। কিছুক্ষণ সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয় ছিলেন। তিনিও বাড়ি গেলেন। বাইরে থেকে নানারকম আওয়াজ আসছিল। প্রতিবেশীদের রেডিওতে উৎসবের গানবাজনা ও বক্তৃতাদি চলছে। রাস্তায় অনেক সাধারণ মানুষ খুব শোরগোল করছে। বাবার মনের অবস্থা দেখে আমি রেডিও খুলিনি। ভাবলাম রাস্তায় একটু ঘুরে আসি। বেরিয়ে দেখলাম একটার পর একটা লরি ভর্তি করে দলে দলে মানুষ হিন্দু-মুসলিম এক হো, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে জাতীয় পতাকা দুলিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করছে। বেশি দূর য়েতে মন চাইল না। বাড়ি ফিরে দেখি বাবা আগের মতোই স্থির হয়ে বসে আছেন। শুনেছিলাম আর একজনও বাবারই মতো স্বাধীনতার উৎসব থেকে দূরে ছিলেন—মহাত্মা গান্ধী।

॥ ৬৯ ॥

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার উৎসব খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। উৎসবের গানবাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি থেমেছে, কি থামেনি, খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলায় শুরু হয়ে গেল গণহত্যার এক অভাবনীয় তাণ্ডবলীলা। লক্ষ-লক্ষ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন আশ্রয়ের আশায়। হিন্দুরা হিন্দুস্থানের দিকে, মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে। পাঞ্জাবেও হত্যা ও লক্ষ-লক্ষ লোককে তাঁদের বাস থেকে উপড়ে ফেলে যে দুই পাঞ্জাবের সৃষ্টি হল তার মধ্যে একটি হল বাস্তবিকপক্ষেই মুসলিম রাজ্য, অন্যটি যদিও ভারতের ভাগে পড়েছিল, সেটি হল হিন্দু ও শিখদের রাজ্য। দুই দিকেই লক্ষ-লক্ষ উদ্বাস্তু। বাবা আগেই বলেছিলেন, বাংলায় কিন্তু ঐ ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হবে না, কারণ সারা রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান বহুদিন ধরে

এমন নিবিড়ভাবে মিলেমিশে আছে যে, পুরোপুরিভাবে আমাদের সমগ্র জনসংখ্যাকে ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। যাই হোক, লক্ষ-লক্ষ পরিবার তাঁদের বহুদিনের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার স্রোতের মতো আসতে লাগলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা চলল।

এই অবস্থায় বাবার অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের নিয়ে আগস্টের প্রথমে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি গড়লেন। নতুন দল গড়ার সময় বাবার মূল কথাই ছিল যে, আমাদের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ ও লক্ষ্যকে জাগিয়ে রাখতে হবে। দেশভাগ ও ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ভাবধারাকে আমাদের ছাড়লে চলবে না। তাছাড়া স্বাধীনতার পর দেশ গড়ে তোলার কাজ, আমাদের দরিদ্র জনগণের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সমাজবাদী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে, সেটাকে রূপ দিতে হবে। যে সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির বিষ আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেটাকে দূর করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। সেটা আমরা করতে পারব যদি জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং দেশের সব সমস্যা জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা আমাদের জাতীয় কর্মসূচী ঠিক করি। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কে প্রকৃত বামপন্থী এবং হঠকারী বামপন্থী এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। যাঁরা কেবল নেতাজীর নাম ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে চলেন না তাঁদেরও চিনে নিতে হবে।

১৯৪৭-এর প্রথমেই কলকাতায় একটি সম্মেলনে বাবা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের ডাক দিয়েছিলেন দলবদ্ধভাবে এবং সক্রিয়ভাবে দেশের জনজীবনে প্রবেশ করতে এবং নেতাজীর আদর্শ, মতবাদ ও নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে। দেশে যাঁরা যুদ্ধের আগে ও পরে রাঙাকাকাবাবুর অনুগামী ছিলেন তাঁদেরও তিনি ডেকেছিলেন ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাবা কোনো দিক থেকেই ভাল সাড়া পাননি। ফলে বড় রকমের নতুন দল গঠন করতে বাবা পারেননি। আগেকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর নেতা ও কর্মিবৃন্দ সুখে-দুঃখে বাবার সঙ্গে সর্বদাই ছিলেন। তাঁদের নিয়েই বাবা কাজ চালিয়ে গেলেন।

বাবার একটা বড় দুঃখ ছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দেশভাগের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যখন কংগ্রেস দেশকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব মেনে নিতে চলেছে তখন জোরের সঙ্গে বাধা দিলেন না। সেই সময় গান্ধীজি বাংলায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে তখন প্রায়ই দেখা করতে যেতেন এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। বাবা গান্ধীজিকে বারবার বলেছিলেন, আজও যদি আপনি আপনার কড়ে আঙুল উঁচিয়ে একবার বলেন যে, দেশভাগ করা চলবে না তাহলেই কাজ হবে। কিন্তু গান্ধীজি উত্তরে বলেন যে, তাঁর আর সে প্রভাব নেই, দেশের নেতৃবৃন্দের উপরেও নেই, দেশের জনসাধারণের উপরেও নেই।

১৯৪৮-এর প্রথমে আমাদের বিদেশনীতি সম্বন্ধে বাবা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছিলেন। প্রথমত তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমাদের বৃহৎ শক্তি দুটির মধ্যে কারুর সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা উচিত হবে না। আমাদের বিদেশনীতি হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে স্বাধীন বিদেশনীতি রক্ষার জন্য দুটি পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে। এক,

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়তে হবে। দুই, ভারতকে এক শক্তিশালী সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তুলতে হবে। এই সূত্রে মনে পড়ল বাবা স্বাধীনতার আগে থেকেই; বিশেষ করে স্বাধীনতা অর্জনের পর, জোরের সঙ্গে বলতেন, আমাদের দেশের যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই।

১৯৪৮-এর জানুয়ারির শেষ দিন মহাত্মা গান্ধীর হত্যার খবর যখন রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছিল তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। বাড়িতে ফিরে দেখলাম, বাবা গান্ধীজির শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্য পরের দিন ভোরের দিল্লির এরোপ্লেনে একটি আসনের জন্য চেষ্টা করছেন। বাবা তো সহজে বিচলিত হতেন না, তবে গভীর বেদনার ছায়া তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল। কেবলই বলছিলেন, তাঁর শেষ কাজে আমাকে যেতেই হবে। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে কিছু বলতে বললেন, বাবা শেক্সপিয়রের ভাষায় বললেন : **When comes such another ?**

১৯৪৭-এর প্রথম থেকেই বাবা দেশের সব সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত নির্ভয়ে এবং খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করছিলেন। তাঁর মতামত দেশের অধিকাংশ নেতা বা দল গ্রহণ করেননি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাবাকে লিখেছিলেন, তিনি যেন আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে ফিরে আসেন, যাতে তাঁরা সকলে মিলে দেশের ঐ সঙ্কট সময়ে জটিল সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারেন। বাবা রাজি হননি, বলেছিলেন, গভীর নীতিগত পার্থক্য যখন রয়েছে তখন তাঁর পক্ষে বাইরে থাকাই ভাল।

বাবা বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য একটা পত্রিকা দরকার। পত্রিকা চালানোর ব্যাপারটা কিন্তু বাবার কাছে নতুন কিছু ছিল না। সেই বিশের দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন বাবা। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ঐ পত্রিকা চালিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব বাবাই বহন করেছিলেন। পরে রাজরোষে পড়ে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা যখন হঠাৎ বন্ধ করে দিতে হয়, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু এক অসাধ্যসাধন করে বসেন। রাতারাতি 'ফরওয়ার্ড'-এর বদলে 'লিবার্টি' পত্রিকা বের হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐ দুটি পত্রিকার অবদান ভোলবার নয়। কিন্তু পত্রিকা বের করা ও চালিয়ে রাখা—অনেক খরচের ব্যাপার। 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি'-র ক্ষেত্রে বাবা আর্থিক দিক দিয়ে কোনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু বয়স তখন অনেক কম ছিল এবং টাকা রোজগার করবার সময় ও সুযোগ ছিল বেশি। তবে কাগজ বের করবার সিদ্ধান্ত তিনি যখন একবার নিয়েছেন, তিনি করে তবে ছাড়বেন। অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি কোনো কোনো সচ্ছল বন্ধুর কাছে অনুরোধ করলেন। সাড়া আশাপ্রদ হল না। তখন নিজেরই জমিজমা এখানে-সেখানে যা ছিল সেগুলি ব্যবহার করে, তার সঙ্গে নিজের রোজগারের যতটা পারলেন যোগ দিয়ে, একটা প্রেসের ব্যবস্থা করলেন। জোর কদমে কাজ এগোল। টাকার যত অভাব ছিল, স্বার্থত্যাগী একনিষ্ঠ কর্মীর তত অভাব ছিল না। তাঁদের সকলের মিলিত চেষ্টায় ১৯৪৮-এর ১ সেপ্টেম্বর 'দি নেশন' কাগজ বেরোল। বাবা হলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। তাঁর সই করা সম্পাদকীয় প্রথম সংখ্যায় ছাপা হল। সম্পাদক হলেন সত্যরঞ্জন বক্সি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বার্তা সম্পাদক মোহিতকুমার মৈত্র। 'দি নেশন' পত্রিকা বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল। বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের চাহিদা পত্রিকার কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি মেটাতেই পারছিলেন না। বাবা খুবই উৎসাহিত হলেন এবং পত্রিকাটি

যাতে খুব উঁচু মানের হয় তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। পরের বছর আমি যখন ডাক্তারিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তখন 'দি নেশন'-এর ফরেন করেসপনডেন্ট হিসাবে সাংবাদিকতায় এবং লেখালেখিতে আমার হাতেখড়ি হয়। বাবারই নির্দেশে প্যারিসে আমি 'দি নেশন'-এর প্রতিনিধি হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্পাদক সম্মেলনে যোগ দিই।

যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরেই বাবার কাছে ভিয়েনা থেকে এক বন্ধুর মারফত একটি চিঠি এসে পৌঁছয়। চিঠিটির সঙ্গে ছিল বাংলায় বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর একখানা চিঠির প্রতিলিপি। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউরোপ থেকে সাবমেরিনে পূর্ব-এশিয়া পাড়ি দেবার পূর্ব-মুহূর্তে রাঙাকাকাবাবু চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠিটিতে রাঙাকাকাবাবু তাঁর সহধর্মিণী ও কন্যা অনীতার কথা তাঁর মেজদাদাকে জানিয়েছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে গিয়ে কাকিমা ও অনীতার সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাদি করার ইচ্ছা বাবার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি মোটামুটি ঠিক করলেন যে যাবেনই। আমার ডাক্তারি পাশ করার পর প্রায় দেড় বছরের শিক্ষানবিশি ঐ বছরেই শেষ হবে। ঠিক হল শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি সঙ্গে যাব এবং দুই ছোট বোনকেও সঙ্গে নেওয়া হবে।

॥ ৭০ ॥

সেই ছাত্রাবস্থায় যে বিলেত গিয়েছিলেন তার পরে বাবা আর ইউরোপ যাননি। সেজন্য অনেকদিন থেকেই ইউরোপ ভাল করে দেখবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। জীবনের আট বছর তো জেলেই কেটে গেল। তার উপর আছে রাজনীতির ডামাডোল। সুযোগ-সুবিধা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা থেকে যখন এক মা ও কন্যার ডাক এল বাবা মনস্থির করে ফেললেন। মা তো সঙ্গে যাবেনই। আমিও সঙ্গে থাকব, ঘোরাঘুরির পরে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে থেকে যাব। সবদিক চিন্তা করে ছোট দুই বোনকেও সঙ্গে নেওয়া ঠিক হল। আমরা বেশ দল বেঁধেই ইউরোপ পাড়ি দিলাম। খরচ অনেক, তবে বাবার গত এক বছরের রোজগারে কুলিয়ে যাবে মনে হল।

তখনও জেট এরোপ্লেন চালু হয়নি। সেজন্য বিমানে যাত্রার সময় প্রায় ডবল লাগত। কলকাতা থেকে বোম্বাই হয়ে কায়রোয় কিছুক্ষণ থেমে আমরা রাতের অন্ধকারে রোমে পৌঁছলাম। এরোপ্লেন থেকে নামতেই দেখা গেল সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারদের বেশ ভিড়। যুদ্ধের পরে রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর দাদা—আর এক রাজনীতিবিদ চন্দ্র বোস—ইউরোপ সফরে এসেছেন এটা বেশ বড় খবর। তাছাড়া যুদ্ধের পরে ইউরোপের রাজনীতি কোন্ দিকে যাচ্ছে বাবাও সে-বিষয়ে খুবই কৌতূহলী, সাংবাদিকদের সঙ্গে এই যোগাযোগ তাঁর কাম্য। দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামতও খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ তিনি কেনই বা নেবেন না? বাবা প্লেন থেকে নামামাত্র ছবি তোলা শুরু হল এবং পরে বাবা যেখানেই যান সাংবাদিকরা ও ফোটোগ্রাফাররা তাঁকে ধাওয়া করেন।

যুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবু যে-হোটেলে ছিলেন, আমরা সেই হোটেলেই উঠলাম। বাবা ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং

ইউরোপীয় জীবনযাত্রার যা কিছু ভাল, সুস্থ ও আনন্দদায়ক তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ভোজনরসিক ছিলেন বলে ভাল ইউরোপীয় খাদ্য তিনি খুবই উপভোগ করতেন। কতকগুলি বিধিনিষেধ তিনি কিন্তু মানবেনই। যে-কোনো হোটেলের খাবার-ঘরে ঢুকেই তিনি ঘোষণা করে দিতেন, গো-মাংস ইত্যাদি আমাদের ধারে-কাছে আনবে না। আর পানীয় দেবে বিশুদ্ধ 'মিনারেল ওয়াটার'।

ইতালির মতো সুন্দর দেশ তো কমই আছে, তাছাড়া ঐতিহাসিক ও শিল্পকলার নিদর্শনে ইতালির প্রত্যেকটি শহর ঠাসা। যে-কোনো নতুন জায়গায় পৌঁছেই একটি নামকরা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে আলোচনা করে সব কিছু ঘুরে দেখবার একটা সুন্দর পরিকল্পনা বাবা করে ফেলতেন। যতক্ষণ পকেটে কিছু টাকা আছে, দরাজ হাতে খরচ করতে তাঁর আটকাত না। রোম থেকে নেপল্‌স। নেপল্‌স থেকে ছোট্ট সুন্দর দ্বীপ কাপ্রি, তারপর ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান—একটার পর একটা যেন স্বপ্নের নগরী। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, দেখার শেষও যেন হয় না। তার সঙ্গে আছে ইতালিয়ানদের সরব আনাগোনা, চিৎকার করে ঝগড়াঝাটি ও প্রাণোচ্ছল হাসি।

সাংবাদিকরাও ছাড়বে না। নানা পত্রিকা থেকে বাবার সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের তাগিদ। জানতে চায় ভারতবর্ষের পরিস্থিতিটা কেমন, বাবার মতামত ও ভবিষ্যতের কার্যক্রম কী। বাবা তো স্পষ্টবক্তা, যা বলার জোরের সঙ্গেই বলেন, বলেন দেশের নেতৃত্ব যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয়, বলেন ভারতবর্ষের চাই একটা মজবুত ঐক্যবদ্ধ সমাজবাদী সংগঠন।

সব বাদ দিয়েও আমাদের সামনে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ইতিহাসের সন্ধান। যুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুকে চিনত-জানত এমন কাকে পাওয়া যায়, কী করে তাঁর সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করা যায়। প্রথমেই খোঁজ করা হল পিয়েত্রো কোয়ারনির। কোয়ারনি ছিলেন ১৯৪১ সালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ইতালির রাষ্ট্রদূত। তাঁর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দেখা ও কথাবার্তা হবার পরেই তাঁর ইউরোপ যাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলে সেই সময় একটা ভাল রিপোর্ট রোমে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যখন রোমে, তখন কোয়ারনি ইতালির রাষ্ট্রদূত হয়ে প্যারিসে রয়েছেন। অন্য আর দু'একজনকে পাওয়া গেল যাঁরা হয় সেই সময় কাবুলে বা ইতালির পররাষ্ট্র দফতরে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের খুব ভাল লাগল।

১৯৩৩ সালে রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে এসেছিলেন একটি ইতালীয় জাহাজে এবং প্রথমেই নেমেছিলেন ইতালিতে। যদিও ইতালির পুলিশ ইংরেজ পুলিশের প্ররোচনায় কখনও কখনও তাঁকে বিরক্ত করেছিল, ইতালির সরকার মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। যে-কোনো স্বাধীন দেশের পররাষ্ট্রনীতি সেই দেশের জাতীয় স্বার্থে রচিত হয়। ভাবালুতা বা দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। মুসোলিনীর নেতৃত্বে সেই সময় ইতালি ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছিল। ভূমধ্যসাগর ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা—ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান জলপথ। স্বাভাবিকভাবেই ঐ এলাকায় ইতালি ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। রাঙাকাকাবাবু ঐ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে ইতালির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছিলেন। ইতালির সরকারও প্রতিদ্বন্দ্বীর শত্রু হিসাবে মুক্তিকামী ভারতবাসীদের সহানুভূতি ও সমর্থন চাইছিলেন। সেই সময় মুসোলিনীর সঙ্গে

রাঙাকাকাবাবুর বার-দুয়েক দেখা হয়েছিল এবং ইতালি-ভারত সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্বন্ধে তাঁদের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। অনেক পরে ১৯৪১ সালে দেশ থেকে অন্তর্ধানের পরে কাবুলে যখন রাঙাকাকাবাবু খুবই অসুবিধায় পড়েছিলেন তখন ইতালির পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে তাঁর পুরনো পরিচয় কাজ দিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিরিশের দশকে ইতালিতে ভারতের পক্ষে কিছু কাজ হয়েছিল। মুসোলিনী রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। ইউরোপের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের একটা বড় সম্মেলন ইতালিতে হয়েছিল, মুসোলিনী যার উদ্বোধন করেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪২ সালে রাঙাকাকাবাবুর বই ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়—ইতালির ভারত-বন্ধুদের উদ্যোগে এটা সম্ভব হয়েছিল।

ইতালি সফর সেরে আমরা যাব সুইট্জারল্যাণ্ডে। ইউরোপে ট্রেনে চেপে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেতে বেশ মজা লাগে, যদিও দূরত্ব বেশি নয়। সীমান্ত পেরোবার সময় রক্ষী ও পুলিশের কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার সব বদলে যায়, তারা ট্রেনের ভিতরে এসে কাগজপত্র দেখে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, বিদেশী হলে একটু বেশি খুঁটিয়ে দেখে। উত্তর ইতালির যে অঞ্চল দিয়ে আমরা সুইট্জারল্যাণ্ড ঢুকলাম সেটি খুবই সুন্দর—লেক, পাহাড় আর লম্বা-লম্বা সুড়ঙ্গ। সুইট্জারল্যাণ্ডের ছোট-ছোট গ্রাম ও শহরগুলিও ছবির মতো।

সুইট্জারল্যাণ্ডে আমরা প্রথমেই গিয়ে নামলাম জুরিখে। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এ· সি· এন· নাম্বিয়ার। রেল স্টেশনের উলটো দিকেই একটি হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। নাম্বিয়ার প্রায় সারা জীবনই ইউরোপে কাটিয়েছেন। সেই বিশ দশকে যখন বাবা দেশবন্ধুর কাগজে 'ফরওয়ার্ড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তখন নাম্বিয়ারকে খুঁজে বের করে ঐ কাগজের ইউরোপের প্রতিনিধি করেছিলেন। সেই সময় থেকে অনেকগুলি ভারতীয় কাগজে তিনি ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন। পরে রাঙাকাকাবাবু ও জওহরলাল যখন ইউরোপে যান তখন এই দুজনের সঙ্গে নাম্বিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। জার্মান ভাষার উপর তাঁর দখল অসাধারণ। এত সুন্দর করে কথাবার্তা বলেন এবং নানা ছোট বা বড় ঘটনার এত চমৎকার বিবরণ দেন যে, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাঁকে পেয়ে আমরা সকলেই খুব খুশি। যুদ্ধের সময় ইউরোপে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে রাঙাকাকাবাবুর পরেই ছিল নাম্বিয়ারের স্থান। ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার, ফ্রি ইণ্ডিয়া লিজন বা ফৌজ এবং জার্মান ও ইতালিয়ান সরকারের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে অনেক ভিতরের অজানা খবর নাম্বিয়ার বাবাকে ও আমাদের শোনাতে লাগলেন।

ছাত্রদের সম্বন্ধে বাবার একটা দুর্বলতা ছিল। বিদেশে যেখানেই যেতেন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া করতেন। জুরিখে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য বেশ কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। তাঁরা সকলেই এসে পড়লেন। সকলে মিলে হৈ-হৈ করতে করতে আমাদের সুইট্জারল্যাণ্ড সফর বেশ ভালভাবেই শুরু হল।

জুরিখ সুইট্জারল্যাণ্ডের পূব দিকের প্রধান শহর। ঐ অঞ্চলের লোকেরা জার্মান ভাষা বলে। রাজধানী বার্ন-এর এলাকাও জার্মান ভাষাভাষীর। পশ্চিমের সুন্দর শহর জেনিভা

অঞ্চলে ফরাসি ভাষা চলে, আর দক্ষিণে চলে ইতালিয়ান। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের আর একটি ভাষাও আছে। দেশটি ছোট হলেও সুইস্‌রা ছোটবেলা থেকেই দুটি বা তিনটি ভাষা শিখে ফেলে ও বলে। সরকারি কাজকর্মও তিনটি ভাষায় চালানো হয়। আমরা ভারতীয়রা ভাষা ভালই শিখতে পারি। যে সব ভারতীয় ছাত্রর সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশে আমাদের আলাপ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী ভাষা বেশ ভালই রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

জুরিখ থেকে বার্নে গিয়ে দেশের কন্‌সুলেটে কর্মরত অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম্বিয়ার তো ছিলেনই, আর ছিলেন রাষ্ট্রদূত ধীরুভাই দেশাই। সোলি বাটলিওয়ালা, আজাদ হিন্দ রেডিওর বালকৃষ্ণ শর্মা, পণ্ডিত ভট্ট প্রমুখ। শর্মার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হতেই চমকে গেলাম। মনে পড়ে গেল যুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ রেডিওতে তাঁর কণ্ঠস্বর কত শুনেছি। নাম্বিয়ার তো তাঁর কাহিনী বলেই চলেছেন, এখন তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বিনয়ী, স্বল্পভাষী শ্রীশর্মা। ইউরোপে যুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুর কাজকর্মের বেশ একটা সম্পূর্ণ ছবি তাঁরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাছাড়া এঁদের কাছ থেকে বাবা আমাদের ভিয়েনার কাকিমা ও অনীতা সম্বন্ধে অনেক খবর পেলেন এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে সব শুনলেন।

জুরিখে বাবার একটা বেশ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল। দেশের যুবকদের 'এয়ার-মাইনডেড' করার উদ্দেশ্যে এক উৎসাহী ভদ্রলোক গ্লাইডার ওড়ানো দেখাতে নিয়ে গেলেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বা চ্যাম্পিয়ন গ্লাইডার পাইলট আমাদের জন্য এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। গ্লাইডার প্লেনগুলি ঠিক এরোপ্লেনের মতোই তৈরি, তবে তার মধ্যে কোনো এঞ্জিন নেই এবং ওজনেও খুব হাল্কা। দড়ি দিয়ে জোরে টেনে এক প্রস্থ দৌড় করিয়ে বাতাসের সাহায্যে গ্লাইডারটিকে আকাশে তুলে দেওয়া হয়। চালক আকাশে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে সেটাকে কৌশলে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে আসেন। এরোপ্লেন চালানো শেখাতে গ্লাইডার চালানো খুবই সাহায্য করে, তাছাড়া যুবকদের পক্ষে এটা একটা ভাল স্পোর্ট হতে পারে। বাবার তো সবেতেই উৎসাহ, বললেন তিনিও গ্লাইডারে উড়বেন। বাবাকে প্যারাসুট সমেত লাইফ-বেল্ট পরিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাইলট তো বাবাকে নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন। আমাদের তো চিন্তাই হচ্ছিল। যাই হোক, বাবার গ্লাইডার ফ্লাইং নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হল।

বরফে ঢাকা কয়েকটি পর্বত ভ্রমণের পরে আমরা জেনিভায় পৌঁছলাম। জেনিভায় নানা দ্রষ্টব্য ছাড়াও আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের দফতর দেখতে গেলাম। বিরাট প্রাসাদটি যুদ্ধের আগে ছিল লিগ অব নেশনস্‌-এর সদর দফতর। তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু ভারতের স্বাধীনতার দাবি পেশ করবার জন্য লিগ্ অব নেশনস্‌-এর দরজায় দরজায় ধর্না দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু ফল হয়নি। বড়-বড় রাষ্ট্রগুলি তাঁদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও ঝগড়াঝাটি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড সফরের শেষ পর্যায়ে আমরা জুরিখে ফিরে এলাম। সেখান থেকে আমরা চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ যাব।

॥ ৭১ ॥

সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে আমাদের চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে যাবার কথা। তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু কয়েকবার চেকোস্লোভাকিয়া গিয়েছেন। কার্লসবাদে চিকিৎসার জন্য থেকেছেন। তাছাড়া ঐ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর বেশ অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। সেই সময়কার চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি বেনেশের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৪-এ প্রাগে ভারত-চেক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রাঙাকাকাবাবু ছিলেন অন্যতম। প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ভারতপ্রেমিক অধ্যাপক লেসনি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। খবর পাওয়া গেল যে, অধ্যাপক লেসনি ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরপদে এখনও আছেন। বাবা তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য খুবই উদ্গ্রীব ছিলেন।

জুরিখ থেকে এরোপ্লেনে আমরা প্রাগ পৌঁছলাম। প্রাগ এয়ারপোর্টে আমাদের পাশপোর্ট পরীক্ষা ও জিনিসপত্র তল্লাসি করতে গিয়ে সেখানকার পুলিশ দিশেহারা হয়ে পড়ল। আমাদের অনেকক্ষণ আটকেও রাখল। তিন মহিলার বাক্সে এতগুলো শাড়ি দেখে তারা কেবলই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল এবং বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, এত লম্বা লম্বা-কাপড় এনেছেন কেন, এগুলো দিয়ে কী হবে ?

প্রাগের একটি পুরানো কিন্তু ভাল হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। শহরে ঢুকে পথে চোখে পড়ল এখানে-ওখানে বিশাল বিশাল ছবি আর লাল পতাকা ও ফেস্টুনের ছড়াছড়ি। ঐ বছরেরই গোড়ার দিকে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। সেজন্য পার্টির প্রধানের মুখ বড় বড় করে শ্লোগান সমেত জনসাধারণকে দেখানো হচ্ছে। ইতালি ও সুইট্জারল্যাণ্ডের পর খাওয়া-দাওয়ার দৈন্য ও অব্যবস্থা দেখে আমরা দমে গেলাম। তাছাড়া সাধারণভাবে আমরা লক্ষ করলাম যে, লোকজন বড় একটা হাসে না এবং কথাবার্তাও বেশি বলতে চায় না। এমনিতেই কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর লোকজনের, এমনকী হোটেলের কর্মীদেরও ঠাণ্ডা ব্যবহার ! 'সাইট-সিয়িং' করতে গিয়েও নজর করলাম, সরকারি গাইডরাও যেন কেমন নিরুৎসাহ, দায়সারা মতন করে নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে। ইতালির গাইডরা ছিল প্রাণোচ্ছল। ঐতিহাসিক সব জায়গা দেখাতে তাদের কী উৎসাহ, তাদের কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে দর্শকেরা মুগ্ধ।

তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিলেন তখন সব দিক দিয়েই তিনি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত, ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে ঐ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহানুভূতি ; দ্বিতীয়ত, ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ; তৃতীয়ত, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে চেকদের কৃতিত্ব ; চতুর্থত, মানুষের সেবায় ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর সার্থক প্রচেষ্টা—যেমন কার্লসবাদে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবু বেশি কাউকে না জানিয়ে প্রাগে গিয়েছিলেন। নাম্বিয়ারকে তিনি বলেছিলেন,ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারা তো তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। নাৎসিরা অধিকৃত দেশে কী ধরনের আচরণ করে তিনি নিজের চোখে দেখতে চান। দেখে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন

পরদেশগ্রাসী শাসকদের চেহারা একই। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান অধিকর্তা আমাদের দেশের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভেরই প্রতিরূপ।

যাই হোক, আগে থেকে যোগাযোগ করে বাবার সঙ্গে আমরা এক সকালে প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হলাম। প্রোফেসর লেসনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রদ্ধা করবার মতো প্রবীণ, বিদ্বান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোক। বহু বছর আগে শান্তিনিকেতনে তিনি বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ও বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণী যেসব ব্যক্তিকে শান্তিনিকতনে ডেকে এনেছিলেন জ্ঞান ও কৃষ্টির এক বিশ্বমেলা বা বিশ্বভারতী স্থাপনের জন্য, লেসনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র আমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। এমনকী মহেঞ্জোদারোয় নতুন কী কী আবিষ্কৃত হল, প্রাচীন লিপির মানে খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা—তিনি জানতে চাইলেন। বাবা সব প্রশ্নের জবাব খুঁজেও পাচ্ছিলেন না। তবে প্রোফেসর লেসনিকে আশ্বাস দিলেন যে, দেশে ফেরার পর তাঁকে বিস্তৃতভাবে সব জানাবেন।

লেসনির কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা গেল রাঙাকাকাবাবুকে কী স্নেহের চোখে তিনি দেখতেন। এর একটা বিশেষ কারণও খুঁজে পাওয়া গেল। চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করার পর জার্মানরা অধ্যাপক লেসনিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর পরিবারের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁকে কোনো উপায়ে মুক্ত করতে না পারলে তিনি বাঁচবেন না। সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে আছেন খবর পেয়ে লেসনি-পরিবার তাঁর কাছে চিঠি দিলেন। তিনি জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-বিষয়ে যেন কথাবার্তা বলেন। চিঠি পাঠাবার কিছুদিন পরেই প্রোফেসর লেসনি মুক্তি পান। তাঁর পরিবারের লোকেরা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথা স্মরণ করেন।

হোটেলে এক সন্ধ্যায় আমরা খেতে যাবার তোড়জোড় করছি। এক ভারতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বাবাকে বললেন, তিনি সাংবাদিক, ১৯৪৬-এ তাঁর তাইওয়ান দ্বীপে যাবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি সেখানে রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে যা-কিছু জানতে পেরেছেন বাবাকে জানাতে চান। আরও বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে তিনি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। সর্দারজি তাঁকে বলেছেন সুযোগ পেলেই তিনি যেন বাবাকে সব কথা জানান। নাম হারীন শাহ। বাবা তাঁকে ডিনারের পর তাঁর ঘরে আসতে বললেন। আমাকে বললেন আমি যেন সেই সময় উপস্থিত থাকি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে হারীন শাহ ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে তাইপের বিমান-দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি বলে গেলেন। বোঝাই গেল ভদ্রলোক বিমান-দুর্ঘটনার ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, ঐ কাহিনী শুনতে বাবার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মুখ থমথমে ও লাল হয়ে গিয়েছিল। তবে যে-কোনো কারণেই হোক বাবা হারীন শাহকে বিশেষ কোনো প্রশ্ন বা জেরা করেননি। আমিও কোনো প্রশ্ন তুলিনি। কথা শেষ করে ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর বাবা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি কী আর বলি। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, যত সব সাজানো গল্প। আজগুবি কথা। আপনি শুয়ে পড়ুন। বাবা সেই রাতে ঘুমিয়েছিলেন কিনা জানি না। আমার মাথাও অনেকক্ষণ ধরে ঝিমঝিম করেছিল।

প্রাগ থেকে আমরা যাব ভিয়েনায়, বাবা-মার ইউরোপ সফরের প্রধান গন্তব্যস্থান।

বসুবাড়ির শিরোমণি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সহধর্মিণী ও শিশুকন্যার প্রথম দেখা হবে। আমাদের সকলের মন গভীর আবেগ ও চাপা বেদনায় ভরা। আমাদের প্লেন যখন ভিয়েনায় পৌঁছল তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কথাই ছিল আমাদের কাকিমা এয়ারপোর্টে আসবেন না। এয়ার টারমিনালে বা এয়ারলাইনের শহরের অফিসে অপেক্ষা করবেন। ভিয়েনায় পৌঁছেই আমাদের সকলের একই চিন্তা—এই প্রথম সাক্ষাৎটি কেমন হবে। আমি তো প্লেন থেকে নামার সময় অন্যমনস্ক হয়ে বাবার দেওয়া নতুন ক্যামেরাটি ফেলে চলে এলাম। বাসে চেপে অন্ধকারের মধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার টারমিনালে পৌঁছতে যেন অনেকক্ষণ কেটে গেল। এয়ার টারমিনালের হলে ঢুকতেই আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শান্ত ও স্নিগ্ধ চেহারার ছোটখাটো এক ইউরোপীয় মহিলা ধীর পদক্ষেপে বাবার দিকে এগিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরস্পরকে ছবিতে তো দেখাই আছে। প্রথমেই তিনি খুব নম্রতার সঙ্গে একখানি খাম বাবার হাতে দিলেন। তার মধ্যে ছিল ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর মূল চিঠিটি। চিঠিটি একবার দেখে নিয়েই বাবা বুকের পকেটে সেটি রাখলেন। চিঠির প্রতিলিপি বাবা অনেক আগেই পেয়েছিলেন, খুঁটিয়ে পড়বার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দুজনেই পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর কম কথায় কুশল-বিনিময় হল। বসুবাড়ির দুই বধূ কথা না বলে পরস্পরের হাত ধরে রইলেন। তাঁদের মনের কথা মনেই রয়ে গেল। বাবা অনীতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আশা করছিলেন তাকেও সেইদিনই দেখতে পাবেন। শুনলেন সাগরপার থেকে তার আত্মীয়রা আসছেন শুনে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে। কাকিমা আমাদের দিকে ঘুরে এসে এমনভাবে কথা বললেন যেন পরিচয় অনেক আগেই হয়ে গেছে। বাবার দিকে ইঙ্গিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ইট্ ইজ্ হি প্লাস টেন ইয়ার্স!' ততক্ষণে আমার খেয়াল হয়েছে ক্যামেরাটি প্লেনে ফেলে এসেছি। টেলিফোনে এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করা হল, কোনো ফল হল না।

হোটেলে পৌঁছে পরের দিনের প্রোগ্রাম ঠিক হল। হোটেলটি ভিয়েনার কেন্দ্রে। আমাদের যেতে হবে শহরের উত্তর প্রান্তে, যেখানে একটি ছোট ফ্ল্যাটে অনীতা তার মা ও দিদিমার সঙ্গে থাকে। পরের দিন সকালবেলাটা বিশ্রামের জন্য রইল। দুপুরে আমরা সকলে মিলে কাকিমার বাড়িতে যাব। অনীতাকে তিনি প্রস্তুত করে রাখবেন।

সেই রাতে তাঁকে একলা বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে বাবা ব্যস্ত হলেন। যদিও যুদ্ধের পর তিন বছর কেটে গেছে, পথঘাটের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানা কথা তখনও শোনা যেত। ভিয়েনা শহরটিকে চার ভাগ করে চারটি শক্তি আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দখল করে রেখেছে। দখলকারীরাই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ভিয়েনাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেক অসুবিধা। তবে এই শান্ত ও শক্ত মহিলাটি তো গত পাঁচ বছর একলাই এক গুরুভার বহন করে এসেছেন। তাঁর পক্ষে একলা বাড়ি ফিরে যাওয়াটা এমন কী বড় কথা!

॥ ৭২ ॥

ভিয়েনার অ্যাসটোরিয়া হোটেলে আমার মা এমিলি-কাকিমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসুবাড়ির বধূরূপে বরণ করে নিলেন। বাবার সঙ্গে আলোচনা করেই ব্যাপারটা হয়েছিল। নিজের একটি ভাল বেনারসি শাড়ি তাঁকে উপহার দিলেন এবং নিজের হাত থেকে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি খুলে ওঁর হাতে পরিয়ে দিলেন।

ভিয়েনা পৌঁছবার পরের দিন আমরা সকলে অনিতাকে দেখতে যাব ঠিক ছিল। কাকিমা ঘর-বাড়ি গুছিয়ে নেবার জন্য কিছু সময় নিয়েছিলেন এবং সে-জন্য সকালে অনিতাকে এক প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে রেখেছিলেন। আমরা যখন ট্যাক্সি করে কাকিমার ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম তখনও অনিতা বাড়ি ফেরেনি। বাবাকে দেখে তো অনিতার দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। তিনি ইংরেজি বলেন না। পরে বুঝলাম, বাবার সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর চেহারার সাদৃশ্য দেখে তিনি খুবই অভিভূত হয়েছিলেন এবং অন্তরের ব্যথা চেপে রাখতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরে দু-বছরের অনিতা লাফাতে-লাফাতে বাড়ি ফিরে এল। তাকে বলা ছিল যে, সাগরপার থেকে তার জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা ও ভাই-বোনেরা এসেছেন। সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসিমুখে সে একে-একে সকলের সঙ্গে আলাপ করল। বাবার মুখের দিকে সে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বাবা যখন তাকে আদর করছিলেন মনে হচ্ছিল, সে যেন জীবনে হঠাৎ নতুন কিছুর স্বাদ পেয়েছে।

অনিতার মুখ ও হাসির মধ্যে আমরা সকলেই রাঙাকাকাবাবুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। সে তখনও ইংরেজি বলে না। জার্মান ভাষায় সে ক্রমাগতই নানারকম প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। কাকিমা সে-সব প্রশ্ন করে আমাদের ইংরেজিতে তর্জমা করে দিচ্ছিলেন। আমাদের উত্তরগুলো আবার জার্মান ভাষায় অনিতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

অনিতার দিদিমা ছিলেন ঠিক আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমাদেরই মতো অতিথি-বৎসল। ক্রমাগতই আমাদের নানাভাবে আপ্যায়ন করার চেষ্টা, বারে-বারেই খাবার ও কফি পরিবেশন। তাঁর হাতের রান্না ছিল চমৎকার এবং সকলকেই খাইয়ে তাঁর কী আনন্দ। আমরা না বুঝলে কী হবে, জার্মান ভাষায় অনর্গল তিনি কিছু না কিছু বলে যাচ্ছিলেন।

ভিয়েনা ঘুরে দেখবার সময় কাকিমা আমাদের সঙ্গী। সারাদিন ঘুরে বেড়ানো, এখানে-ওখানে খাওয়া আর কত কথা! ভিয়েনা ছিল রাঙাকাকাবাবুর প্রিয় শহর। তিরিশের দশকে তিনি ভিয়েনায় অনেকদিন কাটিয়েছেন, এখানেই তাঁর অপারেশন হয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা হল যে, ভিয়েনায় বসেই তিনি তাঁর বই 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' লিখেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি একজনকেই নাম করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন—'ফ্রয়েলাইন ই শেঙ্কল'। যুদ্ধের সময়ও তিনি ভিয়েনায় এসেছেন। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে তিনি শেষবার এসেছিলেন, অনিতা তখন নবজাত শিশু। অনিতা খানিকটা বড় হয়ে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেছে, কেন তিনি তাদের ফেলে চলে গেলেন। বড় হয়ে এর উত্তর সে পেয়েছে।

ঠিক হল, অনিতার জন্মদিনে আমাদের এক গ্রুপ ফোটো তোলা হবে। আরও ঠিক হল যে, ১৯৩৪ সালে যে স্টুডিওতে রাঙাকাকাবাবুর ছবি তোলানো হয়েছিল সেই স্টুডিওতেই আমরা ছবি তোলাব। জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল এবং আমাদের ইচ্ছাও পূর্ণ হল। দুটি

তারিখের আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া গেল। রাঙাকাকাবাবু 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের ভূমিকায় তারিখ বসিয়েছেন ভিয়েনা ২৯ নভেম্বর। অনিতার জন্ম ভিয়েনায় ২৯ নভেম্বর।

ভিয়েনায় বসে ঘোরাফেরার মধ্যেও বাবা কাকিমা ও অনিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন এবং তারই মধ্যে কাকিমার মনের কথা জেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন। মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছিল যে, বাবা তাঁদের দেশে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবেন এবং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে তাঁদের নিয়ে আসবেন। দেশে ফেরার পরে বাবা এ-বিষয়ে কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অকাল-মৃত্যু সব পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পরে কাকিমাও ভারতে আসার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী থেকে অনিতাকে বড় করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বসুবাড়ির এক পুরনো বন্ধু শ্রীমতী হেডি ফুলপ-মিলার ভিয়েনায় বাসিন্দা। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। আমরা সকলে মিলে ভিয়েনায় রাশিয়ান অধিকৃত এলাকায় তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর প্রকাণ্ড বসার ঘরের একাংশ ভারতীয় কায়দায় সাজানো। আমাদের দর্শন ও সঙ্গীতে তাঁর গভীর অনুরাগ। রাঙাকাকাবাবু ও দিলীপকুমার রায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ঐ দুজনের সম্বন্ধে তাঁর কত স্মৃতি. অনেক কথা বলেন কিন্তু কথা ফুরোয় না। ভিয়েনার বিখ্যাত সার্জেন প্রফেসর ডেমেল, যিনি ১৯৩৫-এ রাঙাকাকাবাবুর ওপর অপারেশন করেছিলেন, তাঁকে খুঁজে বের করা হল। তিনি খুব গর্বের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর একটা কপি আমাদের দেখালেন যেটা রাঙাকাকাবাবু তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। জার্মানির 'ফ্রি ইণ্ডিয়া লিজন' বা আজাদ হিন্দ ফৌজের এক প্রাক্তন অফিসার ডাক্তার মদন ভিয়েনায় আমাদের খুব দেখাশুনো করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ, তাঁর শিক্ষক ও ভিয়েনার সবচেয়ে নামকরা বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর পিলাটকে দিয়ে তিনি বাবার চোখ পরীক্ষা করিয়ে দিয়েছিলেন।

তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু ভিয়েনায় ভারত-অস্ট্রিয়া সোসাইটি গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঐ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেই সময়কার রাঙাকাকাবাবুর এক পুরনো বন্ধু অটো ফাল্‌টিস বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যুদ্ধের সময়ও তিনি জার্মান সরকারের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনায় সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বাবা ভিতরকার কিছু-কিছু খবর সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ফালটিসসাহেব রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কিছু দলিলপত্র ও ছবির একটি সংগ্রহ দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানায় দান করেন।

একদিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে দুই বোনের সঙ্গে একটু বেড়াচ্ছি, এমন সময় লম্বাচওড়া এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হিন্দুস্থানিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে দিলেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তো তিনি আমাদের ছাড়বেন না, হোটেলে এসে বাবার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি আসলে অস্ট্রিয়ান। নাম ফিশার, কিন্তু দাবি করতেন যে, তিনি ভারতীয়। নাম নিয়েছিলেন রামচন্দ্র শর্মা। এক অদ্ভুত চরিত্র। নানা ভাষার ওপর তাঁর আশ্চর্য দখল, একটার পর একটা ভাষা অনায়াসে বলে যেতে পারেন। তাছাড়া ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা। তিনি তো আমাদের সঙ্গে

My dearest brother Sisir,

I am sending you my fondest love and many kisses. When are you coming again to Vienna and will you then speak in German to me?

Yours v. affly

Anita.

P.S. Mr. Madan asked me to convey his best greetings to you.

আমাকে লেখা অনিতার চিঠি

লেগেই রইলেন। পরে ভারতে এসে তিনি সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক করেন এবং আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে মা'র কাছে আশ্রমবাসী হবার আগে গৃহীর শেষ খাওয়া খেয়েছিলেন। ভদ্রলোকের ইতিহাসটি আরও কৌতূহলোদ্দীপক। যুদ্ধের সময় ভারতীয় বলে দাবি করে সব বাধা অতিক্রম করে তিনি 'ফ্রি ইণ্ডিয়া লিজন'-এ যোগ দেন। ধরা পড়ার পরে তিনি ইংরেজদেরও বেশ বোকা বানিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় না ভারতীয় নন এই সমস্যার সমাধান করতে ইংরেজরা হিমসিম খেয়েছিলেন।

কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাবার পরে আমাদের ভিয়েনা ছাড়বার দিন এগিয়ে এল। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে এক নতুন যে যোগসূত্র স্থাপিত হল তা চিরকালের হয়ে রইল। দূরদেশের ঐ ছোট্ট বোনটি আমাদের সকলের হৃদয় জয় করে নিল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা অচিরেই যেন আমরা বোনটিকে কাছাকাছি পাই। ঐ আশা মনে ধরে আমরা এক সকালে ভিয়েনা থেকে রেলপথে প্যারিস রওনা হলাম।

ভিয়েনা ডাক্তারি-শিক্ষার এক পীঠস্থান। রাঙাকাকাবাবু একটা কথা প্রায়ই বলতেন।

তিনি বলতেন, ভারতীয় ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যায়, তাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে, বহির্বিশ্ব মানেই নাকি ইংল্যাণ্ড। তিনি চাইতেন, ভারতীয় ছাত্ররা ইউরোপের অন্যান্য দেশে গিয়ে যেন আসল ইউরোপীয় কৃষ্টির স্বাদ নেয়। আমি ঠিক করেছিলাম যে, বিদেশে আমার শিক্ষার অন্তত অর্ধেকটা আমি ইউরোপের কোনো দেশে কাটাব। যখন দেখলাম যে, ভিয়েনায় আমাদের ঘর আছে তখনই ঠিক করলাম ভিয়েনার বিশ্ববিখ্যাত শিশু-হাসপাতালে কিছুদিন আমি শিক্ষাগ্রহণ করবই। বাবা-মা ইংল্যাণ্ডে আমাকে রেখে দেশে ফিরে গেলেন এবং প্রবাসের প্রথম বছরটা আমার সেখানেই কাটল। পরের বছরটা যাতে আমি সুইজারল্যাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ায় শিক্ষানবিশি করতে পারি তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেলাম।

আমার ইচ্ছা পূর্ণ হল ১৯৫০ সালে যখন আমি ভিয়েনা অ্যাকাডেমি অব মেডিসিন-এ ভর্তি হলাম। ছোট্ট অনিতার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল—আমি ইংল্যাণ্ডে বসে জার্মান ভাষা শিখে নেব এবং সে ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করে নেবে। মোটামুটিভাবে আমি জার্মান শিখতে পেরেছিলাম কিন্তু অনিতার কাছে আমি হেরে গেলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই সে আমাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল।

॥ ৭৩ ॥

ভিয়েনা থেকে প্যারিস ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ইউরোপের একটা বিখ্যাত ট্রেন ছিল ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস। যুদ্ধের আগে প্যারিস থেকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল পর্যন্ত পাড়ি দিত। এখন ভিয়েনার পর আর যায় না। এক সকালে আমরা ঐ ট্রেনে ভিয়েনা থেকে রওনা হলাম। ভিয়েনাতে আমাদের মালপত্র অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। শৌখিন সব রকম জিনিসপত্রে বাবার খুব শখ। খবর পেলেন যে ভিয়েনার কোনো এক নবাব-পরিবারের অতি উৎকৃষ্ট চিনামাটির বাসনপত্র বিক্রি হচ্ছে। দেখে পছন্দ হয়ে গেল এবং বাসনের এক বিরাট বহর কিনে ফেললেন। ভিয়েনাতে সেগুলি একসঙ্গে প্যাক করানো সম্ভব হল না। সুতরাং অসংখ্য বাক্সে সেগুলি ভরে নিয়ে আমরা ট্রেনে চাপলাম। পুরো যাত্রাটা আমরা সকলে বাক্স-পরিবৃত হয়ে রইলাম, মাথার ওপরে পায়ের নীচে দু'পাশে কেবলই বাক্স। প্যারিস পৌঁছে বাসনপত্রগুলি জাহাজে করে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হল।

প্যারিস ইউরোপের প্রথম সারির শহরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন—ইতিহাসে, ভাস্কর্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে। ভিয়েনা ও প্যারিসের ঐতিহাসিক মিউজিয়ামগুলি দেখার পরই কলকাতায় ঐ ধরনের মিউজিয়াম গড়ে তোলার স্বপ্ন আমি দেখতে আরম্ভ করি। বিশেষ করে প্যারিসের কাছেই ভার্সায়ে নেপোলিয়নের জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছিলাম।

প্যারিসের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ শহরে 'সাইট-সিয়িং' করতে করতে বেশ ইতিহাস পড়া হয়ে যায়। আমাদেরও তাই হল। তাছাড়া আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অনেক সূত্র ধরে আমরা খোঁজখবর করতে লাগলাম। এমন বর্ষীয়ান দু-চারজনকে পাওয়া গেল যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে এঁরাই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে

যোগ দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক রোমা রোলাঁর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর সুইজারল্যাণ্ডে দেখা হয় ১৯৩৫ সালে। রোলাঁ ছিলেন সাধক প্রকৃতির লোক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও দর্শনে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে যে কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর হৃদ্যতা হয়েছিল তাঁদের একজন ছিলেন রোলাঁ। বাবাও ছিলেন রোলাঁর ভক্ত। মনে আছে, রোলাঁর লেখা খানদুয়েক বই কার্শিয়ঙে অন্তরীণ থাকার সময় তিনি আমাকে পড়িয়েছিলেন।

খবর পাওয়া গেল রোলাঁর স্ত্রী প্যারিসে আছেন। বাবার সঙ্গে আমরা একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন যে, রোলাঁ নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন এবং সেগুলি সযত্নে রাখা হয়েছে, ভাল করে সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হবে। বছর-কয়েক বাদে রোমে রোলাঁর ডায়েরি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হলে দেখলাম, রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনি খুব সুন্দর করে লিখে রেখেছেন। এক প্রবীণ ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কনিষ্ঠতম নেতাকে কী চোখে দেখেছিলেন সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মনে হয়েছিল গভীরভাবে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান—তাঁর বই পড়ে রোলাঁর আগেই এই ধারণা হয়েছিল। রোলাঁর মতে রাঙাকাকাবাবু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একজন সত্যিকারের রাষ্ট্রনীতিবিদ যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনাপ্রবাহ বিচার করতে পারেন। রাঙাকাকাবাবু তাঁকে খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, দরকার হলে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ নিতে প্রস্তুত আছেন। আরও বলেছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের ভাল সুযোগ এনে দিতে পারে। রোমা রোলাঁর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন।

আগে কখনও অপেরা দেখিনি। সকলে মিলে প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব মিউজিক-এ গেলাম। পৌঁছতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অপেরা শুরু হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করতে হল। ইউরোপীয় সঙ্গীত বা নাচের অনুষ্ঠানে যখন-তখন ঢোকা যায় না। বিরতির জন্য অপেক্ষা করতে হয় যাতে অনুষ্ঠানের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। যখন অনুষ্ঠান চলতে থাকে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না।

আমরা যখন প্যারিসে তখন সেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন চলছে। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা আঁদ্রে ভিশিনস্কি বেশ আসর গরম করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ ও সুবক্তা। বাবা ওঁর বক্তৃতা শুনতে খুবই উৎসুক ছিলেন। দর্শক-টিকিটের ব্যবস্থা হল এবং আমরা সকলে মিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনের এক প্রস্থ শুনে এলাম। ভিশিনস্কি রুশ ভাষায় বলেছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি তর্জমার ব্যবস্থা ছিল। আমরা ইয়ারফোন লাগিয়ে তাঁর বক্তৃতার ইংরেজি বয়ান শুনলাম। এক নতুন অভিজ্ঞতা হল।

প্যারিস থেকে আমরা যাব আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে। আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের এক বিশেষ সম্পর্ক। তাঁরা আমাদের সংগ্রাম-সাথী। একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা স্বাধীন হয়েছেন। রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৬-এর গোড়ায় ঐ দেশে গিয়েছিলেন। ভারত ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে নতুন করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। রাঙাকাকাবাবু দুঃখ করে বলতেন, কত ভারতীয় লণ্ডনে যায় কিন্তু ডাবলিনে যায় না।

সেখানে গেলে যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন এমন সব নরনারীকে তাঁরা রক্তমাংসে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

১৯৩৬-এ রাঙাকাকাবাবু ফ্রান্স থেকেই আয়ারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। আমরাও সেইভাবে গেলাম। জাহাজ থেকে নেমে তিনি প্রথমেই যান কর্ক শহরে। কর্কের মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনি আমাদের যতীন দাসের মতো ইংরেজদের জেলে অনশন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাঙাকাকাবাবু ম্যাকসুইনির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং শহীদদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আয়ারল্যাণ্ডের সফর আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের কর্কে যাওয়া হয়নি। কারণ, আমরা আকাশপথে গিয়ে সোজা ডাবলিনে নেমেছিলাম। ডাবলিনে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ডি ভ্যালেরার তিনবার দেখা ও আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ডি ভ্যালেরা তখন আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি। এক বছর আগেই তিনি রাঙাকাকাবাবুর বই 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' পড়েছিলেন। অন্য দিকে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাযুদ্ধের সব কথা ও খবর রাঙাকাকাবাবুর নখদর্পণে ছিল। সুতরাং আগে দেখা না হলেও দু'জনের মধ্যে আত্মিক যোগ ছিল বলা যায়।

ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লিগ রাঙাকাকাবাবুর সম্মানে এক বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন। সভানেত্রী ছিলেন ম্যাডাম গন্ ম্যাকব্রাইড। ধন্যবাদ দিতে উঠে অ্যালেক্স লিগ সুন্দর এক মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, কবে ডাবলিন শহরের কলকাতার মতো সৌভাগ্য হবে যে, ডাবলিনের মেয়রকে গ্রেট ব্রিটেনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেই সময় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্রকে ইংল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

জানুয়ারির কনকনে শীতের মধ্যে আমরা ডাবলিনে পৌঁছলাম। ইউরোপের অন্যান্য শহরের তুলনায় সেখানকার ঘরবাড়ি একটু পুরনো ধরনের বলে মনে হল, সাধারণভাবে চাকচিক্য কম। তবে লোকজনের ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

ডি ভ্যালেরা বাবার সঙ্গে 'ডয়েল' বা পার্লামেণ্ট হাউসে দেখা করলেন। সঙ্গে আমরাও ছিলাম। অনেক কথা হল। রাঙাকাকাবাবুর কথা ডি ভ্যালেরা গভীর আবেগের সঙ্গে স্মরণ করলেন। আমি যথারীতি ছবিটবি তুললাম। তাঁর সই করা একখানা ছবি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ম্যাডাম গন ম্যাকব্রাইড তাঁর বাড়িতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রন করলেন। আমরা আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ মহীয়সী মহিলাকে দেখবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে ছাত্রাবস্থায় প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ম্যাডাম গন তখন সেখানে নির্বাসনে ছিলেন। ম্যাডান গনকে দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। অনেক বয়স হয়েছে কিন্তু কথাবার্তা খুব পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি উজ্জ্বল ও মুখে হাসি লেগেই আছে। মনে হল দুই বন্ধুদেশের দুই স্বাধীনতাসংগ্রামী-পরিবারের এক মিলন-অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন শোন ম্যাকব্রাইড যিনি তখন আয়ারল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ম্যাডাম গনের একটি কথা মনে আছে। বলেছিলেন, দেখ, আমরা এই দুই দেশের লোক স্বাধীনভাবে সাধারণ সুখী জীবনযাপন করতে চাই। ধনদৌলতের আতিশয্য চাই না, বিলাসিতাও চাই না, এটাই বড় কথা, নয় কি?

আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি শোন ও-কেলি বাবাকে রাষ্ট্রপতিভবনে আমন্ত্রণ জানালেন।

ঠিক সেই সময়েই বাবা ডাবলিনের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নেমন্তন্ন করে বসে আছেন। অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য আমি হোটেলে থেকে গেলাম। রাষ্ট্রপতি দর্শন হল না। রাষ্ট্রপতি ও-কেলি ছিলেন এক প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং রাঙাকাকাবাবুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। প্রথমেই বাবাকে বললেন যে, ভারতের বসু-পরিবারের যে কোনো ব্যক্তির জন্য আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি-ভবনের দরজা সব সময়েই খোলা। রাষ্ট্রপতি নিজেই ঘুরে ঘুরে রাষ্ট্রপতি-ভবনটি দেখালেন। তিনি নিজে এক কোণে দুটি ঘর নিয়ে থাকেন, বাড়িটির বড়-বড় ঘরগুলি জুড়ে আছে একটি সংগ্রহশালা, যেখানে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীরদের বড়-বড় ছবি সারি-সারি টাঙানো রয়েছে।

ডাবলিনের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের মিলন-সন্ধ্যাটি বেশ ভালই কাটল। এর পরে আমরা যাব আমাদের শেষ গন্তব্যস্থান লণ্ডনে। সকালে যখন প্লেন ছাড়ল তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার কিন্তু লণ্ডনের ওপরে এসে আমরা ক্রমাগতই ঘুরপাক খেতে লাগলাম। এত ঘন কুয়াশা যে, প্লেন নামতেই পারছিল না। বাইরে এসে দেখি চারিদিক ঘন অন্ধকার ও ঝির-ঝির বৃষ্টি। এই হল লণ্ডন।

॥ ৭৪ ॥

লণ্ডনে পৌঁছে দেখলাম বাবার মনের ভাবটা একেবারে বদলে গেছে। যেন বহুদিন পরে পুরনো ও চেনা এক জায়গায় ফিরে এসেছেন। কোথায় কী আছে, কী অবস্থায় আছে, কতটা বদলেছে, জানবার ও দেখবার জন্য কী কৌতূহল। লণ্ডনের উত্তরে হ্যাম্পস্টেড এলাকায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ব্যারিস্টারি পড়বার সময় বাবা থাকতেন। সেই সময় তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, কত যে পিকচার পোস্টকার্ড তখন মাকে পাঠিয়েছেন তার হিসাব নেই। একদিন আমাদের সকলকে নিয়ে নিজের পুরনো দিনের সেই বাসস্থান খুঁজতে বেরোলেন। আমরা খুঁজছি তো খুঁজছিই। কিছুতেই ৮৬ সাউথ হিল পার্ক-এর বাড়ি পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পাড়ার এক ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন। বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে বললেন যে, ও, ঐ বাড়িটা তো যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

লণ্ডনে আমাদের হোটেলে সব সময়েই ভিড়। সাংবাদিকরা তো আছেনই—ভারতীয় ও বিদেশী, আছেন ছাত্র-ছাত্রীর দল। তার উপরে আছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। কেউ ডাক্তার, কেউ আইন-ব্যবসায়ী, কেউ ব্যবসায়ী। এত ভারতীয় ইউরোপের অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। তাছাড়া আছে বেশ কতকগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান যেগুলি অনেকদিন ধরে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে কাজ করে এসেছে। যেমন স্বরাজ হাউস, ইণ্ডিয়া লিগ, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান মজলিস প্রভৃতি। প্রবাসী ভারতীয় সাংবাদিকদের ছিল ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। একটার পর একটা সভা হতে লাগল। একটি বড় সভায় সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ ইংরেজ রাজনীতিবিদ ফেনার ব্রকওয়ে, যিনি সারা জীবন ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মুক্তির জন্য লড়েছেন। বাবা তাঁর বক্তৃতায় দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা করলেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন একটি ভোজসভার আয়োজন

করলেন। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন ও স্বরাজ হাউসও অনুষ্ঠান করলেন। বাবা তখন দেশে একটা ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদল গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ঐ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। আমাদের হোটেলেই বিদেশী সাংবাদিকদের একটা বড় কনফারেন্স হল। বাবা প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্নের সোজাসোজা জবাব দিলেন। প্রবাসী ছাত্রছাত্রীরা সবসময়েই বাবাকে ঘিরে থাকত, তিনিও যথাসম্ভব তাদের আপ্যায়ন করতেন।

সেই সময় লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। তিনি একদিন আমাদের ইণ্ডিয়া হাউসে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। ইউরোপ ভ্রমণের সময় বাবা আমাদের বিদেশী দূতাবাসগুলির, বিশেষ করে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের খোলাখুলিভাবে তীব্র সমালোচনা করছিলেন। সে জন্য ইণ্ডিয়া হাউসে খাওয়াদাওয়া ও কথাবার্তার সময় আমরা সকলেই যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে ছিলাম। বাবা খবর পেয়েছিলেন যে বিদেশে আমাদের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মে নানারকম দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে। তিনি দাবি করছিলেন যে, ভারত সরকার যেন ঐ বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেন।

লণ্ডনের পাশেই ইসলিংটনের শহরগুলির মেয়র বেশ বড় রকমের একটা সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করেছিলেন। প্রবাসী অনেক ভারতীয় ও ভারতবন্ধু ইংরেজরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনপ্রবাসী এক ভারতীয় ডাক্তার তেজ কিষেন কাউল বাবার লণ্ডনের অনুষ্ঠানসূচী সফল করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শেষে সাব্যস্ত হয় যে, বাবার নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের একটা দল সক্রিয়ভাবে কাজ করবে এবং দেশের অগ্রগতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

নেশন পত্রিকার জন্য ইউরোপে ও আমেরিকায় সংবাদদাতা নিয়োগ করার কাজটা বাবা ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে নাম্বিয়ারসাহেব লিখবেন আগেই ঠিক হয়েছিল। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের দু'জন সংবাদদাতা লণ্ডন ছাড়বার আগেই বাবা ঠিক করে ফেললেন।

দেশে ফেরার পরে বাবা আমাকে নেশনের ফরেন করেসপনডেণ্ট নিযুক্ত করেন। আমার মনে হয়, সাংবাদিকতায় আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এটা করেছিলেন। এই সূত্রে আমার বিশেষ রকমের একটি অভিজ্ঞতা হয়। বাবারই নির্দেশে আমি একবার প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে যাচ্ছি, সঙ্গে আছেন আনন্দবাজারের প্রতিনিধি তারাপদ বসু। ইংলিশ চ্যানেল পার হবার জন্য জাহাজে উঠেছি। দুই ভদ্রলোক জাহাজে উঠে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। কোটের পকেট থেকে তাঁদের পরিচয়পত্র বের করে দেখিয়ে বললেন, তাঁরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা দফতর থেকে আসছেন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কতদিন থাকব ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমার সঙ্গী তারাপদবাবু ব্যাপারটা ঘটায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম বিলেতে এসে আমি বোধহয় পুলিশের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছি। দেখলাম, আসলে তা নয়।

বাবার দেশে ফেরার দিন এসে পড়ল। লণ্ডনে আমার থাকার ব্যবস্থা নিয়ে বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি ভাবলাম এ-কাজটা তো আমি লণ্ডনের বন্ধুদের সাহায্যেই করতে পারি। বাবা কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরোলেন। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণ একটি বিশেষ এলাকায় দল বেঁধে থাকতেন এবং জীবনযাত্রার ধারাটা ঠিক দেশের

মতো রাখার চেষ্টা করতেন। বাবার কিন্তু মত ছিল—**In Rome, do as the Romans do.** তিনি বললেন, ইংরেজদের বা নতুন কোনো দেশের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ না হলে, তাদের ভাল যা কিছু দেবার আছে তা নিতে না পারলে, বিদেশে গিয়ে কী লাভ ? বাবা ঠিক করলেন যে, ভারতীয় কলোনির অনেক দূরে কোনো ভাল ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা করে যাবেন। করলেনও তাই। নিজে ছাত্রজীবনে যে অঞ্চলে ছিলেন তারই কাছাকাছি হ্যাম্পস্টেডে এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলার হেফাজতে আমাকে রেখে গেলেন। খরচাও বেশি। হাসপাতাল থেকেও দূর, কিন্তু বাবা শুনবেন না। মহিলাটি ছিলেন গোঁড়া ইংরেজ কিন্তু আমাকে ঠিক ঠাকুমার মতো দেখাশুনো করতেন। মধ্যবিত্ত ইংরেজ সমাজের অনেক কিছু ভাল ও মন্দ আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম।

বাবা মা ও দুই বোনকে নিয়ে প্যারিস, রোম ও কাইরো হয়ে দেশে ফিরলেন। আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল।

ফেরবার পথে প্যারিসে বাবা ১৯৪১ সালে কাবুলের ইতালীয় দূত কোয়ারোনির কাছ থেকে কিছু পুরনো তথ্য ও দলিল পেলেন। ১৯৪১ সালের মে মাসে বার্লিন থেকে কাবুলে পাঠানো রাঙাকাকাবাবুর একটি গোপন বার্তার কপি কোয়ারোনির কাছে ছিল। বার্তাটিতে বাবার জন্য জরুরি খবর ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কিছু জানতে পারেননি। কাবুলে যাঁদের হাতে বার্তাটি পৌঁছেছিল তাঁরা রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশগুলি পালন করেছিলেন কি না তাও বাবা জানতে পারেননি।

আমি বিলেতে থাকার সময় বাবা আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, তা তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন। আমার পড়াশুনোর ব্যাপার ছাড়াও তিনি তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা জানাতেন এবং নানারকম কাজের ভার দিতেন। বিশেষ বিশেষ লোক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। বাবারই কাজে পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ও ইংরেজ রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমার আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। বাবা চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেই সময় মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট দল ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই দেশের খবরাখবর আমাদের দেশে সরাসরি পাওয়া যেত না। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি লণ্ডন অফিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেশন পত্রিকার জন্য অন্তর্বিপ্লবের খবরাখবর দেশে নিয়মিতভাবে পাঠাবার আমি ব্যবস্থা করি।

১৯৪৯-এর প্রথম মাস-তিনেক লণ্ডনে থাকবার পরে কাজ শেখার ভাল সুযোগ পাওয়ায় আমি মধ্য ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ডে চলে যাই এবং সেখানকার শিশু হাসপাতালে যোগ দিই। সেই সময় মনে হত যেন বসুবাড়ি থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। দেশে বা বাড়িতে যা কিছু ঘটছে সবই যেন আবছা-আবছা মনে হত। আমরা জনা-চারেক ভারতীয় ডাক্তার একসঙ্গে পড়াশুনো করতাম। আরও দু-চার জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমাদের একটা ছোট গোষ্ঠী। নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে আমাদের দিনগুলি মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই কেটে যেত।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভাবতে লাগলাম আমার হয়তো বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত। বাবা কিন্তু বারবার আমাকে জানাতে লাগলেন,

আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, আমি যেন আমার কাজ শেষ করার আগে দেশে ফেরার কথা চিন্তাও না করি। আমার ইচ্ছে ছিল বছর-চারেক ইউরোপে থাকব, দু-বছর ইংল্যাণ্ড এবং বাকিটা মধ্য ইউরোপের কোনো দেশে। রাঙাকাকাবাবুই তো বলে গিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ড ইউরোপ নয়, আমাদের মধ্য ইউরোপের সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করা একান্ত প্রয়োজন। যাই হোক, ঐ ধরনের ভাবনা আমি সেই মুহূর্তে ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। অন্যদিকে বাবার স্থির বিশ্বাস, তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে লিখলেন—**I have many more years to live and work.**

॥ ৭৫ ॥

জীবনের প্রায় আট বছর কারাবাস বাবার স্বাস্থ্যের খুবই ক্ষতি করে দিয়েছিল। হার্টের অসুখের খবর পেয়ে আমার চিন্তা হল তাঁর শরীর কি এই ধাক্কা সহ্য করতে পারবে! একটা সান্ত্বনা ছিল যে, নতুনকাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসুর মতো হার্ট স্পেশ্যালিস্টের হাতে তিনি থাকবেন। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু হার্টের অসুখে যে বিশ্রামের দরকার হয় সেই বিশ্রাম বাবা কি নেবেন! শারীরিক বিশ্রাম না হয় জোর করে চাপানো গেল, কিন্তু মানসিক বিশ্রাম তো অসম্ভব! দেশের চিন্তা তো আছেই। ওদিকে আবার সংসার চালানোর ব্যাপারে বাবা তো চিরকালই বেপরোয়া। তার ওপর 'নেশন' পত্রিকা চালু করে নিজের উপর খুবই বড় রকমের আর্থিক বোঝা তিনি নিয়েছিলেন। এ-সব কথা আমার মাথায় ক্রমাগতই ঘুরছিল। করিই বা কী? বাবা বেশ পরিষ্কার করে লিখেছিলেন যে, কোনো চিন্তা নেই। তিনি ক্রমে-ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবেন, আমি যেন তাড়াহুড়ো করে দেশে ফিরে যাবার চিন্তা না করি। বাড়ির কেউই এ-সব ব্যাপারে বাবার কথার ওপর কিছু বলতে পারতেন না। প্রতি চিঠিতেই বাবা আমাকে ডাক্তারি সব রিপোর্ট বিশদভাবে জানাতেন। কোনটা আশাপ্রদ, কোনটা নয়—সবই জানাতেন। তারই সঙ্গে নানা কাজের নির্দেশ থাকত।

লণ্ডনে মাস-তিনেক থাকার পরে আমি শেফিল্ডের নামকরা শিশু-হাসপাতালে কাজ শিখবার সুযোগ পেলাম। লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত শিশু-হাসপাতালে ভর্তি হতে মাস-ছয়েক দেরি হবে, সুতরাং সেই সময়টা কাজে লাগাবার জন্য আরও দূরে চলে যেতে হল। বিদেশে ছোট শহরে বা গ্রামে থাকবার একটা লাভ আছে, সেই দেশের মানুষের কাছাকাছি আসা যায়, তাদের মন বোঝা যায়, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়। লণ্ডনের মতো বড় শহরে কেউ কারও দিকে তাকায় না। বছর-খানেক বাদে যখন সুইজারল্যাণ্ড ও ভিয়েনায় পড়তে গেলাম তখন আমার সামনে আবার এক নতুন জগৎ খুলে গেল। সুইজারল্যাণ্ড আগে দেখেছিলাম ট্যুরিস্ট হিসাবে। পরে বুঝলাম দেশ বেড়াতে আসা এক কথা আর সেই দেশে মানুষের পাশাপাশি থেকে লেখাপড়া করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমাদের দেশ সম্বন্ধে সেখানকার মানুষের অজ্ঞতা দেখে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে হত এবার আমরা স্বাধীন হয়েছি, নিশ্চয়ই আমাদের দেশ সম্বন্ধে বড় রকমের প্রচারে আমরা নামব। আবার দেখে অবাক হতাম যে, সুইসদের মতো ছোট্ট জাতি, যাদের জনসংখ্যা কলকাতার সমান,

কেমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের গড়ে তুলেছে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি রাজ্য, নানা অসুবিধার মধ্যেও যা কিছু সম্বল আছে তারই সদ্ব্যবহার করে নিজেদের দেশকে কেমন সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করেছে।

আমার কাছে ভিয়েনার আকর্ষণ ছিল অবশ্যই অন্য ধরনের। আমার জীবনের গভীর এক দুঃখের সময়ে আমি সেখানে অতি আপনজন পেয়েছিলাম। এমিলি কাকিমা তো আছেনই, ছোট্ট অনিতা আমাকে তার খেলার সঙ্গী করে নিয়েছিল। হাসপাতালে কাজের সময়টা ছাড়া বাকি সময় আমার তাঁদের সঙ্গেই কাটত। যে কোনো পরিবারে পুরুষের উপস্থিতির বিশেষ এক গুরুত্ব আছে। আমি যেন মাস-ছয়েক ঐ অভাব পূর্ণ করেছিলাম। উ-মামা বা অনিতার দিদিমার নিজের হাতে রান্না করা অতি উপাদেয় গুলাশ বা স্নিত্‌সেল্ বা রকম রকম সুপ, আপেলের পুডিং ইত্যাদি খেয়ে শেষ করতে পারতাম না।

শেফিল্ডে থাকতেই বাবা জানালেন যে নতুনকাকাবাবু তাঁকে কিছুদিনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের কোনো এক ভাল ক্লিনিকে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য পাঠাতে চান। লস্যানের কাছে গ্লিওঁ বলে একটি মনোরম জায়গায় ভাল একটি ক্লিনিকের সন্ধান পাওয়া গেল। আমি খবরটা পেয়ে আনন্দিতই হলাম। কারণ কলকাতায় বসে বাবার পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব ছিল বলে আমার মনে হয়নি। আমাকে বাবা জানালেন যে, সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরবার আগে তিনি লণ্ডনে আসবেন, মা সঙ্গে থাকবেন। আমাকে বললেন,লণ্ডনের কোনো এক বিখ্যাত হার্ট-স্পেশালিস্টকে দেখাবার ব্যবস্থা করে রাখতে।

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি ইউরোপে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বাবা আরও একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। দক্ষিণ কলকাতার বিধানসভার আসনটি শূন্য হয়ে পড়েছিল। বাবা ঐ আসনের জন্য লড়বেন স্থির করে ফেললেন। তিনি তো ১৯৪৮ সাল থেকেই জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ গড়ে তোলার কাজে মন দিয়েছিলেন। এই নির্বাচনে লড়ে তিনি একটি দৃষ্টান্ত রাখতে চান। বিরোধী পক্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে চান। কিন্তু যে সময় নির্বাচন, সে সময় তিনি থাকবেন সুইজারল্যাণ্ডে। তিনি বললেন সাগরপার থেকেই তিনি তাঁর নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে তাঁর আবেদন রাখবেন, ফলাফল তিনি তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেবেন।

শেফিল্ডে বসে আমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে বাবার চিঠি পাচ্ছি। স্বাস্থ্যের সব খবর জানাচ্ছেন। অন্যদিকে বাড়ি থেকে বাবার নির্বাচন সংক্রান্ত খবরের জন্য ছটফট করছি। সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছবার পরে বাবা ও মা ভিয়েনা থেকে কাকিমা এমিলি ও অনিতাকে আনিয়ে নিলেন। গ্লিওঁতে তাঁরা সকলে মিলে কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটিয়েছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে বাবার স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হল। আমার আশা হল বাবা বোধহয় বিপদ কাটিয়ে উঠলেন।

'নেশন' কাগজ আমার কাছে নিয়মিত আসত যদিও খবরগুলো দিন-কয়েকের পুরনো হত। অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বাবার অনুগামীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। প্রচারের কাজে 'নেশন'-ই হল একমাত্র হাতিয়ার। বাবা ইউরোপ থেকে নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে তাঁর বক্তব্য ও আবেদন রাখলেন। ভোট গোনা হয়ে যাবার কয়েক ঘণ্টা বাদেই বাড়ি

থেকে আমি টেলিগ্রাম পেলাম—বাবা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন।

দিন-কয়েক পরেই বাবা ও মা লণ্ডনে আসবেন। আমাকে বাবা সেই কয়েক দিন লণ্ডনে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে বললেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমার জন্য একই হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। লণ্ডনের এয়ারপোর্টে বাবাকে দেখে তো ভালই লাগল। নির্বাচনে জয়ের পর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি যেন পা বাড়িয়ে রয়েছেন। মাকেই অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত লাগল, কী যেন এক গভীর চিন্তা তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বাবার জন্য লণ্ডনে নানা ধরনের প্রোগ্রাম করা ছিল। নানা লোকের সঙ্গে দেখাশুনো, সভা, বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে তাঁর দিনগুলি ভরা ছিল। অনেক সময় এমন হত বাবা যখন বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত, মা তখন আমার সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। পারিবারিক, ব্যক্তিগত, দেশের কথা ও রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে এত খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা আগে কখনও হয়নি। মা সেই সময় অনেক ব্যাপারেই বাবার পক্ষ থেকে কথা বলতেন। যেমন উনি বলছিলেন, তোমার ভবিষ্যৎ-জীবনের প্রস্তুতি এইভাবে হওয়া উচিত। বিবাহের ব্যাপারে তোমাকে অনেক দিক বিবেচনা করতে হবে, ইত্যাদি। আমি শেষ পর্যন্ত জনসেবার ক্ষেত্রে ও জনজীবনে প্রবেশ করব সেটা বাবা ও মা যেন ধরেই নিয়েছিলেন। বাবার পরামর্শ ছিল আমি যেন সব সময় সে-সব কথা মনে রেখে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

যেদিন বাবা ও মাকে এয়ার-টার্মিনালে বিদায় জানালাম সেদিন বাবাকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। খবর পেলাম বোম্বাই পৌঁছেই বাবা সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। মা লিখলেন, বাবা একটু বাড়াবাড়ি করছেন বলে মনে হয়। আমি যখন আমার চিঠিতে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতাম তিনি প্রতিবারই লিখতেন, কোনো চিন্তা কোরো না, I have many more years to live and work. অপরদিকে এটাও শুনেছি যে, বাড়িতে কেউ বিশ্রামের কথা বললে তিনি বলতেন, বিশ্রাম আবার কী? I am a racing horse, I shall die galloping.

আগস্ট মাসে ময়দানে অক্টারলোনি মনুমেন্টের তলায় বক্তৃতা করবার সময় বাবার আবার হার্ট অ্যাটাক হল। আমাকে অবশ্য বলা হল যে, ব্যাপারটা গুরুতর নয়; দূরে যারা থাকে তাদের অসুখ-বিসুখের খবর কম করেই বলা হয়। কিছুদিন পরে বাবা নিজেই আমাকে খবরটা জানালেন। তবে বুঝলাম, নতুনকাকাবাবু এবারে চিকিৎসার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করছেন। ১৯৪৯-এর শেষে কলকাতায় সংযুক্ত সমাজবাদী সম্মেলন হল, বাবা তাঁর সভাপতি, কিন্তু ভাষণটি নিজে পড়তে পারলেন না। সম্মেলনে দেশের নানা দিক থেকে অনেক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন এবং সম্মেলনে সংযুক্ত সমাজবাদী সংগঠন বা ইউ· এস· ও· গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যার সভাপতি নির্বাচিত হলেন বাবা। আমি প্রায়ই বাবার চিঠি পাই। তিনি আশার কথা বলেন। এদিকে পূর্ব বাংলায় আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যাওয়ায় বাবার চিন্তার অবধি ছিল না। বিভক্ত-বাংলার এই হানাহানির রাজনীতির সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা বাবার জীবনের শেষ দিনগুলির প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল!

অক্টোবরের প্রথমেই আমি লণ্ডনে ফিরে এসে গ্রেট অরমণ্ড স্ট্রিটের বিশ্ব-বিখ্যাত শিশু-হাসপাতালে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিলাম। ১৯৫০-এর ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে হাসপাতালে বেরোবার জন্য আমি প্রস্তুত। প্রায় একই সঙ্গে তখন একটি টেলিগ্রাম এল

1 Woodburn Park,
10th October 1949,
Monday 8 am

My dear Sisir,

Your letter of the 2nd inst was to hand day before yesterday. I send you my love and Bijoya ashirbad. May the Divine Mother make you the pride of your family and the glory of your country!

I am sorry I have not written to you for nearly three weeks. It was due to sheer laziness. [I] have the physical and mental capacity to write and also to do some journalistic work lying in bed. I gave an interview to the United Press of America on Thursday last the 6th inst and was told by them the next day that they had cabled it 'outside India'. Did it appear in any of the British papers?

আমাকে লেখা বাবার শেষ বিজয়ার চিঠি

আমার হাতে, অন্য দিকে টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিগ্রামে লেখা : Father passed away after an hours illness. টেলিফোনে কথা বললেন আনন্দবাজারের তারাপদ বসু। তিনি বললেন, "শিশির, তুমি মন খুব শক্ত করো, আমাদের শরৎবাবু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।" ততক্ষণে 'টাইমস' পত্রিকাও এসে গেছে। খবরও ছাপা হয়ে গেছে।

আমি স্থির হয়ে রইলাম। তারাপদবাবু ও তাঁর স্ত্রী সেই দিনটা আমাকে তাঁদের বাড়িতে ধরে রাখলেন। কলকাতায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এখন কী ঘটছে কে জানে! মা'র খবর জানতে চেয়ে, এবং আমার এখন কী কর্তব্য জানতে চেয়ে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠালাম। ভাবলাম আমার হয়তো ভাগ্য ভাল যে, বাবাকে আমি কোনোদিন রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিনি। তাঁর ডাক এসেছে, তিনি বীরের মতো চলে গেছেন। বসুবাড়ির মধ্যমণির প্রস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি

ঘটল। ধন ও ঐশ্বর্যে নয়, ত্যাগ ও সেবার মহিমায় উজ্জ্বল এই অধ্যায় প্রত্যক্ষ করার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি পৃথিবীতে কজনই বা তা পায়? কটা পরিবারে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র সমকালে জন্মগ্রহণ করেন? আমরা তাঁদের স্পর্শ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। সেটাই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

বাবার শেষ কয়েকখানা চিঠি ওলটাতে ওলটাতে কিন্তু মনে হল আমার চিন্তা ভুল। শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসুবাড়ির সন্তান কেবল আক্ষরিক অর্থে। আসলে তাঁরা ভারত-সন্তান। কেবল আমরা নই, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নর-নারী তাঁদের পরমাত্মীয়। ভারতবাসীর দুঃখকে আপন দুঃখ করে নিয়ে তাঁদের কল্যাণে তাঁরা জীবনদান করে গেলেন। বসুবাড়ির বন্ধন, বসুবাড়ির অভিমান, বসুবাড়ির গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁরা চলে গেছেন অমরত্বের সন্ধানে। শরৎ-সুভাষকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার হাতে সমর্পণ করেই বসুবাড়ির প্রকৃত ও চরম সার্থকতা।

তবু, আমরা যারা রইলাম তাদেরও কিছু আছে। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাও কি কম! ইংরেজ কবি চেস্টারটনের ভাষায় বারে-বারে বলি:

It is something to have wept as we have wept,
It is something to have done as we have done,
It is something to have watched when all men slept
And seen the stars which never see the sun.



পরিশিষ্ট

এই কাহিনীতে কতকগুলি ইংরাজি চিঠিপত্র, ডায়েরি, দলিল ইত্যাদি আছে। সেগুলির বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

সেন্সর কর্তৃক পরীক্ষিত
....
স্বাক্ষর
আই· বি· সি· আই· ডি
বেঙ্গল

মান্দালয় জেল
১-৩-২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আমি জানি না আপনি আমার পূর্বের কয়েকটি চিঠি পেয়েছেন কিনা। আমি ইচ্ছা করেই অনশন সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিনি কারণ আমার আশঙ্কা ছিল যে তাহলে চিঠি আটকে দেওয়া হবে এবং আপনারা চিন্তায় পড়বেন। যা ঘটল তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনশনের কথা লিখলে চিঠি আটকে দেওয়া হবে আমার এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

আমি আপনার দীর্ঘ টেলিগ্রাম ২৭-২-২৬ তারিখে বিকাল ৫টায় পাই এবং তৎক্ষণাৎ জরুরী জবাব পাঠাই। সেটি কখন আপনার হাতে পৌঁছেছিল আমি জানি না।

আমার শারীরিক দুর্বলতা আছে—কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ভাল আছি। আমার সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ নাই। প্রথম কয়েকদিন আমার মাথা ধরছিল এবং মস্তিষ্কের সামান্য গোলযোগ দেখা দিয়েছিল কিন্তু মনে হচ্ছে আমি ধীরে ধীরে অনশনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমি যতটা পারি বিছানায় থাকি যাতে শক্তির অপচয় না হয়। অনশন চলছে এবং বেশ কিছুদিন চলবে। যতদিন পর্যন্ত না আপনি আমার কাছ থেকে সরাসরি জানতে পারেন যে আমি অনশন ভেঙেছি ততদিন আপনি ধরে নিতে পারেন যে অনশন চলছে।

সামান্য একটু লবণ দিয়ে গরম জল খেলে বেশ চাঙ্গা থাকা যায়। মাথার যন্ত্রণা ও মাথাঘোরা আমার আছে...

(মান্দালয় থেকে বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠি) পরিচ্ছেদ-৯

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
৪৩তম অধিবেশন কলিকাতা
১৯২৮

রেফারেন্স নং ৫০১

১ নং উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা, ৩রা ডিসেম্বর ১৯২৮

শ্রীচরণেষু

মহাত্মাজি,

আমি এই সঙ্গে এক তরুণ বন্ধুর চিঠি পাঠাচ্ছি যিনি আপনি কলিকাতায় থাকাকালীন আপনার সেবা করার জন্য উদ্‌গ্রীব। আমি জানি না তাঁকে আপনার মনে আছে কিনা কিন্তু তিনি বেশ কয়েকবার আপনার সেবা করেছেন। আমি তাঁকে কি বলব সে বিষয়ে আপনার নির্দেশ চাই।

আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন আপনার ক্যাম্পের জন্য আপনার কয়জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হবে এবং তাদের কি কি যোগ্যতা থাকা চাই। আমাদের সুবিধা হয় যদি আপনি আমাদের জানান আপনার সঙ্গে কজন আসবেন।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে
আপনার শ্রদ্ধাবনত
সুভাষচন্দ্র বসু

(মহাত্মা গান্ধীকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর চিঠি) পরিচ্ছেদ-১০

আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে শিশির তার এই অন্যায় বন্দীদশা শান্তমনে ও ধৈর্যের সঙ্গে বহন করবে। সে আমার পুত্র তাই আমি একথা বলছি তা কিন্তু নয়,আমি বলছি কারণ আমি তার মানসিক গঠন জানি···যদি তোমার শিশিরের সঙ্গে দেখা হয় তাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ ও এক উজ্জ্বল ও আনন্দময় ভবিষ্যতের জন্য আমার শুভ কামনা জানাবে। সে যে কোন অন্যায় কাজ করেনি এই আত্মবিশ্বাস তাকে আনন্দে রাখবে।

(আমার প্রথম গ্রেপ্তারের পর বাবার চিঠি) পরিচ্ছেদ-৫২

আমার যদি আমার মায়ের মত আধ্যাত্মিক শক্তি থাকত—
"জীবনে তাকে আশাহীন সীমাহীন দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে—
মৃত্যু বা নিশার চাইতেও ঘনান্ধকার অন্যায় তিনি ক্ষমা করেছেন
যে শক্তিকে মনে হয়েছে দুর্জয়, তা তিনি তুচ্ছ করেছেন
ভালবেসেছেন, সয়েছেন
এবং তা তিনি জীবনান্ত পর্যন্ত করেছেন নম্রতা, ধর্মপরায়ণতা, জ্ঞান ও সহ্যশক্তির সঙ্গে।"

সরকারের কাছে একটি মাত্র অনুরোধই তিনি করেছিলেন যে আমাকে যেন একবার তার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হবার অনুমতি দেওয়া হয়। যেন তিনি একবার শেষ স্নেহের দৃষ্টিপাত করতে পারেন। কিন্তু সেই অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে যে মায়ের হৃদয় ভেঙে যাবে তা আর আশ্চর্য কী

আমি শিশিরের, দাদার ও গীতার চিঠি চোখের জল ফেলতে ফেলতে পড়েছি আর সেই চোখের জলে আমার মনের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে।

(মাজননীর মৃত্যুর পর বাবার চিঠি) **পরিচ্ছেদ-৫৪**

তোমার চিঠি থেকে বুঝলাম গ্রেপ্তারের পর শিশিরকে উডবার্ন পার্কে আনা হয়েছিল এবং তাকে তার মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেই বিদায় কী করুণ ও বিষাদময় হয়েছিল...।

শিশির যে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে ধীর ও শান্ত থাকবে তা আমি আশা করেছিলাম। সে যে নিজের চাইতে তার মার জন্যই বেশী চিন্তিত হবে সেও তারই উপযুক্ত। যাদের বিবেক স্বচ্ছ তারা নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিচলিত হয় না। মঙ্গলময়ী মা যেন তাকে আশীর্বাদ করেন, তাঁর আশীর্বাদে ওর অপবাদকারী—তা যে বা যারাই হোক না কেন—ধিক্কারে স্তব্ধ হয়ে যাক্ আর সে নিজেকে সম্পূর্ণ অকলঙ্ক বলে প্রতিষ্ঠিত করুক।

(আমার দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তারের পর বাবার চিঠি) **পরিচ্ছেদ-৫৭**

c/o অ্যাডিশ্যানাল সেক্রেটারি
ভারত সরকার
(হোম ডিপার্টমেন্ট)
২৩শে নভেম্বর ১৯৪৪

শ্রীচরণেষু মা,

ইংরেজিতে চিঠি লেখার জন্য ক্ষমা করবেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজিতে লেখাই ভাল।

আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে আমি ভাল আছি, আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। হজমেরও কোন গোলমাল নেই, কোন চিন্তা করবেন না।

আপনাদের খবর শীঘ্র পাব বলে আশা করছি।

(লাহোর ফোর্ট থেকে লেখা আমার পোস্টকার্ড) **পরিচ্ছেদ-৫৯**

নং ৪/৪/৪৩-এম· এস
ভারত সরকার
স্বরাষ্ট্র বিভাগ

নতুন দিল্লী,
৭ই নভেম্বর, ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের নিষেধাজ্ঞা ও গ্রেপ্তার বিষয়ক হুকুমনামার ৭ নং ধারা অনুযায়ী নোটিশ (১৯৪৪ সালের ৩নং)

১৯৪৪ সালের ৩নং হুকুমনামার ৭নং ধারা অনুযায়ী আপনাকে জানানো হইতেছে যে আপনার গ্রেপ্তারের হেতু এই যে, আপনি শিশির বসু ব্রিটিশ ভারতের রক্ষা বিঘ্নিত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন, কারণ আপনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার গ্রুপ ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপানীদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে সক্রিয় কার্যকলাপে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

২। আপনাকে জানানো হইতেছে যে যে আদেশের বলে আপনাকে বন্দী করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। আপনি যদি এইরূপ আবেদন করিতে চান তাহা হইলে নীচে যে অফিসারের স্বাক্ষর আছে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এবং যে অফিসারের হেফাজতে আপনাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে তাঁহার মারফৎ যত শীঘ্র সম্ভব তাহা দাখিল করুন।

স্বাঃ আর· টটেনহ্যাম
অতিরিক্ত সচিব, ভারত সরকার—

(লাহোর ফোর্টে এই চার্জশীট আমাকে দেওয়া হয়) পরিচ্ছেদ-৬০

জানুয়ারী	শুক্রবার ১২	১৯৪৫

অমির ৬ তারিখে লেখা চিঠি পেলাম। সে চিঠিতে জানিয়েছে এখনো পর্যন্ত শিশিরের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

আমার মনে ঘোর আশংকা হচ্ছে যে শিশিরের গুরুতর কিছু ঘটেছে। মধ্যরাত্রের পর প্রার্থনা করলাম, তারপর শুতে গেলাম।

জানুয়ারী	রবিবার ১৪	১৯৪৫

শিশিরের কথা চিন্তা করে আমার মন গভীর আশংকায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলময়ী মা কী তার প্রতি ও আমাদের প্রতি দয়া করবেন না?

(বাবার ডায়েরি, আমার সম্বন্ধে উদ্বেগ) পরিচ্ছেদ-৬১

c/o সুপারিনটেনডেন্ট
ডিস্ট্রিক্ট জেল
লায়ালপুর পাঞ্জাব

শ্রীচরণেষু মা,

এখন আমি লায়ালপুরের ডিস্ট্রিক্ট জেলে আছি। আমি ভাল আছি। গত মাসের ২০ তারিখে ও ২৭ তারিখে আমি যে দুটি চিঠি লিখেছিলাম আশাকরি সে দুটি গন্তব্যস্থানে পৌঁছেচে। এ জায়গায় আমার শরীর কেমন থাকবে এখনি তা বলা যাচ্ছে না তবে মনে হয় জায়গাটির জলহাওয়া ভাল ও স্বাস্থ্যকর। আশাকরি আমার জন্য আপনারা অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করছেন না এবং ওখানে সকলে ভাল আছেন। গীতার লেখা ১৭ই জানুয়ারীর চিঠিই বাড়ী থেকে পাওয়া শেষ চিঠি। সামনের কয়েকদিনের মধ্যে আরও চিঠি পাব আশা করছি। বাবাকে আমার খবর পাঠাবেন এবং জানাবেন যে আমি ভাল আছি, আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আমার প্রণাম তাঁকে জানাবেন। আমাকে বলা হয়েছে এখন আমি বই আর খবরের কাগজ পেতে পারি। আমি আজকে গীতাকেও চিঠি লিখছি, কয়েকখানা বই যা এখন চাই ওকে জানাচ্ছি। আমাকে বাড়ীর সব খবর এবং সবকিছু কেমন চলছে অবশ্য জানাবেন। আমি ভাল আছি। প্রণাম। আপনারই শিশির

সেন্সরের সই	তারিখ	প্রেরক
	৩-২-৪৫	শিশিরকুমার বসু

(লায়ালপুর জেল থেকে লেখা আমার প্রথম চিঠি) পরিচ্ছেদ-৬২

আগস্ট	শনিবার ২৫	১৯৪৫

আজকের "ইণ্ডিয়ান একস্‌প্রেস" ও "হিন্দু" এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর বহন করে এনেছে। মঙ্গলময়ী মা, তোমার বেদীমূলে আর কত আত্মত্যাগ আমাদের করতে হবে ? ভয়ংকরী মা, তোমার আঘাত যে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর তোমার এই চরম আঘাত যে কঠিনতম ও নিষ্ঠুরতম। এর দ্বারা তোমার কোন অলৌকিক ইচ্ছা পূর্ণ হবে তা তুমি একাই জানো। দুর্বোধ্য তোমার মনোবাসনা।

চার পাঁচ দিন আগে একরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সুভাষ আমাকে দেখতে এসেছে। সে আমার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন আকৃতিতে খুব দীর্ঘদেহী হয়ে উঠেছে। আমি তার মুখ দেখার জন্য লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আর তার সঙ্গে সঙ্গেই সে মিলিয়ে গেল। সেদিন আমি এই স্বপ্ন কোন বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে মনে করিনি, তাই পরদিন ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে কিছু লিখেও রাখিনি। কিন্তু, আজ ?

(বাবার ডায়েরি, নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাবার পর) পরিচ্ছেদ-৬৪

ডিস্ট্রিক্ট জেল
লায়ালপুর (পাঞ্জাব)
সোমবার

শ্রীচরণেষু মা,

শুক্রবার বিকেলে "দি ট্রিবিউন" পত্রিকা আমার কাছে মর্মান্তিক সংবাদ বহন করে এনেছে। আমি কি আর বলব? এক নির্ভীকতম ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে আমরা যেন অন্তত সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ।

আমি বাড়ীর সকলের খবরের জন্য এবং বিশেষ করে বাবার শারীরিক অবস্থা জানার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করব। আমার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক থাকব।

আমি রমার ও গীতার ১৩ই ও ১৫ই তারিখে লেখা চিঠি পেয়েছি আর পেয়েছি তিনটি ইংরেজি বই।

প্রণাম সহ
স্নেহের
শিশির

অফিসারের সই | তারিখ ২৭শে আগস্ট | প্রেরক শিশিরকুমার বসু

(আমার চিঠি, নেতাজীর মৃত্যুর খবর পাবার পর) পরিচ্ছেদ-৬৪

আমার আদরের ভাই শিশির,

তোমাকে আমার অন্তরের ভালবাসা ও স্নেহচুম্বন পাঠালাম। তুমি আবার কবে ভিয়েনায় আসবে আর তখন কী তুমি আমার সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বলবে?

তোমার স্নেহের
অনিতা

(অনিতার ছেলেবেলার চিঠি) পরিচ্ছেদ-৭২

১, উডবার্ন পার্ক
১০ অক্টোবর ১৯৪৯
সোমবার সকাল ৮টা

স্নেহের শিশির,

গত পরশুদিন তোমার ২ তারিখে লেখা চিঠি আমি পেয়েছি। আমার ভালবাসা ও বিজয়ার আশীর্বাদ তুমি গ্রহণ করো। মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছায় তুমি যেন তোমার পরিবারের অহংকার ও দেশের গৌরব হতে পারো।

আমি তোমাকে প্রায় তিন হপ্তা চিঠি লিখে উঠতে পারিনি বলে দুঃখিত। শুধু আলস্যই এর জন্য দায়ী। লিখবার মত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এবং বিছানায় শুয়ে কিছু সাংবাদিকতার কাজ করার শক্তিও আমার রয়েছে। বৃহস্পতিবার ৬ তারিখে আমি ইউনাইটেড্ প্রেস অব্ আমেরিকাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছি। তারা পরদিন জানিয়েছে যে সাক্ষাৎকারটি ভারতের বাইরে টেলিগ্রাফ-যোগে পাঠিয়ে দিয়েছে। কোন ব্রিটিশ খবর কাগজে এটি বার হয়েছে কী?

(আমাকে লেখা বাবার শেষ বিজয়ার আশীর্বাদ) পরিচ্ছেদ-৭৫

